1971

বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদনা। সুরমা জাহিদ

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল বদর, আল শামস-এর সহায়তায় সমস্ত বাংলাদেশে গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণ চালায়। এই গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণের প্রক্রিয়ার প্রকৃতি যেমন ছিল পৈশাচিক ও ভয়াবহ ঠিক তেমনি ছিল নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্যবাহী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো খণ্ডিত সময়ের ইতিহাস নয়, এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ যার সূত্রপাত বহু পূর্ব থেকে এবং তা এখনও প্রবাহমান, যা বর্তমান প্রজন্মসহ অনাগত ভবিষ্যতের জানা খুবই প্রয়োজন।

পাক হানাদার হায়েনাদের নারকীয় তাণ্ডবলীলার হত্যাযজ্ঞ যাতে বিশ্ববাসী জানতে না পারে সে জন্য কৌশল হিসেবে বিদেশী সাংবাদিকদের হোটেলে আটকে রেখে ছবি তোলা ফিল্মসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেখে তাদেরকে এ দেশ ত্যাগ করানো হয়। জীবনকে বাজি রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে লুকিয়ে থাকা এক ভিনদেশি সাংবাদিকের কৌশলে সংগৃহীত তথ্যচিত্রের মাধ্যমে একাত্তরের ২৫শে মার্চের ভয়াল কালো রাত্রিতে শুরু হওয়া নিরীহ অবলা নারী-শিশুসহ আবালবৃদ্ধ-বণিতার উপর অতর্কিত আক্রমণের কয়েকদিন পর বিশ্ববাসী এই ধরণের অমানবিক অবর্ণনীয়, নিষ্ঠুর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, পাশবিক নির্যাতনের লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক তাণ্ডবলীলা জানতে পেরে বিশ্ববিবেক স্তম্ভিত হয়ে যায়, যা নাৎসী বাহিনীর কর্মকাণ্ডকেও হার মানায়। তৈরি হতে থাকে সমগ্র বিশ্বে কলম যোদ্ধা, শিল্পী যোদ্ধাসহ নানান রকমের সৈনিক যাদের মাধ্যমেও এই বাংলার নিরীহ গণমানুষের স্বাধিকারের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে সহযোগিতায় বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে এবং পাকিস্তানি শাসক-শোষক তথা পাক হায়েনা হানাদারদের দমন-পীড়ন, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ও ধর্ষণের মতো নারকীয় ন্যাক্কারজনক ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে দুর্বার জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষায় পাওয়া বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নেওয়া লাল সবুজের পতাকার এই সেই বাংলাদেশকে সমগ্র বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেই সমস্ত তথ্যচিত্র দলিলপত্রাদি অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাথেয় হয়ে থাকবে। এই ভাবনার ভিত্তিতেই বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থটি।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ



সুরমা জাহিদ ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। শুরু হয় কবিতা দিয়ে। সাহিত্যের প্রায় সকল আঙ্গিনায় বিচরণ করছেন যা প্রকাশ পায় তাঁর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্যরকম চাওয়া', অপর সৃষ্টি পাঠকপ্রেমীর নিকট সমাদৃত উপন্যাস 'খণ্ডক'। পরবর্তী প্রকাশ সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত উপন্যাস 'আজ বসন্তের দিন'। আরো প্রকাশিত হয় ছোটগল্প 'না আর যাবো না', গল্প 'সোনার পালঙ্কে আমি একা', বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোড়িত প্রকাশনা 'বীরাঙ্গনাদের কথা'।

স্কুল জীবন থেকেই বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত থেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। বাংলাদেশের নারীদের বিভিন্ন সংকট, সংখ্যাতিময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে লেখনীর দ্বারা হয়েছেন তিনি সোচ্চার। ইতোমধ্যে তিনি কুমারখালী সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, দক্ষিণ বাংলা সাহিত্য সাংস্কৃতিক পদক এবং কবি সুফিয়া কামাল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

সুরমা জাহিদের জন্ম ১৯৭০ সাল। জন্মস্থান : রাজাবাড়ি, রায়পুরা, নরসিংদী। বাবা : মরহুম আলফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাতা : আম্বিয়া আক্তার। স্বামী : মোঃ জাহিদ হোসেন। ছেলে : মোঃ নাদির হোসেন লুই ও মেয়ে : নূর-এ-জান্নাত জুঁই। শিক্ষাজীবন শুরু করেন রায়পুরা উপজেলার জিরাহী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তারপর মরজাল কাজী মোঃ বশির উচ্চ বিদ্যালয়, লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী উচ্চ বিদ্যালয়। শেষ করেন কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে।

ISBN 978 984 414 326 5

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮ ০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
এম এন কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার
ফোন : ০১১৯০০৪৬৩২৮

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : কে এম মাসুম
ফোন : ০১৯১৩৫০৯৬৭৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০

BOHIRBISHWE GONOMADDHOME BANGLADESHER MUKTIJUDDHO
Edited by Surma Zahid
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone: 717 29 66, 01711 664970
email anindyaprokash@yahoo.com
First Published : February 2013

Price 300.00
US S 10

ISBN 978-984-414-326-5

উৎসর্গ

যাদের ত্যাগে বাংলাদেশ

এবং

নতুন প্রজন্মকে।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো মহান মুক্তি সংগ্রাম এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। এই মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিলেও মূলত এর পটভূমি রচিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান বিভক্ত হয়। ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোর ভাষা আন্দোলন থেকে উন্মেষ ঘটে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভূ-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বর্তমান শতাব্দীর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক ভারত বিভক্তির ডামাডোলের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লড়াই শুরু হয়। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ মূলত বাঙালি জাতির আবহমান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত আনে। এখান থেকেই শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রান্ত হয় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে। ভাষা ও সংস্কৃতির যে আন্দোলন মধ্য-পঞ্চাশ দশকে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছিল তা ষাটের দশকে এসে অর্থনৈতিক মাত্রাও অর্জন করে। জেনারেল আইউব খানের সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার দিয়ে এ পর্বের শুরু হয়। তাই ছেষট্টির পরে অত্যন্ত দ্রুত তালে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আইউবের পতন, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়। শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের এই শক্তি অর্জনের পাশাপাশি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্র বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এরই ফলশ্রুতিতে হয় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট এবং এর ফলাফল বাংলার জনগণের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে আরো অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংসদ অধিবেশন স্থগিত বাংলার জনগণকে নতুন করে

উত্তপ্ত করে তোলে। বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। পাকিস্তান সামরিক শাসকের রক্তিম চক্ষুকে উপেক্ষা করে শেখ মুজিব লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তার নীতি নির্ধারণী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই পর্যায়ে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোয় পাকিস্তান সরকারের সকল সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে উঠতে থাকে। এর মধ্যে বাঙালি জাতির উপর নেমে আসে ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রি। নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ পরিচালনা করে গণহত্যা চালায়। প্রথমে ইপিআর ওয়ারলেসে শেখ মুজিব বলেন, "This may be my last message-from today Bangladesh is independent. I call upon the people, wherever you are and with whatever you have. To resist the army of occupation to the last. your fight might must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." এদিকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা চট্টগ্রাম থেকে প্রথম বেতারে প্রচার করেন আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামস্থ সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান। পরদিন ২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। শুরু হয় বাঙালির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতিতে মোড় ফেরে, ভারী অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে একে একে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ পাকিস্তানী বাহিনী দখল করে নেয়। ১০ই এপ্রিল '৭১ বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার মুখে হাজার হাজার শরণার্থী বিভিন্ন পথ দিয়ে ভারতে যেতে থাকে। সাময়িকভাবে জনতা, পুলিশ, আনসার সবাই পিছু হটতে থাকে। কিন্তু জুনের পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে যেতে থাকে। ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্র, যুবক ও গ্রামের তরুণরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে এখানে সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হলো। বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের এ গণহত্যার জন্য বিশ্ববাসী ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শুধুমাত্র উপমহাদেশেই নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই সময় একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময়ে আমেরিকা তথা বিশ্বের অপরাপর এলাকার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ব্যাপকভাবে সহানুভূতিশীল করে তোলার জন্য '৭১ এর ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে জর্জ হ্যারিসন কনসার্ট ফর বাংলাদেশের আয়োজন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এই ব্যতিক্রমী কনসার্টে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীরাও সেই গানে খুঁজে পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের মানুষের সেই দুঃসময়ে দুর্ভোগ দুর্দশার অন্যতম অংশীদার ছিলেন তিনি।

জুলাই মাসের পরবর্তী সময়ে সেক্টর ফোর্স এবং ব্রিগেড সংগঠিত ও অধিক শক্তিশালী হতে থাকে এবং পরিকল্পিত যুদ্ধ পরিকল্পনায় অগ্রসর হতে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ সাফল্যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে। একই সময়ে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচলে আপত্তি এবং বাংলাদেশের নৌ কমান্ডারদের দুঃসাহসিক অভিযানে নৌ-বন্দরসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়ে

যে কারণে পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডের সাথে বাংলাদেশে দখলদার হিসাবে চিহ্নিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর যুদ্ধরত অংশ মূলত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিয়মিত সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই অংশ এ সময় শহরভিত্তিক আত্মরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ডিসেম্বরের শুরুতে মুক্তিবাহিনীর আরও সাফল্যের খবর দেশবাসীকে উৎসাহিত করে। ঢাকায় গেরিলা বাহিনী আরও তৎপর হয়ে দুঃসাহসী হামলা চালায়। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনী একসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াই শুরু করে এবং তাদের আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে থাকে। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিন পর মিত্রবাহিনী যশোর মুক্ত করে এবং এক সপ্তাহে দৌলতপুর ও খুলনা মুক্ত করে সম্মুখপথে পাকিস্তানী সৈন্যদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তারা বিভিন্ন সীমান্ত থেকে পিছু হটে ঢাকায় এসে জড়ো হতে থাকে। আসন্ন পরাজয় ঘনিয়ে আসতে দেখে তারা কূটনৈতিক চাল চালে নিজেদের বিপর্যয় ঠেকাতে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার এবং ওয়াশিংটন স্পেশাল একশন গ্রুপস কি করা যায় তা নিয়ে ভাবনায় পড়লেন। তৃতীয় দেশের মাধ্যমে অস্ত্র পাঠানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করে কিভাবে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার করা যায় তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানের পর বসে রইল না। ৫ই ডিসেম্বরে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সংকট মুক্তির প্রস্তাব রাখে। ৭ই ডিসেম্বর যশোর ও সিলেট মুক্ত হয়। এদিকে মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। ঢাকার বুকে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। ৭ম নৌ বহরের আগমনে তারা কিছুটা উৎসাহবোধ করে এবং আত্মসমর্পণে টালবাহানা করতে থাকে। ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০ নৌবহর ৭ম নৌবহরের পিছু নেয়। ১৪ই ডিসেম্বরের পরও শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বর শর্তহীন আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসার নিয়ে জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল, '৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের অহংকার উড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। '৪৮ – '৭১ একটি দীর্ঘ সময়। বাঙালি জাতির এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। '৭১ এর ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে জেগে ওঠে একটি সংগ্রামী চেতনা। আর এই চেতনার ধারাবাহিকতায় জেগে উঠবে আগামী দিনের স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ।

ওয়ালী উর রহমান
১০/০১/২০১২ খ্রি.
সাবেক সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুখবন্ধ

সুরমা জাহিদ একজন স্বনামধন্য কথাশিল্পী, কবি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক-লেখক। ইতোমধ্যে দেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাস-কাব্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ করে তাঁর একাত্তরের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে গ্রন্থটি ইতিহাস-কালের জন্য এক সাহসী ও মানবিক প্রকাশনা উদ্যোগ।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা একাত্তরের বেদনা-লজ্জা আর ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা এই সমস্ত সর্বস্ব মহিয়সী নারী-মাতা-কন্যা-ভগিনীদের জীবন ত্যাগ যাতনা এই সব স্মৃতিময় দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে দুর্বিসহ বেঁচে থাকা, লুকিয়ে থাকা কিংবা পালিয়ে বেড়ানো জীবন প্রবাহ ঘটনাবহুল স্বাধীনতার মৌল ইতিহাস খুঁজে বেড়ানো এই লেখক এবার আরেক মহতি অধ্যায়ে হাত দিয়েছেন।

দেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব গণমাধ্যমে–সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রচারণায় মহান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে প্রভাবিত করে বিশ্ববিবেক, মানবতা ও সহমর্মিতাকে মুক্তিকামী বিশ্বমানবতার সমর্থন সহযোগিতা অর্জন করে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার, মুক্তি ও মিত্রবাহিনী বিশ্ব জনমত মুক্তির লড়াইয়ে তীব্রতর হয়– এসব তথ্যবহুল সচিত্র একটি গ্রন্থ এই লেখক সম্পাদনায় উদ্যোগী হয়েছেন জেনে বেশ উদ্দীপ্ত ও আপ্লুত হচ্ছি।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি জাতির ত্যাগ-প্রাপ্তি সংগ্রাম তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয় অগ্রযাত্রার সঠিক ইতিহাস ও অজানা অনেক তথ্য আগ্রহী পাঠক জানতে পারবেন, একাত্তর তথা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গবেষণা সহযোগী এই গ্রন্থ নতুন বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে অনায়াসে। এটি একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল বলে আমি মনে করি।

এই মহতি উদ্যোগের জন্যে সম্পাদক লেখক সুরমা জাহিদকে যেমন সাধুবাদ–তেমনি প্রকাশনা সংস্থা অনিন্দ্য প্রকাশ এবং তার সত্ত্বাধিকারী সুরুবান সাহসী প্রকাশক আফজাল হোসেনকে অভিনন্দন।

গ্রন্থটি দেশ বিদেশে গবেষণা কর্মে এবং ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এর ব্যাপক পাঠক-প্রিয়তা কামনা করছি।

আসলাম সানী
১৬ ডিসেম্বর ২০১১

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিদেশি পত্রিকায় ১৯৭১ এর কিছু নমুনা

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সম্পাদকীয়– ২৯ মার্চ, ১৯৭১।

পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে জানা অসম্ভব। রেডিও পাকিস্তানের ভাষ্য অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীই মূলত পূর্বাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। ভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী শেখ মুজিবুর মুক্ত, ১৬ হাজার শক্তিশালী পূর্ব পাকিস্তানী (বাঙালি) রাইফেলস সদস্য ও পুলিশ টিক্কা খানের বাহিনীর মোকাবিলা করছে এবং দু'দিনের জনযুদ্ধে বিপুলসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছে (সংখ্যা ১০ হাজার না লাখ, জানা নেই)। এখন স্পষ্টতই পৃথিবী জেনে গেছে পাকিস্তান টুকরা হয়ে গেছে; অলৌকিক কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া পাকিস্তানকে আর এক করা সম্ভব নয়।

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, বিশ্বাস করার কারণ নেই। ইতিহাসের জঘন্য রক্তাক্ত অধ্যায়– ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ডে যা করেছে, ফরাসিরা আলজেরিয়াতে যা করেছে এবং এ ধরনের আরও অনেক ঘটনার ব্যাপারে অন্ধ থেকে ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীর বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংহতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। এর ফলাফল যদি এতোটা ট্র্যাজিক না হতো তার আশা হাস্যকর ঠেকত। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুর আধিপত্যে গঠিত কৃত্রিম পাকিস্তানে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ওপর আনুগত্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন- যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জনগণ শেখ মুজিবুর এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তাঁর দাবিকৃত স্বায়ত্তশাসনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে। মৃত-জন্ম গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করা শেখ মুজিবুর সামরিক শাসন জারির পর পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং সম্ভাব্য কনফেডারেশনের স্বার্থে তিনি বিশেষভাবে নমনীয় থেকেছেন। কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার দায় প্রেসিডেন্টেরই, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ক্ষমতা আছে- ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনী ও যুদ্ধবিমান দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলোর সাময়িক বিজয় তিনি হয়তো দেখতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘ

মেয়াদে সেনা ঘাঁটি থেকে হাজার মাইল দূরে তাঁর সেনাদল দিয়ে তিনি কেমন করে আশা করেন যে গেরিলা যোদ্ধাদের পরাস্ত করবেন– যে যুদ্ধ তেতে উঠবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিতে, যে যুদ্ধ চলতে থাকবে অনির্দিষ্টকাল ধরে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গম গ্রাম্য প্রান্তরে? সমঝোতাকারী কাউকে চোখে পড়ছে না– ভারত তো নয়ই। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই জড়িয়ে পড়া ভারতের জন্যও নিশ্চয়ই সুখের খবর নয়, কারণ এর ধাক্কা অশান্ত পশ্চিমবঙ্গকেও আঘাত করার আশঙ্কা সৃষ্টি করবে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও বায়ফ্রার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার দুঃখজনক স্মৃতির তাড়া খেয়ে ব্রিটেনের পুনরায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

কেবল ইয়াহিয়া খানের শুভবুদ্ধির উদয় হলেই এই ট্রাজেডির দীর্ঘায়িত হওয়া রোধ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর অঙ্গীকার সংঘর্ষের দিকেই।

'ভুট্টোর বক্তব্য স্ববিরোধী'–দ্যা ডন প্রতিবেদন, ১৬ মার্চ, ১৯৭১

তেহরিক-ই-ইশতিকলাল পার্টির প্রধান সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খান ১৫ মার্চ পেশোয়ারে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোকে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রস্তাব পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টো দিয়েছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

পেশোয়ার জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তিনি বলেন, ভুট্টোর প্রস্তাব পাকিস্তানের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

আসগর খান বলেন, 'ভুট্টোর বক্তব্য স্ববিরোধী। একদিকে ভুট্টো সাহেব পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের প্রদেশগুলোকে একীভূত করার বিরোধিতা করেছেন, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাচ্ছেন।'

রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বলে কিছু নেই মর্মে মন্তব্য করেন তিনি।

এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন। তিনি এ সময় সঠিক চিন্তার মানুষদের দেশের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। নিজের বক্তব্যের পুনরুক্তি করে তিনি বলেন, ক্ষমতা উপযুক্ত জায়গা– অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছেই হস্তান্তর করা উচিত।

শেখ মুজিবুর রহমানই বর্তমানে পাকিস্তানকে একত্রে ধরে রেখেছেন মন্তব্য করে আসগর বলেন, পূর্ব পাকিস্তান যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। দাবিয়ে রেখে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা মানে সঙ্কটকে কেবল সাময়িকভাবে স্থগিত করে রাখা– এটা সঙ্কটের কোনো সমাধান নয়।

আসগর খান আরও বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকারের সর্বাধিক নিশ্চয়তা চেয়েছে এবং ছয় দফাকে পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এবং সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনযাপনের জন্য মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

স্রষ্টা ও অখণ্ড পাকিস্তানের নামে, নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয়, ৩১ মার্চ, ১৯৭১

'স্রষ্টা ও অখণ্ড পাকিস্তানের নামে' পশ্চিম পাকিস্তানী প্রাধান্যের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ওপর নির্মম সেনা আক্রমণ চালিয়ে স্রষ্টা ও পাকিস্তান উভয়কেই অসম্মানিত করেছে। বাঙালিরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নিজেদের জন্মভূমির জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছিল।

সেনা আক্রমণের সময় যেসব সংবাদদাতা ও কূটনীতিক পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তাঁরা যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে নিরস্ত্র জনতার ওপর নোংরা সামরিক আক্রমণে যে 'ঐক্য' সৃষ্টি হবে, তার যে আদল, তা অর্থহীন হবে, এর কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ভাইদের ওপর পশ্চিমা বাহিনীর যে বর্বরতা প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা বাঙালিদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এবং দুই অংশের মধ্যে যে সমঝোতা সম্ভব নয়, সেই যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

যদিও বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, পাকিস্তানের এই সংগ্রামের ভয়াবহ এক আন্তর্জাতিক পরিণতি ঘটতে পারে। বিশেষ করে যদি একটি মেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। এ অবস্থায় বিশ্ব সম্প্রদায় সবচেয়ে কম হলেও যেটুকু করতে পারে তা হচ্ছে, মানবতা ও কাণ্ডজ্ঞানের দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে রক্তপাত বন্ধ করতে বলা এবং জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করতে ও প্রশিক্ষণ দিতে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে, যুক্তরাষ্ট্রের এখন বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে ইয়াহিয়া সরকারকে যেকোনো ধরনের সামরিক সহায়তা প্রদান স্থগিত রাখা। কেবল এই শর্তে অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রাখা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট ক্ষতের উপশম করতে প্রদত্ত সহায়তার সিংহভাগ ব্যয় করতে হবে।

'পাকিস্তান ট্র্যাজেডি' দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট সম্পাদকীয়, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পাকিস্তানের অধিকতর জনবহুল পূর্বাংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পথে এগোচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারত ব্যবচ্ছেদের পর থেকে মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ পূর্বাংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও শোষণ করে আসছে। তাই পূর্বাংশের হুমকি শাসকেরা ঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন এবং ক্ষমতা অর্পণ না করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছেন। পূর্বাংশকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে অখণ্ড পাকিস্তান ফেডারেশনের আওতায় ধরে রাখার জন্য কোনো সাংবিধানিক ফর্মুলা উদ্ভাবন করা যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা সফল হচ্ছে, নাকি ভেস্তে যাচ্ছে, এর কোনটা পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনেরা অনুধাবন করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে কোনো ধরনের আভাস না দিয়ে কিংবা সশস্ত্র উসকানি ছাড়াই গত শুক্রবার রাতে মেশিনগান, রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে, ট্যাংক থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে মূলত নিরস্ত্র অথবা স্বল্প প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের ওপর। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

যে, হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে– এ সংখ্যাটি কেবল অনুমানই করা সম্ভব। কারণ পাকিস্তান সরকার সংবাদের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করেছে এবং সব বিদেশি সংবাদদাতার নেওয়া নোট ও ছবির ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্বাংশ ঢাকার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে দাবি জানিয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অর্থবহ রাজনৈতিক আনুগত্য লাভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি অলীক কল্পনামাত্র। কিছুকাল আগেও ঢাকায় মধ্যপন্থীদের ধারণা ছিল, পাকিস্তান ফেডারেশনের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলবে। মধ্যপন্থীরা নীরব হয়ে গেছে, কারণ দেশজুড়ে রাজনৈতিক অনুভূতির জোয়ার এখন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে– স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশ মানে বাঙালিদের দেশ। সহস্র মাইল ভারতীয় ভূখণ্ডের দ্বারা আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন বাংলা। সেই সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা এবং সবশেষে এই রক্তপাত পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার দূরত্ব আরও বাড়িয়েই দিয়েছে। এসময় বাঙালিদের প্রতিরোধের ধরন কেমন হবে তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না, ঘটনাই বলে দেবে পরিণতি কী।

যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদবিরোধী শক্তি হিসেবে পাকিস্তানকে এতো বছর ধরে যেভাবে অস্ত্রে সজ্জিত করছে এবং উন্নয়নের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে, তা যে কতটা অপ্রাসঙ্গিক, বহিরাগত ব্যক্তিরা যে চোখ দিয়ে পাকিস্তানকে দেখছে, তাতে এটা স্পষ্টই ধরা পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র গ্রহীতা সরকার নিজ দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই সেই অস্ত্র ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু আসল ট্র্যাজেডি তো পাকিস্তানেরই।

আরেক চেঙ্গিস–দ্য হংকং স্ট্যান্ডার্ড সম্পাদকীয়– ২৫ জুন, ১৯৭১

নির্মমতা ও কসাইবৃত্তির প্রতিশব্দ হিসেবে ৪০০ বছর ধরে চেঙ্গিস খানের নাম উচ্চারিত হয়ে আসছে। বিংশ শতকে তাঁর নামের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন একজন পাকিস্তানীকে মনে হচ্ছে, এই বীভৎস পূর্বসূরি খুনিকে হারিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি। তিনি টিক্কা খান।

পাকিস্তানীদের কাছে এই জেনারেল শান্তিদাতা, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের শান্ত করতে এসেছেন। তিনি কমান্ড করছেন ভয়ঙ্কর পাঞ্জাবি ও পাঠান বাহিনীর, যারা মরিয়া হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ রক্তস্রোত বইয়ে দিচ্ছে।

তাদের নির্মম খুন, কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশু হত্যা, ধর্ষণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের 'পতিতা' সরবরাহ এবং সর্বাত্মক উন্মত্ততা, খামখেয়ালিপনা ও রক্তলোলুপতায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

চেঙ্গিস খান তাঁর ভয়ঙ্কর নির্মমতায় জীবনে অন্তত একটা সাম্রাজ্য গড়তে পেরেছিলেন। আর টিক্কা খান ও তাঁর উর্দি পরা কসাই সাঙ্গোপাঙ্গদের ইতিহাস মনে রাখবে একটি জাতির বৃহদাংশের ধ্বংসকারী হিসেবে।

কাণ্ডজ্ঞানহীন জীবননাশ–জাম্বিয়া ডেইলি মেইল, ১৪ জুন, ১৯৭১

ট্যাংক, গোলা, দুর্ভিক্ষ– মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন জীবননাশের এই বাস্তবতায় বিশ্বকে অবশ্যই সজাগ হতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কয় মাস আগে শুরু হওয়া এই দ্বন্দ্বে গুলিবিদ্ধ হয়ে, অনাহারে ও রোগে ভুগে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। মৃতের প্রকৃত সংখ্যা কত জানা যায়নি; হয়তো কখনোই জানা যাবে না। পাকিস্তানের সরকারি বাহিনী গণহত্যা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

প্রতিটি সরকারেরই বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, পাকিস্তানের বেলায় নিহতের সংখ্যা আতঙ্কজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন মনে হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আরও বাঙালি নিধনে সহায়তা–ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ, ৩০ জুন, ১৯৭১

পাকিস্তানের নির্মম ও অত্যাচারী শাসনযন্ত্রকে আরও অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত (যুক্তরাষ্ট্র) সরকার নিয়েছে, তা একই সঙ্গে অদূরদর্শী ও অমানবিক।

কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দিলে তাকে অবরোধ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো আখ্যা দিয়ে পাকিস্তান সরকার অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে। আমরা জানতে চাই, যে অবরোধ আমরা চাচ্ছি, তা নির্বিচার খুন ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে এতোই কি নিন্দনীয়? পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় মানুষের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বাধীন সেনাবাহিনী যে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে অবরোধ প্রত্যাশা কি সঠিক নয়?

২৫ মার্চের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দুই লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে, আর ৬০ লাখ মানুষকে প্রাণের ভয়ে শরণার্থী হিসাবে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এ ধরনের শাসন অব্যাহত রাখতে আরও অস্ত্র পাঠানোর কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা নেই।

অযৌক্তিককে যৌক্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠায় পররাষ্ট্র দপ্তরের কোনো জুড়ি নেই। এখন তারা ব্যাখ্যা করছে, অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করে দিলে পাকিস্তানের কাছ থেকে যে সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র পেয়ে থাকে, তা আর বহাল থাকবে না– যদিও এখন আমরা সে রকম কোনো সুবিধাই পাচ্ছি না।

আর আমাদের অস্ত্রের চালান বন্ধ করে দিলে পাকিস্তান, কমিউনিস্ট চীনের মতো দেশের দিকে হাত বাড়াবে। পররাষ্ট্র দপ্তর অবশ্য স্বীকার করেছে, চীন পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ কখনোই বন্ধ করেনি।

ম্যাসাচুসেটসের ডেমোক্রেট সদস্য অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, এটা দ্বিমুখী বক্তব্য অথবা অযোগ্যতা কিংবা উভয়ই। তিনি ঠিকই বলেছেন।

পাকিস্তানের অর্থনীতি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, সে প্রশ্নে আমাদের আন্তর্জাতিক সহযোগীদের কেউই যুক্তরাষ্ট্রের মতো মুখচোরা নয়। বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাজ্য, কানাডা,

বেলজিয়াম ও অন্যরা মনে করছে, যত দিন না পাকিস্তানের সামরিক শাসক পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হচ্ছে, তত দিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থগিত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে নেই।

সন্দেহ নেই, পাকিস্তান অত্যন্ত দরিদ্র এবং প্রাপ্ত সাহায্যের পুরোটাই তার কাজে লাগবে। কিন্তু এ সময় সাহায্য প্রদানের সমস্যা হচ্ছে, এটা সরকারকে সমর্থন জোগাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর দখল বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র হস্তক্ষেপমুক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বশাসনের পক্ষে নিরঙ্কুশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিনিময়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পেয়েছে গণহত্যার মতো আঘাত, যা এখনো নির্লজ্জের মতো তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাস বলে, তবুও পশ্চিম পাকিস্তান এক হাজার মাইল দূর থেকে চিরদিন বাঙালিদের আজ্ঞাবহ হিসেবে রাখতে পারবে না।

পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠিয়ে আমরা যা করছি, তা বাঙালিদের চিরকাল মনে করিয়ে দেবে, তাদের প্রিয় বাংলাদেশের জন্মযন্ত্রণার সময় আমেরিকার অস্ত্র তাদের হত্যা করেছে।

শরণার্থী-সমস্যা, নোবেলজয়ী আলফ্রেড কাস্টলার, লা ফিগারো, প্যারিস ৮ অক্টোবর, ১৯৭১

হিরোশিমা ছিল প্রচণ্ড এক আঘাত। মুহূর্তের মধ্যে শত-সহস্র মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেল। এই আঘাত আমাদের বিবেক জাগাল, আমাদের সচেতন করে জানিয়ে দিল, আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে মানুষের মেধার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলো জীবন রক্ষার সাফল্যের আগেই মৃত্যু নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হলো। অথচ আমাদের শিক্ষা ছিল, আমাদের বিপরীত দিকে যাদের অবস্থান, আমাদের শত্রু হলেও তারা আমাদের মতোই মানুষ।

যে সময় হিরোশিমার ঘটনা ঘটেছে, সে সময় এ ধরনের ট্র্যাজেডির ব্যাপকতা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। হিরোশিমা ঘটনার শিকারদের মধ্যে তারাই ছিল ভাগ্যবান, যারা মৃত্যুবরণ করতে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতেই পারেনি। ভিয়েতনামে নাপাম বোমার আগুনের নিচে ড্রেসডেনের শত-সহস্র মানুষ যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, সেই ট্র্যাজেডি ছিল আরও বেশি ভয়ঙ্কর। সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাখ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু নাৎসি হত্যাযজ্ঞের সময় যেভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনেছে, তা কি আরও ভয়াবহ ছিল না?

একই মাপের আরেকটি ট্র্যাজেডি এ মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, অথচ সবাই নির্বিকার। পত্রিকার এক অনুচ্ছেদ সংবাদ যা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, আমাদের জানিয়েছে পাকিস্তানী শরণার্থীদের জন্য যে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে তা অতি সামান্য এবং এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। খাবার ও রসদ সরবরাহ থেমে গেছে– এটা নিশ্চিত। এখন থেকে কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটবে। এখনই যদি ব্যাপক খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে আগামী কয়েক মাসে তিন থেকে পাঁচ লাখ বা তারও বেশি শিশু মৃত্যুবরণ করবে।

এটা কি করে সম্ভব, এই ট্র্যাজেডি আমাদের চোখে পড়বে না। আমরা সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকব, আমরা এই শিশুদের যন্ত্রণা কিছুমাত্র অনুভব করব না। এই শিশুদের মায়েদের হতাশার মুখোমুখি বিবেকহীন দাঁড়িয়ে থাকব?

মানবজাতির মুক্তির জন্য রোমে যে ধর্মসভা হয়ে থাকে তা কি এ অবস্থার পরও শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকবে? এই অবস্থাকে বিবেচনায় না এনে যে ট্রাজেডি আমাদের সবার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে জাতিসংঘ কি কেবলই বকবক করে যাবে? বিবেক জাগাতে কোনো আঘাত কি আসবে না– এই গ্রহে মানুষের সংহতি দৃঢ় করতে?

মানবতা যদি নির্বিকারভাবে এই ট্র্যাজেডির কেবল সাক্ষী হয়েই থাকে, তাহলে নিজ থেকে এর ধ্বংসের সময় কি এখনো আসেনি?

সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কান্না, দ্য পালাভার উইকলি, ঘানা, ৮ জুলাই, ১৯৭১

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাড়ে সাত কোটি মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তপিপাসু সামরিক জান্তা মানব ইতিহাসের একটি জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছে। বস্তুনিষ্ঠতার জন্য খ্যাত অনেক সংবাদপত্র ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মাধ্যমে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ এই গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেছে।

যেসব সাক্ষ্য ও প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, তাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ভয়াবহ গণহত্যা ঘটানো হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নির্মমভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতিমান অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, ছাত্র-নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের নিঃশেষ করে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত এই হত্যাযজ্ঞ একে বীভৎস গণহত্যাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। এই গণহত্যা এখনো চলছে।

আজ সবারই জানা, এই নির্মম নারকীয় হত্যাযজ্ঞের যারা শিকার, প্রতিরক্ষাহীন সেই মানুষগুলোর অপরাধ– তারা তাদের দেশের ২৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারা একই সঙ্গে নির্বাচিত করেছে তাদের পছন্দের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে।

শেখ মুজিব ও তার দলের একমাত্র অপরাধ- তারা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেশের যে অংশে তাদের অবস্থান, সে অংশের ঔপনিবেশিক মর্যাদা বদলে সংযুক্ত পাকিস্তান ফেডারেশনে একটি সম্মানজনক অবস্থানের দাবি জানিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর ত্রাস ও বর্বরতার রাজত্ব কায়েম করেছে।

পাকিস্তানের কাছে এক নম্বর শত্রু বিবেচিত ভারত নিজ দেশে জন বিস্ফোরণ সত্ত্বেও মানবিক কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অসংখ্য শরণার্থীকে ঠাঁই দিতে যতটা সম্ভব সবই করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে যাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে– এখন প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার শরণার্থী ভারত যাচ্ছে। যে সরকার তার লাখ লাখ নাগরিককে

অন্য একটি দেশে চলে যেতে বাধ্য করে, সেই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার রয়েছে কি না, সেটাই প্রশ্ন।

যে পরিস্থিতির খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ভারতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীরা শিগগির নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবে– সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নতুন যে সাংবিধানিক প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন, তা সংখ্যালঘুর একচেটিয়া শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা। অতএব জাতিসংঘ এবং বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের উচিত পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করা, যাতে এখনই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কেবল এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভব, যেখানে ভয় বা নির্যাতন বা আরও খারাপ কিছুর আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে লাখ লাখ শরণার্থী আবার নিজ দেশে ফিরে যেতে শুরু করবে।

বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং জাতিসংঘের মহাসচিব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যারা বিবেকবান, সঠিক চিন্তার মানুষ, পালাভার তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই স্বরে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যে নৃশংসতা চালিয়েছে, তার নিন্দা জানাচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটছে প্রতি ঘণ্টায়, দ্য লিবিয়ান টাইমস, ৪ মে, ১৯৭১

মস্কো (এপি-ইউপিআই) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত এম আরশাদ হুসেইন গতকাল সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, মস্কোতে কর্মরত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ দিন আগে আরশাদ হুসেইন মস্কোতে পৌঁছেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিস্ফোরণন্মুখ পরিস্থিতি নিয়ে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খানের দূত হিসেবে তার এ সফর।

তাসখন্দ আলোচনায় (১৯৬৫) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কোসিগিন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সর্বশেষ প্রধান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। শুক্রবার রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, পূর্ব পাকিস্তানের গণযুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েত নেতার দ্বিতীয় চিঠিটি ইয়াহিয়া খানের হাতে পৌঁছেছে।

এরই মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান ঢাকা ও কলকাতায় নিজ নিজ ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করে দিয়েছে; কিন্তু নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দলিল-দস্তাবেজ পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে কেমন করে ফিরিয়ে আনবে, সে বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি।

উপমহাদেশের প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং দুই সরকার একের পর এক প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের অনুরোধে একটি দ্বি-পক্ষীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে দুটি কূটনৈতিক মিশনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার কলকাতায় স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না বলে ভারতকে জানানো হয়।

কার্যত কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ১৮ এপ্রিল থেকেই বন্ধ। তখন পূর্ব পাকিস্তানী বিদ্রোহী কূটনীতিবিদেরা কলকাতা অফিসকে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বৈদেশিক মিশন হিসেবে ঘোষণা দেন।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে পাকিস্তান সরকার কলকাতায় সে দেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানায়।

প্রকৃতপক্ষে সেখানে কর্মরত ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জনই পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী কূটনীতিক।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, কলকাতায় পাকিস্তানী মিশনে কর্মরত সবাইকে ফেরত পাঠানোর যুক্তি ভারত অবশ্যই মেনে নেবে না। তিনি বলেন, যারা যেতে চায় যাবে, কিন্তু ভারত ছাড়ার জন্য অন্যদের ওপর বল প্রয়োগ করা হবে না।

মুখপাত্র বলেন, একইভাবে ভারত সরকারও ঢাকা থেকে ভারতীয় কূটনীতিক ও কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা ভারতে আসতে চান, কেবল তাঁদের ফেরত পাঠানোর ওপরই জোর দিচ্ছে।

এ মিশনের দলিল-দস্তাবেজ কেমন করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে, তা-ও দুই দেশকেই ঠিক করতে হবে। পাকিস্তান জোর দিয়ে বলেছে, পারস্পরিকতার নীতি (প্রিন্সিপাল অব রেসিপ্রসিটি) কঠোরভাবে মানতে হবে।

কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের সর্বশেষ খবর হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ভারতীয় মিশনের এবং কলকাতায় পাকিস্তানী মিশনের পদগুলোর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির ঘোষিত চূড়ান্ত সময় পার হয়ে গেছে।

ঝড়ের পর যন্ত্রণা

হেনরি ব্র্যাডশিয়ার, দি ইভনিং স্টার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

হংকং: 'ঘূর্ণিঝড় এখনো হয়তো তার পুরো পাওনা বুঝে নেয়নি।' জুলফিকার আলী ভুট্টো ৪ মার্চ এক সাক্ষাৎকারে ভেতরের তথ্যটি এভাবেই ফাঁস করেছেন। এর মানে, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, আমলা, ভূস্বামী ও অভিজাত শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে আরও রক্ত ঝরাতে চায়।

তিন সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার সেই রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। যদিও পাকিস্তান সরকার দাবি করছে, লড়াই কার্যত শেষ হয়ে এসেছে। বাস্তবে দুই অসম অংশের মধ্যে গণযুদ্ধ হবে অনেক দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তাক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা কত, তা হয়তো কখনো জানা হবে না। তেমনি কারও জানা হবে না, এই গণযুদ্ধে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা কত। কারণ, পাকিস্তান সরকার তথ্য গোপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের মতো করে সংবিধান প্রণয়নের যে অধিকার অর্জন করেছে, নির্বাচনের সময় থেকেই ভুট্টো তা অস্বীকার করে আসছেন।

সামন্ত ভূস্বামী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মেধাবী কিন্তু সুযোগসন্ধানী জুলফিকার আলী ভুট্টো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনে জেতেন। কিন্তু তিনি যেভাবে রহমানের (শেখ মুজিবুর রহমান) কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, তাতে গরিবের নয় বরং পশ্চিমের অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করা হচ্ছে।

ভুট্টোর বর্জনের হুমকির কারণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে হতাশ রহমান ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, যা শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণে এসে ঠেকেছে। তাঁর দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা প্রেরণের খবর আসা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় বিমান সংস্থা ও ঢাকা এয়ারপোর্টের কর্তৃত্ব সরকারের হাতে আছে। জাহাজযোগেও পূর্ব পাকিস্তানে সেনা প্রেরণের অসমর্থিত সংবাদ পাওয়া গেছে।

তবে বন্দরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, এখানে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা সেনাবাহিনীর জন্য সরবরাহ করা রসদ বন্দরে নামাতে দিচ্ছেন না। রহমান সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। সীমিত রেশনের ওপর তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান হচ্ছে, সংকট শুরুর আগে পূর্ব পাকিস্তানে ২৬ হাজার সেনা অবস্থান করছিল– যেখানে লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটিরও বেশি। যখন লড়াই শুরু হলো, পাকিস্তানী সেনাসংখ্যা দাঁড়াল ৩০ হাজার বা তারও কিছু বেশি।

গত বুধবার (২৮ মার্চ ১৯৭১) সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির আলামত দেখা গেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে গোলাবারুদ ভর্তি একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করছে। ডক শ্রমিকেরা তা বন্দরে নামাতে অস্বীকার করছে। আওয়ামী লীগের বাধা সত্ত্বেও বুধবার সেনাবাহিনী গোলাবারুদ নামানোর চেষ্টা করে।

চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত অসমর্থিত সংবাদে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর চলাচল সীমিত করার জন্য রাস্তার ব্যারিকেড উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার সময় সংঘর্ষ হয়েছে এবং শহরে ১৪টি ট্যাংক নামানো হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাগরিকদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। মৃতের সংখ্যা ৫০ হতে পারে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি কূটনীতিক বদল

স্টেটসম্যান, ভারত, ২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

জাতিসংঘ সদর দপ্তর, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদে থাকা বাঙালি কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিচ্ছে। পিটিআই রিপোর্ট।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্কে পাকিস্তানের কনসাল জেনারেল এম এন আই চৌধুরী, ওয়াশিংটনে রাজনীতিবিষয়ক মিনিস্টার এনায়েত করিম এবং তাঁর সহকারীকে হয় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা তাঁদের দায়িত্বে অন্য কোনো পাকিস্তানী কর্মকর্তাকে বসানো হয়েছে।

বাঙালি ভাইস কনসাল এ এইচ মাহমুদ আলী ইসলামাবাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজের ও স্ত্রীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।

ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাস দাবি করছে, মাহমুদ আলীকে ঘানায় বদলি করা হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি আগাম ভ্রমণ ভাতাও তুলেছেন– আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ তাকে বিপদাপন্ন করা হবে না। তবে মাহমুদ আলী জানিয়েছেন, তাঁকে প্রথম আক্রায় যোগদান করার আদেশ দেওয়া হলেও ২১ এপ্রিল সে আদেশ বাতিল করে অবিলম্বে ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলী সাংবাদিকদের সে আদেশ দেখিয়েছেনও।

নেতৃস্থানীয় বাঙালি কূটনীতিবিদদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পাকিস্তান দূতাবাস নিশ্চিত না করলেও জানা গেছে, নিউইয়র্কে কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব হায়াত মেহেদি নামের একজন পশ্চিম পাকিস্তানী কূটনীতিককে দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে রাজনীতিবিষয়ক মিনিস্টার এনায়েত করিমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে অটোয়ায় পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর জাকিকে।

মার্কিন সূত্র জানিয়েছে, মাহমুদ আলীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হোক বা না হোক, তাঁকে সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে দেওয়া হবে।

বেয়নেটের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থা

ভেচের্নিয়ে নোভোস্তি, যুগোস্লাভিয়া, ৮ জুলাই, ১৯৭১

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের জবাবে সামরিক আক্রমণের তিন মাস পর এই প্রথম বিদেশি সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে দেওয়া হয়। চাপিয়ে দেওয়া সফরসঙ্গী ছাড়াই তাঁরা ঘুরে দেখার অনুমতি পেয়েছেন। যদিও এতোদিনে ধ্বংসের আলামত সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তারপরও যেটুকু রয়ে গেছে, তা আগের নৃশংসতার সাক্ষ্য দিতে যথেষ্ট।

রাজধানী শহর ঢাকা এখনো আতঙ্ক, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ছায়ায় ঢাকা। রাস্তায় লোকজন ফিসফিস করে কথা বলে। অসমান রাস্তায় গাড়ি তেমন বেরই হয় না। এটাকেই সরকার বলছে 'স্বাভাবিক অবস্থা'। স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করতে ভয়াবহ শাস্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। গোপনে কেউ যদি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনে, কঠোর শাস্তি হয় তার। অধিকাংশ দোকানপাট এখনো বন্ধ। গাড়ির নাম্বার প্লেটে বাংলা মুছে ইংরেজি লেখা হয়েছে। খালি রাস্তায় ও দোকানে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। সেনাবাহিনী এখনো বাঙালিদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গ্রেপ্তার করছে এবং কখনো কখনো হত্যাও করছে।

যদিও ট্যাংক ও রকেটের আলামত সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ধ্বংসের ও আতঙ্কের ছাপ রয়ে গেছে পুরান ঢাকায়। শহরের সবচেয়ে গরিব শ্রেণীর মানুষ এখানে বসবাস করে এবং তারা আওয়ামী লীগের একান্ত সমর্থক। অবিশ্বাস্য শ্লথগতিতে হাটবাজার ও নোংরা সরু রাস্তায় জীবন ফিরে আসছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ হিন্দু। তারা নির্মমভাবে খুন

হয়েছে, না হয় ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকার রাস্তায় সেনাসদস্য তেমন নেই; রয়েছে বিশেষ পুলিশ স্কোয়াড। ভালো করে তল্লাশি করতে তাদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছে। সেখানে গ্রেপ্তার অব্যাহত রয়েছে।

বন্দুকের মুখে যে ৬৫ লাখ পাকিস্তানী ভারতে পালিয়ে গেছে তাদের ৪০ লাখই হিন্দু। সরকার তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তাদের বাড়িঘর পাবে সরকারের 'অনুগত' নাগরিকেরা।

পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হতে হবে

দ্য নিউ নেশন, সিঙ্গাপুর, সম্পাদকীয়, ৬ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে যা ধারণা করা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে অপসারিত চাক্ষুষ সাক্ষী বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ তার চেয়েও ভয়াবহ।

পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা গণহত্যারই কাছাকাছি। যত নিন্দনীয় হোক না কেন সেনাবাহিনীর হাতে বিদ্রোহ দমন পিকনিক নয়, এতে কিছু সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু ঘটতেও পারে। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী যা করেছে তা শক্তির বৈধ প্রয়োজনের সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা খেলাচ্ছলে নারী ও শিশুসহ নিরস্ত্র জনগণকে হত্যার পথ বেছে নিয়েছে, নগ্ন সন্ত্রাস চালিয়ে আনুগত্য অর্জনের পরিকল্পিত আক্রমণে মেতে উঠেছে।

আর এ কাজে কিন্তু সেনাবাহিনীর কোনো সাফল্য আসছে না, যদিও অসংগঠিত এবং লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই অনির্ধারিত। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ প্রতিদিনই জোরালো হয়ে উঠছে। আর সেই সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব বড় শহরের সীমানা অতিক্রম করতে পারছে না।

পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনায় আনলে কার্যত দেশের আপামর জনগণের এই অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করতে হলে এখনকার আনুমানিক ৭০ হাজার সৈন্যের বহর বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এখন থেকে ছয় সপ্তাহ পর যখন বর্ষা মৌসুম শুরু হবে, তখন সেনাবাহিনীর গতিশীলতা ও যোগাযোগ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে।

এমনকি এখন পাকিস্তানী সরকারি প্রতিবেদনগুলোও লুকোতে পারছে না যে, ঘোষিত স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার সুদূরপরাহত। কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে আর সরকারি দপ্তরগুলোতে চলছে গণগরহাজিরা।

সেনাবাহিনী নামিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জন্য একটি বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এই নির্মম মাত্রার কাণ্ডজ্ঞানহীন হত্যাযজ্ঞ কেবল পাকিস্তানের বিষয় বলে বিবেক তা চালিয়ে যেতে দিতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। ভারত, রাশিয়া ও ব্রিটেন রাওয়ালপিন্ডির কাছে হত্যাযজ্ঞের যৌক্তিকতা জানতে চেয়েছে। এই উদ্যোগে অন্য সব দেশকেও এগিয়ে আসতে হবে– বলতে হবে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের পণ্ডিতি ব্যাখ্যা শুনিয়ে বিশ্বমানবতার কণ্ঠ রোধ করে রাখা যাবে না।

বাংলায় গণহত্যা, এক্সপ্রেসেন স্টকহোম, সম্পাদকীয়, ১২ এপ্রিল, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমানকে যে বন্দী করা হয়েছে, তা প্রমাণ করতে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি আলোকচিত্র অবমুক্ত করেছে। তাঁর বন্দীদশার ছবিটি দেখিয়ে সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দিতে চায়। প্রশ্ন, ছবিটি আগে ছাড়া হলো না কেন? কোন তারিখের ছবি তা-ই বা উল্লেখ করা হয়নি কেন? তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন দেখাচ্ছে না?

তবে এটা স্পষ্ট, ইয়াহিয়া খানের শাসন যে কোনো মূল্যে তাঁর (শেখ মুজিব) শহীদ হওয়ার সুযোগ প্রতিহত করতে চাইবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কারাবন্দী শেখ মুজিবকে দেখার যে অনুভূতি পূর্ব পাকিস্তানে জন্মাবে, তা কি পরিস্থিতি পাল্টে দেবে? তাঁকে নিয়ে কিংবা তাকে ছাড়া (বন্দিদশায় রেখে) যে অবস্থায়ই হোক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের আর পিছু হটার পথ নেই।

সত্য গোপন করার জন্য সামরিক সরকারের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখন জানি পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে। শরণার্থীরা ব্যাপক গোলাবর্ষণ, বেপরোয়া ধ্বংসযজ্ঞ এবং গণহত্যার সাক্ষ্য দিয়েছে।

শত সহস্র মানুষ তাদের ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ হানা দিয়েছে। পকিস্তানের ঐক্য অটুট রাখতেই হবে- এই প্রণোদনার নামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি শত্রুতার অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য সামরিক জান্তা সহিংস শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হজম করার প্রস্তুতি পাকিস্তানী শাসকদের ছিল না– উল্টো সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে। এটা স্পষ্ট, এই পদ্ধতিতে কখনোই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব হবে না। নির্মমভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা অথবা যুদ্ধ– এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

এই নীতি অনুসরণের জন্য অবশ্যই নিন্দা জ্ঞাপন করতে হবে।

পাকিস্তানী জনগণের ট্র্যাজেডির প্রতীক শেখ মুজিবুর
ল্য ইউনিটা, রোম, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী, সামরিক নেতৃত্বের হাতে কারাবন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়তি যেন পাকিস্তানী জনগণের ট্র্যাজেডির প্রতীক। পূর্ব পাকিস্তানে জান্তব নির্যাতনের সবচেয়ে বড় বলি তিনি। আতঙ্কিত মানুষের ভারতে পালিয়ে যাওয়া, অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ– সবকিছুর পরও রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম পদক্ষেপই হতে হবে আওয়ামী লীগের নেতার মুক্তি।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত চরিত্র পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এটুকু বলাই যথেষ্ট, পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে করুণ এবং তারা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। আর এর জবাবে ইয়াহিয়া খানের কাছে সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হলো আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা

দিয়ে অভিযুক্ত করা, নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেওয়া, দেশের পূর্বাংশে সামরিক আঘাত হানা এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করা।

সত্য ঘটনা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতা রেখেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুত ছয় দফা কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত।

এ অবস্থায় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব বড় ধরনের প্রশ্নের সুরাহা স্বায়ত্তশাসন ও ফেডারেল কাঠামোতে এখনো হয়নি, সেসব এড়িয়ে পাকিস্তানে শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষা এবং শক্তিশালী করার কাজটি কেমন করে হবে, তা কে বলবে।

ভারত-সোভিয়েত ২০ বছর মেয়াদি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির যৌথ স্মারকে যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা যথার্থ, প্রয়োজনীয় এবং জরুরি। আর যথাসময়ে তা করতে হলে যেসব রাষ্ট্র ও ব্যক্তি শান্তি ভালোবাসে এবং শান্তি চায়, তাদের অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতা ফ্যাসিবাদবিরোধী বীর শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য সোচ্চার হওয়া এবং মুক্তি আদায় করা।

ট্যাংক যেভাবে একটি শহর গুঁড়িয়ে দিল

নিউইয়র্ক পোস্ট, মাইকেল লরেন্টের প্রতিবেদন, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

(অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ছিলেন। তখনই বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাৎ করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাংবাদিকদের সবাইকে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আটক করা হয়। বের হলেই গুলির হুমকি। এর মধ্যেই লরেন্ট সঙ্গোপনে বেরিয়ে পড়েন এবং বিধ্বস্ত ঢাকা শহর ঘুরে ঘুরে দেখেন। শেষ পর্যন্ত অন্য বৈদেশিক সংবাদদাতাদের সঙ্গে তাঁকেও ঢাকা থেকে জোর করে বহিষ্কার করা হয়।)

ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান (এপি) : বৃহস্পতিবার রাতে কোনো ধরনের আগাম সতর্কতা ছাড়াই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সবাইকে বিস্মিত করে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের এম ২৪ ট্যাংক, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে প্রদেশের রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

সেনাবাহিনীর প্রধান নিশানা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, জনাকীর্ণ পুরান ঢাকা, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের সমর্থন সবচেয়ে বেশি এবং ১৫ লাখ মানুষের এই শহরের বাইরের শিল্পাঞ্চল।

কেবল রাজধানীতেই সম্ভবত সাত হাজার লোক নিহত হয়েছে।

শনিবার ও রোববার যাঁরা বের হয়েছেন তারা তখনও আগুন জ্বলছে এমন অনেক স্থান দেখতে পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের বিছানায় পাওয়া গেছে অগ্নিদগ্ধ ছাত্রের মৃতদেহ। ট্যাংক সরাসরি ছাত্রাবাসে আঘাত করে।

জগন্নাথ কলেজে (হলে) তড়িঘড়ি করে গণকবর দেওয়া হয়েছে। ইকবাল হলে নিহত হয়েছে ২০০ ছাত্র। তখনো ছাত্রাবাসের সামনে প্রায় ২০টি মৃতদেহ পড়ে ছিল।

সেনারা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর বাজুকা নিক্ষেপ করেছে। সেখানে হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। হাজার হাজার মানুষ হাতে যেটুকু নিতে পারে তা নিয়েই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। খাবারদাবার ও কাপড়বোঝাই ঠেলাগাড়ি নিয়ে কেউ কেউ পথ চলছে। সেনা কর্তৃপক্ষের আদেশের পরও হাতেগোনা কিছু লোক সরকারি কাজে ফিরে এসেছে।

গণহত্যা বন্ধ করো

দ্য জাকার্তা টাইমস, সম্পাদকীয়, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, প্রকৌশলী এমনকি নারী-শিশুসহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ- পূর্ব পাকিস্তানে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। এই ভোগান্তি কি সার্বিকভাবে মুসলিম জাহানের নয়?

ইসলাম কি সশস্ত্র মুসলিমের হাতে নিরস্ত্র মুসলিম হত্যা অনুমোদন করে? সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার দাবি সংখ্যালঘুর হাতে দলিত হওয়া কি ইসলামিক রীতিতে যৌক্তিক মনে করা যায়?

মুসলিম দেশগুলোর এ বিষয়ে এখনই সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। তাদের দেখা উচিত, ভালো কোনো মুসলমান যেন অপর মুসলমানের হাতে নিহত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থাগুলোরও নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। গণহত্যা বন্ধ করা এবং এ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা যা করা সম্ভব, সবই করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করতে পারেন– কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে– বিশ্ববাসী জানে শেষ পর্যন্ত তা-ই হতে বাধ্য। তাহলে পাকিস্তানের বর্তমান সংকট কি পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংকট নয়?

বীরত্বের সংগ্রাম

কোয়ং ওয়া ইত পো, পেনাং, মালয়েশিয়া, ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

গত চার সপ্তাহের গণযুদ্ধে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাংক ও বোমারু বিমানের সাহায্যে বাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা করে যুদ্ধের প্রথম পর্বে জয়লাভ করেছে। তারপরও পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে। আওয়ামী লীগের ব্যানারের নিচে পূর্ব পাকিস্তানের সব জনগণ সমবেত। তারা মৃত্যুর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত নয়, তারা সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করছে।

হত্যাযজ্ঞ যত নির্মম, আত্মদান তত বড়। যদিও আমরা নির্ভরযোগ্য খবর পাচ্ছি না, তার পরও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের– সমগ্র জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

পূর্ব বাংলার মানুষকে সাহায্য করুন

দ্যাগব্লাদেত, নরওয়ে, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে আঘাত করা হয়েছে, তার ব্যাপ্তি যে কত বিশাল, পৃথিবী তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। বছরের শেষ নাগাদ এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, যেখানে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে ভয়ংকর পুষ্টি সংকটের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

শরণার্থী শিবিরে যাঁরা কর্মরত, তাঁরা মনে করেন, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাহায্য না পাওয়া গেলে এক লাখ শিশু ক্ষুধাজনিত মৃত্যুঝুঁকিতে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকারের স্থাপিত শরণার্থী শিবিরে মাত্র ৩০ লাখ শরণার্থী ঠাঁই পেয়েছে। এই রাজ্যে শরণার্থী এসেছে ৫০ লাখ। তার মানে, ২০ লাখ শরণার্থী গ্রাম ও শহরাঞ্চলে রাস্তার ওপর অথবা যেখানে সামান্য ঠাঁই পাওয়া যায়, সেখানেই পড়ে আছে।

ক্ষুধা ছাড়াও এখন কলেরা চলছে। এই মহামারির প্রকোপ কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও অপুষ্টির শিকার ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এমন মানুষের মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম, তাদের প্রায় সবাই শিশু। ভয়ঙ্কর হুমকির মুখে যে এক লাখ শিশু রয়েছে, তারা ছাড়াও তিন লাখ তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে।

এই সংখ্যার ভেতরেই লুকিয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তান ট্র্যাজেডির স্বরূপ, যা বাইরের মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। এর আকার এতোই বড় যে, রায়াফ্রা ট্র্যাজেডির তুলনায় তা অনেক ছোট। অপর্যাপ্ত হলেও ত্রাণকর্ম যতটুকু হয়েছে, তা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। প্রায় ৫০ কোটি নরওয়েজিয়ান ক্রোনার সাহায্য দেওয়া হয়েছে– এতেই ট্র্যাজেডির ব্যাপকতা বোঝা যায়। আর এ অঙ্কও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনের কাজ চালিয়ে যেতে হলে আরও ৭০০ মিলিয়ন ক্রোনার প্রয়োজন পড়বে।

এই করুণ প্রেক্ষাপটে পাঁচটি নরওয়েজিয়ান ত্রাণ সংস্থা সাহায্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। ২০ সেপ্টেম্বর সাধারণ নির্বাচনের দিন ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য নির্বাচন কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের কাছে হাত পাতবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা মনে করি, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দেওয়ার আছে।

গ্রামে ঢুকে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ

শিকাগো সান টাইমস, ২৮ জুন, ১৯৭১

বলিয়ার্দি, পূর্ব পাকিস্তান (এ পি) : চারদিকে পানি। মাঝখানে হিন্দু-অধ্যুষিত একটি গ্রাম। গত রোববার (২৬ জুন ১৯৭১) এক প্লাটুন পাকিস্তানী সেনা ঢুকে পড়ে গ্রামটিতে। গুলি-চালায় নির্বিচারে। ঘরবাড়ি তছনছ করে। বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা এবং ফ্রন্টিয়ার কোরের পোশাক পরা ছিল সেনারা। তাঁদের সদর দপ্তর এই গ্রাম থেকে এক হাজার মাইল পশ্চিমে, পশ্চিম পাকিস্তানে। কমান্ডার মেজর ওমর সাংবাদিকদের নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এটা তাদের নিয়মিত মহড়ার অংশ।

মেজর সাহেবের মাথায় নীল রঙের চ্যাপটা টুপি। কিন্তু পা খালি। তাঁর স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি বহন করছে তার এক সঙ্গী। বর্ষায় শরীর শুকনো রাখতে ছাতাও আছে সঙ্গে। তারা চলে যাওয়ার পর দেখা গেল, তিনজন মরে পড়ে আছে। জনশূন্য গ্রাম দাউদাউ করে জ্বলছে। অনাচারের সাক্ষ্য বিলীন করতেই এই আগুন।

গ্রামটির এক অংশে মুসলমানদের বাস, ১০০ পরিবার। তারা গিয়ে লুকিয়েছে খালের ওপারে কিংবা পাট ক্ষেতে। দোতলা ঘরের মেঝেতে মাদুরে ওপর সাদা চুলের একজন মানুষ পড়ে আছেন– গুলি ঢুকেছে তাঁর পিঠের দিক থেকে। গ্রামবাসী জানাল, চোখের সামনে পড়ে থাকা তিনটি মৃতদেহ ছাড়াও সেনাদের পাঁচ ঘণ্টার ধ্বংসযজ্ঞে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

এটি বাঙালি প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর গ্রাম। তিনি গত মার্চে প্রদেশের নতুন সামরিক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করেছিলেন।

আক্রমণস্থল ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে; গাড়ি চালিয়ে যেতে এক ঘণ্টা লাগে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তদন্ত করতে আসা চারজন ব্রিটিশ সাংসদ পূর্ব পাকিস্তান সফরের শেষ রাতটি কাটিয়েছিলেন। সেই দিনই খবর এল, আমেরিকার সামরিক রসদ-গোলাবারুদ ও খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ে একটি জাহাজ পশ্চিম পাকিস্তানের করাচির দিকে এগোচ্ছে।

মুসলমান গ্রামবাসী এবং অনেক ছাত্র, যারা ২৫ মার্চের পর ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছিল, বলেছে, শুক্রবার (২৪ জুন ১৯৭১) থেকে সেনা সদস্যরা ছোট নৌকায় নেমে আসছে এবং ছয় মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে আঘাত হানছে।

সকাল থেকেই ওই গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল আর ধোঁয়া চোখে পড়ছে। গ্রামবাসী মনে করে, এ আক্রমণের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা যে টাঙ্গাইলের ২৮ মাইল উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের কাছে ঘাঁটি গেড়েছে বলে খবর প্রচারিত হয়েছে, তার যোগসূত্র আছে।

পূর্ব বাংলার শরণার্থী একটি বিশ্ব সমস্যা

দি অ্যাডভান্স, মরিশাস, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ভিয়েতনামে ঘৃণার আগুন নিভতে শুরু করার আগেই তার চেয়ে ভয়াবহ এক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে পূর্ব বাংলায়। ৮৫ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের সহায়-সম্পদ পেছনে ফেলে জলকাদা পেরিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে– তাতে জীবনটা তো বাঁচবে!

মার্চে যখন এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়, তখন থেকে ভারতে উপচে পড়া শরণার্থী আসছেই। ভারত এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে জর্জর। প্রায় ৫০ হাজারের মতো শরণার্থী প্রতিদিন সীমানা পেরিয়ে ভারতে পৌঁছেছে। শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে এখন লন্ডন বা প্যারিসের জনসংখ্যার সমান।

প্রথমে জনসংখ্যার এই ব্যাপক পরিবর্তনে একটি দেশের অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব পড়বে, সে হিসাব কষে মতামত জানাতে বিশ্বসম্প্রদায় দেরি করে ফেলেছিল। আর

ব্যাপারটা ঘটছে এমন একটি রাষ্ট্রে, যা স্বাধীনতার কাল থেকেই বার্ষিক বন্যা, খরা, উচ্চ জন্মহার এবং যুদ্ধের শিকার। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিশিষ্টজন, যাঁরা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, ধন্যবাদ তাদের; মানুষের স্মৃতিতে যত অভিবাসনের চিত্র রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ এই অভিবাসন।

ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা নারী ও শিশুদের ভোগান্তির কাহিনী শুনিয়েছেন। সীমান্তের ওপারে অযত্নে পড়ে আছে নারী ও শিশুদের মৃতদেহ। এতো অধিকসংখ্যক শরণার্থীর চাপ কেবল যে অর্থনীতির ওপর তা নয়; এসব রাজ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনও হুমকির মুখে পড়ছে। বস্তুগত দ্বন্দ্ব থেকে দাঙ্গা পর্যন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে।

এখনই যদি বিশ্ববাসী একত্র হয়ে কিছু করার উদ্যোগ না নেয়, তাহলে এখান থেকে শুরু হবে আরেকটি ভিয়েতনাম। পার্থক্য হচ্ছে, এর প্রভাব হবে অনেক সুদূরপ্রসারী এবং ফলাফল আরও বিপজ্জনক ...। কারণ এটা এখন আর কোনো সীমাবদ্ধ এলাকার সমস্যা নয়। এটা এখন পৃথিবীর সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কারণ পৃথিবীই এই মানুষগুলোকে বাস্তুচ্যুত করার ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

বার্ধক্য সত্ত্বেও আঁদ্রে মালরো এখানে এসে পূর্ব বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় যে লাখো মানুষের মৃত্যু ঘটছে, এই সমস্যাটি মানবিক দিক থেকে বিবেচনার জন্য তাঁর মতো অন্যান্য লেখক ও শিল্পীও আবেদন জানিয়েছেন। কলকাতার কাছে শরণার্থী শিবিরে এসে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। পৃথিবীর সব দেশের সংবাদপত্র আন্তর্জাতিক সহায়তা পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের মানবপ্রেমিকেরা বিশ্वবিবেককে জাগ্রত করার জন্য অনশন ধর্মঘট করেছেন। গতকালও কারিতাস সব মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন করেছে, তারা যেন বাংলার এই অতিকায় ধ্বংসযজ্ঞ সামাল দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠেন।

অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না

আঙ্কারা নিউজ ম্যাগাজিন, ২০-২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকার হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। কিন্তু তা সম্ভবত আর হচ্ছে না। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং যেসব প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বেসামরিক প্রশাসনে ফিরে যাওয়া খুব দুরূহ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আসল কারণটি হচ্ছে, ডানপন্থী সেনাদলটি ক্ষমতার লাগাম ছেড়ে দিতে রাজি নয়, ক্ষমতা ধরে রাখতেই আদের আগ্রহ।

জেনারেল টিক্কা খানের জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তিকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিদেশি কূটনীতিবিদ ছাড়াও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ টিক্কা খান যত দিন গভর্নরের পদ ধরে রাখবেন, শূন্য ঘোষিত জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো জুতসই কাউকে পাওয়া রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে।

সামরিক চক্র মুসলিম লীগকে সমর্থন করে, কিন্তু গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে এ দল জাতীয় পরিষদে একটি আসনও লাভ করেনি। সামরিক নেতাদের অন্য একটি বিকল্প

হচ্ছে নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন করা। কিন্তু আমিনের সেই জনপ্রিয়তা নেই।

বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান প্রস্তাব রেখেছেন, জাতীয় পরিষদকে সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবুর রহমান কারামুক্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ পাকিস্তানে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার বর্তমান শাসনাধীনে তাঁর কারামুক্তিও অনিশ্চিত।

পাকিস্তানের গল্প

দ্য বাল্টিমোর সান, সম্পাদকীয়

যখন পাকিস্তানের দুটো অংশ নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই মার্চ মাসের পাকিস্তান ট্র্যাজেডির ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। ছয়জন বিদেশি সংবাদদাতাকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকারনিয়ন্ত্রিত সফরে তাঁরা যতটুকুই দেখতে পেরেছেন, তার তথ্যবহুল বিবরণী থেকেই বেরিয়ে আসছে সে ট্র্যাজেডির চিত্র। তাঁদের একজন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) মোস্ট রোজেনব্লুম পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ব্যাংককে এসে তাঁর প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাঁর লেখায় যা উঠে এসেছে তা কসাইয়ের নির্মমতা, ঘৃণা আর ভয়ঙ্করের গল্প। একটি জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংসের প্রান্তসীমায় চলে আসার গল্প, রাজনৈতিক হট্টগোলের গল্প।

রোজেনব্লুমের অনুমান, সেখানে পাঁচ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ধ্বংসযজ্ঞের যে দৃশ্য তা অবিশ্বাস্য। লাখ লাখ মানুষ অভুক্ত। অন্যান্যের প্রতিবেদনে এটাও স্পষ্ট, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পূর্ব বাংলায় হত্যা করা হয়েছে অজানা সংখ্যক অবাঙালিকে। তাদের লেখায় এটাও স্পষ্ট হয়েছে, এই রাষ্ট্রের বর্বরোচিত বিভাজনের দায় সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের আদেশদাতাদের ওপর বর্তায়। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় মাত্র ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে– আগে বলা এই তথ্য সর্বৈব মিথ্যা। আর সম্ভাব্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান রোধ করতে সেনাবাহিনী গভীর রাতে হানা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ দাবিও মিথ্যা। কারণ এই বক্তব্যের কোনো সাক্ষ্য এখনো মেলেনি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন হতে না দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সেই প্রতিজ্ঞা থেকেই মার্চ মাসে পরিকল্পিত এই আক্রমণ চালানো হয়।

যদিও ঘটনার পরিণতি কী হবে, এখনই জানা যাবে না। তবে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পাকিস্তানের স্রষ্টারা যে দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এর সমাপ্তি ঘটেছে। ইতিমধ্যে ভগ্নদশার অর্থনীতি যেখানে এসে ঠেকেছে, সেখান থেকে উত্তরণের আর কোনো সুযোগ নেই।

পাকিস্তান ট্র্যাজেডি, দি এজ, ক্যানবেরা, সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের সাংবিধানিক সংকট গণযুদ্ধে রূপ নেওয়ার একদিন আগেও মনে হয়েছে, তিক্ত বিভাজন সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে; সেই সঙ্গে সম্ভব হতে পারে গণতান্ত্রিক বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু গত কয়েক দিনের মর্মান্তিক ঘটনা এ আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। সহিংস অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। সংবাদ মাধ্যমের ওপর আরোপিত করা নিষেধাজ্ঞা এবং বৈদেশিক সংবাদদাতাদের বের করে দেওয়ায় সত্য ঘটনা ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে, ক্ষুব্ধ বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান দাবিগুলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন– বাঙালিদের অধিকতর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবি পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্যে গঠিত সামরিক সরকার এতো দিন দাবিয়ে রেখেছে।

এ সংকটের সমঝোতা ও নিষ্পত্তির যে আশাপ্রদ দিক-নির্দেশনা দেখা গিয়েছিল তা আবার উল্টে গেল, যখন কথামতো সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেখ মুজিবুরের দল আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করল। শেখ মুজিব এর জবাব দিলেন গোপন রেডিও স্টেশন থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে। বাঙালি এ রকম একটি প্রতিরোধের প্রত্যাশায় ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এ ধরনের একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার পরিণতি কী হতে পারে, তা শেখ মুজিবের অজানা ছিল না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একে রাষ্ট্রদ্রোহ মনে করার এবং বর্বরোচিত রক্তপাতের সুযোগ নেবেন।

আপাতত মনে হতে পারে, সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহকে সামাল দিতে পেরেছে। কিন্তু শক্তিশালী একতাবদ্ধ পাকিস্তানের যে লক্ষ্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্ধারণ করেছেন, তা এখন সুদূরপরাহত বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর সেনাবাহিনী হয়তো কেন্দ্রের ছায়ায় পূর্ব পাকিস্তানে একটি শাসনব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। যে দলটি কেবল পূর্ব পাকিস্তানে অভাবিত সমর্থনই পায়নি, স্থগিত জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাভ করেছে, সেই আওয়ামী লীগকে হয়তো দাবিয়ে রাখার চেষ্টাও করা হতে পারে। এ নির্বাচনে কেবল প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের কর্তৃত্বের অবসান ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শত্রু বানিয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অনির্দিষ্টকাল একটি দেশকে ধরে রাখা যায় না। বিদ্যমান জাতিগত বিভেদ, আচার ও ভাষাগত বৈষম্য এবং ভৌগোলিক অবস্থান, অসন্তোষ ও ঘৃণার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-এর সঙ্গে যোগ হয়েছে।

গত কয়েক দিনের সহিংস হত্যাযজ্ঞ যদি ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ ইতিমধ্যেই রুদ্ধ করে না থাকে, তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো। অন্যথায় পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু সবার আগে দরকার হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা।

একটি সেন্সর করা সংবাদ
ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন

[২৭ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ ৩৫ জন বিদেশি সংবাদদাতাকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে। সাংবাদিকদের তোলা ছবি এবং তাঁদের নোট বইও বাজেয়াপ্ত করা

হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া বিদেশি গণমাধ্যমগুলোর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় পর ছয়জন বিদেশি সংবাদদাতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁদের একজন ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন-এর ৮ ও ৯ মে, ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের শুরুতে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাওয়া সেন্সর করা সংবাদ নিবন্ধ।]

ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ৭ মে : পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান আজ বলেছেন, ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তাতে ঢাকায় ১৫০জন নিহত হয়েছে।

একটি সংবর্ধনায় বক্তব্য দিতে গিয়ে টিক্কা খান বলেন, প্রায় ১০ হাজার পর্যন্ত নিহত হওয়ার হিসাবে বেপরোয়া অতিরঞ্জন রয়েছে। এই সংবাদদাতাসহ যে ছয়জনের সঙ্গে জেনারেল খান দেখা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েট প্রেস, রয়টার্স, টাইম, দ্যা ফিনানশিয়াল টাইমস অব লন্ডন এবং চায়নিজ কমিউনিস্ট প্রেস এজেন্সি জিনহুয়ার সংবাদদাতা।

গাঙ্গেয় বদ্বীপে নদ-নদীর জাল ঢাকা শহর পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হলো। যদিও প্রায় সব দোকানপাটই বন্ধ, কিন্তু রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ভালোই ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লড়াই যখন শুরু হয়, তখন শহরের অর্ধেক মানুষ গ্রামাঞ্চলে ও বনজঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেছে। এমনকি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (শেরাটন) স্বাভাবিকের ২০ ভাগ কর্মচারী দিয়ে চালানো হচ্ছে।

কিছু সংখ্যক বাঙালি বাসিন্দা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন, এখানকার 'হত্যাযজ্ঞের' খবর বহির্বিশ্বকে জানানো হয়নি।

পরিচয় যার লৌহ মানব

জেনারেল টিক্কা খান একজন কঠোর সেনা কমান্ডার হিসেবে পরিচিত। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে নির্বিচারে গণহত্যার আদেশ তিনিই দিয়েছেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

টিক্কা খান বলেছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে ছাত্র হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু আমরা ছাত্র কিংবা কোনো একক দলকে আক্রমণ করিনি। যখন আমাদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে, আমরা পাল্টা গুলি চালিয়েছি।'

জেনারেল টিক্কা আরও বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় তো বন্ধ ছিল। সেখানে যারা ছিল তাদের থাকার কোনো কারণ ছিল না। যারা ভেতরে ছিল, তাদের বেরিয়ে আসতে বলেছি, তখন তারা গুলি চালায়। আমাদের তখন পাল্টা গুলি চালাতে হয়েছে।'

'আমি সব সময়ই বিশ্বাস করেছি, তাৎক্ষণিকভাবে শক্ত ব্যবস্থা নিলে পরের ক্ষয়ক্ষতি যা সাধারণত ঘটে থাকে, এড়ানো সম্ভব হয়'– দাবি টিক্কা খানের। সামরিক গভর্নর দাবি করেন, পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তিনি এখন ঢাকায় সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়ার কথা ভাবছেন।

তবে টিক্কা খান স্বীকার করেন, বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ভেতরের দিকে আসা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের সেতু ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় কিংবা অন্য কোনো বাধার কারণে এখনো চালু করা যায়নি। তিনি বলেন, 'এখন আমাদের প্রধান কাজ অতীত ভুলে যাওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের পুনর্গঠন করা। যদি দেশের সব মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলে আমরা আশা করি, এক বছরেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।'

জেনারেল খান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বহুসংখ্যক আত্মসমর্পন করেছে কিংবা রাস্তার পাশে অস্ত্র ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। যদিও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সমস্যাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখানে গেরিলা যুদ্ধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না।

গভর্নর বলেন, যদিও খাদ্যসরবরাহ পর্যাপ্ত, তবে বিতরণে সমস্যা রয়ে গেছে।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ

জাম্বিয়ার দ্য সানডে টাইমস-এ ২২ আগস্ট, ১৯৭১ প্রকাশিত।

১১ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে– পাকিস্তানের শুরু থেকেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধরণ ও ইতিহাস বোঝা প্রয়োজন।

... ১৯৬৬ সালে যখন মুজিবুর স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফা ঘোষণা করলেন, যার ওপর ভিত্তি করে গত নির্বাচনে তাঁর নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটল– তখনই তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হলো।

সরকারের সমর্থনপুষ্ট সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের উদ্ভাবিত অভিযোগ একসময় ঝেড়ে ফেলতে হয়।

দাবি জানাল, স্বায়ত্তশাসন নতুন কিছু নয়। এমনকি পাকিস্তানের ভিত্তি হিসেবে খ্যাত লাহোর প্রস্তাব, যার খসড়া জিন্নাহ নিজেই প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে যে, ভারতকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে একের অধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে, যার ইউনিটগুলো হবে স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিট রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য বিস্তার করে শাসন করে গেছেন।

কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭০ সালে মুজিব ও তার দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী করে নিয়ে আসে।

তারপর গণহত্যা শুরু হয়, মুজিব আবার বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, লাহোর প্রস্তাবে যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে, মুজিবের ছয় দফায় তাও চাওয়া হয়নি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পূর্ব বাংলার শরণার্থী সমস্যা, দ্য স্ট্রেইটস টাইমস, মালয়েশিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন
৮ জুন, ১৯৭১

সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কদাচিৎ অন্য রাষ্ট্র জড়িয়ে থাকে– পূর্ব পাকিস্তান সংকটের বেলায়ও। ৪০ লাখ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেছে। অনেক শরণার্থী-শিবিরে কলেরা, মহামারি দেখা দিয়েছে– এ পর্যন্ত মৃত্যু আট হাজার। কলকাতায়ও এই মহামারি ছড়িয়ে পড়তে পারে– এই আশঙ্কায় ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত 'সিল' করে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা অনুভব করেছে। এতে শরণার্থীর স্রোত বন্ধ হওয়ার বা কলেরার বিস্তার রোধের কোনো গ্যারান্টি নেই।

নয়াদিল্লি এ পরিস্থিতি সামাল দিতে অক্ষম। আর এ নিয়ে তারা কোনো রাখ-ঢাক করেনি। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ছয়টি দেশে সফরে পাঠিয়েছেন, যাতে বৃহৎ শক্তিগুলোকে বুঝাতে পারেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সংকট সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এমনকি উপমহাদেশের শান্তির জন্যও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের সংবাদপত্র এবং ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক নেতাদের ধন্যবাদ যে, তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় কিছু সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে। অক্সফাম কলেরা নিরোধ টিকা পাঠিয়েছে; সাহায্য-সহযোগিতা মিশন নিয়ে যাওয়ার জন্য রয়াল এয়ারফোর্স অপেক্ষা করছে। ওয়াশিংটনও ভারতে পরিবহন উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছে, যাতে প্রয়োজনে সীমান্ত এলাকা থেকে সুবিধাজনক জায়গায় শরণার্থী পরিবহন করা যায়। কিন্তু এই ধ্বংসযজ্ঞের ট্র্যাজেডি ঠেকানোর মতো পর্যাপ্ত সাহায্য কি ভারত ও পাকিস্তান পাবে? উত্তর পাওয়া যাবে বর্ষা মৌসুমের আগামী সপ্তাহগুলোতে।

পাকিস্তান ব্যাপক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে, তবে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহল সতর্কভাবে সাড়া দিচ্ছে। গত ঘূর্ণিঝড়ের পর যে সাহায্য পাঠানো হয়েছে তার সঠিক ব্যবহারে পাকিস্তানের অসামর্থ্য এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহকে অবাধে কাজ করতে দিতে সরকারের অনিচ্ছা– পাকিস্তানের ব্যাপারে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি এবং সামরিক প্রশাসকদের মধ্যে গভীর শত্রুতার বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

এখন পাকিস্তান তার নিষ্ঠুর অভিপ্রায় কিছুটা ত্যাগ করেছে বলে মনে হচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিবের দুজন প্রতিনিধি জাতিসংঘ ত্রাণ কর্মসূচির দাপ্তরিক ব্যবস্থা সমন্বয়ের জন্য ঢাকায় যাচ্ছেন। এখন সময়ই হচ্ছে মূখ্য নিয়ামক। নৌযান ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থানে পৌছানো যাবে না। চট্টগ্রাম বন্দরে এখনো কাজের পরিবেশ ফিরে আসেনি। দ্রুত একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছানোর জন্য ইসলামাবাদকে প্রভাবিত করতে হবে– নতুবা ভারতে শরণার্থী হিসেবে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং যারা সেখানে রয়েছে, তাদের থেকে যেতেই হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে, তাকে আর অভ্যন্তরীণ বিষয় বলার সুযোগ নেই। পূর্ব পাকিস্তান ইতিমধ্যেই একা কুলিয়ে উঠতে পারার ভণিতা ছেড়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে। পুরো বিষয়টি ভারতের জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তার হুমকিও ভয়াবহ।

জেল খেটেছেন ছয় মার্কিন

ফিলাডেলফিয়ার দ্যা ইভনিং বুলেটিন, ১৬ জুলাই, ১৯৭১

বাল্টিমোর : পাকিস্তানের কার্গো জাহাজে অস্ত্র বোঝাই ঠেকাতে নৌকায় (ক্যানু ও কায়াক) জাহাজ আটকাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ছয়জন ফিলাডেলফিয়ান। এক রাত জেলে রেখে সতর্ক করে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আন্দোলনকারীদের দলনেতা চার্লস খান বলেছেন, তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা কার্গো জাহাজ পদ্মা ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছালে মালামাল ওঠাতে আবার বাধা দেবেন।

১৪ জুলাই, ১৯৭১ চার্লস খানের সঙ্গে আর যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন সেজউইক স্ট্রিটের রিচার্ড টেইলর, পাইন স্ট্রিটের স্যালি উইলবি ও স্টেফানি হলিম্যান, উইলোজ এভিনিউর চার্লস গুডউইন এবং মেডিয়ার ওয়েইন লাউসার।

ওয়াশিংটন স্টারের সংবাদ

বাল্টিমোর (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

পাকিস্তানী পণ্যবাহী জাহাজ পদ্মাকে, ডকে পণ্য ওঠাতে বাধা দিতে আজও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। অভিযোগ রয়েছে, এই পাকিস্তানী জাহাজ যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশে অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ গত রাতে ছয়জন বিক্ষোভকারীকে জাহাজ ডকে আসতে বাধা দেওয়ার কারণে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছে ছিল তিনটি ক্যানু ও একটি কায়াক।

একজন কর্মকর্তা জানান, জাহাজের অবাধ চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বিবেচনা করেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিতর্ক চলছে, পাকিস্তানী জাহাজ পদ্মায় বোঝাইয়ের জন্য যেসব মালামাল মজুদ রয়েছে, তা তোলা হবে কি না।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক লং শোরম্যান অ্যাসোসিয়েশন তাদের বাল্টিমোর শাখাকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন জাহাজে মাল তোলা না হয়। কারণ প্রতিবাদকারীরা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও এই জাহাজে করে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো হচ্ছে।

এদিকে পাকিস্তানী জাহাজের যুক্তরাষ্ট্রীয় এজেন্ট জানিয়েছে, এই মালবাহী জাহাজে কোনো সামরিক সরঞ্জাম নেই। ১৩ জন বিক্ষোভকারীর একজন কেবল পাকিস্তানী। শহরের অফিসপাড়ায় জমায়েত হয়েছে– জাহাজযোগে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর প্রতিবাদ জানাতে। ১৫ জুলাই, ১৯৭১। বাল্টিমোর শহরে ক্যালভার্ট অ্যান্ড রেডউড স্ট্রিটে কেয়সার ভবনের সামনে এই বিক্ষোভ– ইস্ট ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সির বিরুদ্ধে হলেও মূলত বিক্ষোভ গোটা আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে। এই এজেন্সি আসলে হ্যান্ডলিং এজেন্ট। ১৭ জুলাই বিকেলে পাকিস্তানী মালবাহী জাহাজ পদ্মা কভিংটন বন্দর টার্মিনালে আসছে, তারই ব্যবস্থাপনার ভার এই এজেন্সির।

অস্ত্র বোঝাই পাকিস্তানী জাহাজে মাল তুলতে ডক ইউনিয়নের অস্বীকৃতি

পাকিস্তানী মালবাহী জাহাজ পদ্মা আজ বাল্টিমোর থেকে মোবাইল যাত্রা করার কথা– অস্ত্র নিয়ে জাহাজটি স্বদেশে যাত্রা করেছে। আজ এখানকার লং শোরম্যান'রা এই জাহাজে মাল বোঝাই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, পাকিস্তানের গণযুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জন্যই তাদের এ সিদ্ধান্ত। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, দুই লাখ পাকিস্তানী নিহত হয়েছে এবং ষাট লাখ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে জাহাজের মালিক ন্যাশনাল শিপিং কোম্পানি অব করাচির এজেন্ট ইস্ট ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সি ফেডারেল মেরিটাইম কমিশনকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে, লং শোরম্যানদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। টেলিগ্রামে কমিশন চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজে ৯ লাখ ২৪ হাজার ৩২৯ ডলার মূল্যের জাহাজের যন্ত্রাংশ; এক লাখ ৮৪ হাজার ১৮৭ ডলার মূল্যের সামরিক যান যন্ত্রাংশ; ২৫ হাজার ৪১৭ ডলার মূল্যের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ, ৪৫ হাজার ১১৭ ডলার মূল্যের যানবাহন যন্ত্রাংশ এবং ২ হাজার ৮৩০ ডলার মূল্যের গোলন্দাজ যন্ত্রাংশ রয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে এতে দুই হাজার ২০০ রাউন্ড ২২ ক্যালিবার গোলাবারুদ বোঝাই করা হয়েছে। এই মালবাহী জাহাজটি মন্ট্রিয়েল থেকে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ স্যাবার জেটের ৪৬ বাক্স খুচরা যন্ত্রাংশ ওঠাবে। তবে কানাডা সরকার এই মাল উত্তোলনে বাধা দিয়েছে।

ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল নামের ফিলাডেলফিয়াভিত্তিক একটি সংস্থার ৩০ জন সদস্য তাঁদের বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন।

জাহাজ আটকানোর অপরাধে অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়েছেন। দ্য ইভনিং বুলেটিন ফিলাডেলফিয়া জানিয়েছে, ক্যানু ও ক্যায়াকযোগে পানিতে নেমে জাহাজ আটকানোর চেষ্টা করার অপরাধে গ্রেপ্তারকৃত ছয়জন কারামুক্তি লাভ করেছেন।

দলনেতা চার্লস খান বলেছেন, অস্ত্রবাহী জাহাজটিকে তাঁরা পুনরায় ফিলাডেলফিয়ায় আটকাতে চেষ্টা করবেন।

নিউইয়র্ক বন্দর থেকে ছেড়ে আসা এই জাহাজের গন্তব্য পাকিস্তানের করাচি বন্দর– কয়েক সপ্তাহ ধরে এই জাহাজ বির্তকের কেন্দ্রবিন্দুতে। অভিযোগ উঠেছে, এই জাহাজে পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হচ্ছে, সিনেটে এ নিয়ে বির্তক হয়েছে। একজন সিনেটর এই মালবাহী জাহাজের মালামাল প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

১৬ জুলাই, ১৯৭১ বাল্টিমোর সান জানাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তবে পুরনো ক্রয়ের অংশবিশেষ পাঠানো না হয়ে থাকলে তা জাহাজে উত্তোলন করা যাবে। সিনেটে খোলামেলাভাবেই বলা হয়েছে, পাকিস্তান মার্কিনি অস্ত্রের প্রয়োগ করছে নিজ দেশের মানুষের ওপর, পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তান সরকার বাহ্যত বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি বিদ্রোহ ধামাচাপা দিলেও মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা লড়াই চলছেই।

আগ্নেয়গিরির ওপর পাকিস্তান

আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন, নিউজউইক, ২৯ মার্চ, ১৯৭১

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেশের পূর্বাঞ্চলে যাওয়ার সময় উড়োজাহাজে চড়ার আগে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর রিবনখচিত সেনা পোশাক ছেড়ে ধূসর রঙের স্যুট পরে নিলেন। তার পরও তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পৌঁছালেন, যুদ্ধক্ষেত্রের জ্ঞানী সৈন্যের মতো সতর্কতার সঙ্গে শত্রুপক্ষের মাইনফিল্ড নিয়ে আলোচনায় নামলেন। তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বাগত জানাতে যে দলটি উপস্থিত হলো, তাতে থাকল কজন সেনা কর্মকর্তা আর তাঁর জোরদার নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত বিষণ্নমুখ সেনাদল। এখানেই শেষ নয়, তার পরও প্রতি ১০০ ফুট দূরে এয়ারপোর্ট থেকে প্রেসিডেন্টের সবুজ দেয়ালঘেরা প্রাসাদ পর্যন্ত মেশিনগান হাতে সতর্ক সৈন্য, তাদের পায়ের কাছেই কার্তুজের বাক্স-যদি আরও লাগে। প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর যে লৌহকপাট তার বাড়ি পাহারা দেয়, সেই কপাট অতিক্রম করার পর যখন মিলিয়ে গেল, ঢাকার নাগরিকদের একজন প্রেসিডেন্টকে দেখার জন্য যে চোখ ঘুরিয়েছিল, মাটিতে একদলা থুতু নিক্ষেপ করে ঘৃণাভরা স্বরে আওড়ালো, তিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট নন। যে লোক মানুষকে এতো ভয় পায়, তিনি কেমন করে ভান করেন যে তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তারপরও ইয়াহিয়া যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের পূর্ব পাকিস্তানে এলেন, এটাকে একটা সাহসী কাজই বিবেচনা করতে হবে। কারণ তিনি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুখোমুখি হলেন, যিনি ইয়াহিয়া সরকারের কর্তৃত্বই অস্বীকার করেছেন; কার্যত এ মাসের শুরু থেকে তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শাসক। দু'জনের ব্যাক্তিগত স্টাইলেও বৈষম্য। ইয়াহিয়া কর্কশ, কঠিন পেশাদার সৈনিক, যাঁর জনসমক্ষে কথাবার্তা শুনলে মনে হয় অনুশাসনের বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর মুজিব (যে নামে তাঁকে ডাকা হয়) নিখুঁত রাজনীতিবিদ, বর্ণাঢ্য বক্তা। তবু দু'জনের বৈঠকে একমত হওয়ার ওপর ঝুলে আছে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ।

পরস্পরবিরোধী দু'জন দৈনিক রুটিন-কাজে মনোনিবেশ করলেন। সকালের পর সকাল শিঙা বাজানো গাড়িবহরে খোলা পতাকা ওড়ানো সাদা টয়োটা সেডানে তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে ঢুকছেন– কালো পতাকা কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনীর হাতে রাস্তায় নিহত বাঙালিদের স্মরণে শোক প্রকাশের জন্য। সেখানে উপস্থিতির পর তিনি এবং ইয়াহিয়া স্থিতধি হয়ে বসলেন, কোনো সহায়তাকারী ছাড়াই, একান্ত আলাপে। একদিন উত্তেজক আলোচনার সময় ইয়াহিয়া বললেন, 'আমি সৈনিক, আমাকে বকাঝকা করবেন না।'

মুজিব ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এলেন। বলে এলেন, 'আপনার সঙ্গে আর আলাপ করে লাভ নেই। আপনি আলোচনার আসল জায়গায় আসছেন না।'

৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা, বাতাসে আদ্রতা, মেজাজ চড়ে যাওয়ারই কথা– একান্তে কী আলাপ হয়েছে তা দুজনের কেউ বলবেন না- আসল কথা, দুজন যে একসঙ্গে কথা বলেছেন, এটাই যথেষ্ট– এটাই অন্তত সাময়িকভাবে হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এখনই দ্বিখণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে।

গত সপ্তাহের আলোচনার ওপর নিউজ উইক এর লোরেন জেঙ্কিন্স ঢাকা থেকে রিপোর্ট করছেন– মুজিব চাচ্ছেন এখনই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন তুলে নিয়ে গত ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত দলের কাছে পাকিস্তানের একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কারণ মুজিবের আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল– এ ধরনের সংবিধান পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়নে আলগা বন্ধনে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনিবার্যভাবে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনেরই প্রতিফলন ঘটাবে। আর ইয়াহিয়া যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত, তিনি সামরিক আইন উঠিয়ে নেওয়া কিংবা যেকোনো সংবিধানে প্রেসিডেন্টের না-সূচক ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতা প্রত্যাহার মেনে নেবেনই না।

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার ভেতরের খবর প্রকাশিত না হওয়ার ভয়ার্ত-গুজব ঢাকাকে ছেয়ে ফেলে। সফরকারীরা জানান, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে সৈন্য টানা হচ্ছে এখানকার সেনাশক্তি আরও জোরদার করার জন্য। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বেসামরিক পোশাকে আড়াল করেও আনা হচ্ছে না। বোমা ও গোলাগুলির ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে। মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের বাড়িতে অজানা ঘাতক শর্টগানের তিনটি গুলি ছুড়েছে– সব মিলিয়ে শহরে উত্তেজনা তুঙ্গে।

তারপর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রথম একটা ইশারা পাওয়া গেল যে, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার অচলাবস্থা কেটে গেছে। যেখানে মুজিব সতর্কভাবে দ্ব্যর্থক রয়ে গেলেন, বিজয় দাবি করা থেকে বিরত রইলেন, তিনি সানন্দে ঘোষণা দিলেন, প্রেসিডেন্টের উঁচুদরের উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বিস্তারিত দরকষাকষি ও সমঝোতার জন্য বৈঠকে বসবেন। উৎফুল্ল জনতাকে তিনি বললেন, 'আমার জনগণ ঐক্যবদ্ধ, কেউ তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' জনতা চিৎকার করে বললো, 'বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' কিন্তু সমস্ত উৎফুল্লতা হয়তো অকালপক্ক হয়ে উঠতে পারে। বিষণ্ন বদনে মুজিবের একজন সহযোগী বললেন, 'আমরা একটি আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি, যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি ১২০ ব্রিটিশ এমপির

দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা, নিহালসিং প্রেরিত প্রতিবেদন লন্ডন থেকে, ১৭ জুন, ১৯৭১

লন্ডন, ১৬ জুন : গত রাতে শ্রমিক দলের ১২০ জন এমপি বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য হাউস অব কমন্সে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যাঁরা এ প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁদের অন্যতম লেবার পার্টির চেয়ারম্যান আয়ান মিকার্ডো। আর এর প্রধান উদ্যোক্তা জন স্টোনহাউস, যিনি গত এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঘুরে এসেছেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বেসামরিক জনগণের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক মাত্রায় নৃশংসতা চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলা শাসন করার অধিকার খুইয়েছে। অতএব, এ প্রস্তাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়– কারণ পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং তা গণহত্যা কনভেনশনের পরিপন্থী। প্রস্তাবে আরও বলা হয়,

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলা ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ব বাংলার মানুষের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

এই প্রস্তাবের পেছনে দুটি বিষয় কাজ করেছে। হ্যারল্ড উইলসন যখন পাকিস্তানের ওপর বিতর্ক আহ্বান করলেন বিরোধী বেঞ্চ খালি থাকায় শ্রমিক দলের বৃত্তে অপরাধবোধ কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শরণার্থীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও সরকার ঝুঁকে পড়েছে পাকিস্তানী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দিকে– ইয়াহিয়া প্রশাসন জোড়াতালি দিয়ে একবার পূর্ব বাংলায় দাঁড়াতে পারলে হলো।

জাতীয় নির্বাহীদের দুটি সিদ্ধান্ত থেকে বাংলাদেশ প্রশ্নে শ্রমিক দলের সাহসী সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রধান সিদ্ধান্তটি– বাংলাদেশ ইস্যুটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বলা, উথান্টের ত্রাণ ভাণ্ডারে ব্রিটিশ অনুদানের পরিমাণ বাড়ানোর আবেদন এবং শরণার্থী সহায়তায় উদারভাবে ভারতকে সাহায্য করা। শ্রমিক দল মনে করে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়ায় ত্রাণ সাহায্য অর্থবহ হবে না। সুতরাং পাকিস্তানের জন্য ভোগান্তি কমাতে সহায়তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং বিষয়টি পাকিস্তানের অন্যান্য দাতা কনসোর্টিয়ামকেও অনুরূপ বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি দুর্যোগ ত্রাণ কমিশন স্থাপনের দাবি জানানো।

যদিও বাংলাদেশ ব্রিটিশ শ্রমিক দলে সরাসরি অনেক মিত্র জোগাতে পেরেছে, ব্রিটিশ সরকার এতে কতটা প্রভাবিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। ব্রিটেনে এখন সবার আগ্রহ কমন মার্কেটের দিকে।

এই খবরের সঙ্গে পিটিআইয়ের যোগ করা শেষ সংবাদে সুইডেন, ইরাক, ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি সম্মত হয়ে জানিয়েছে যে, পূর্ব বাংলার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না।

আমের বনে কেবল লাশের গন্ধ

২০ মে, ১৯৭১ নিউইয়র্ক টাইমস-এ হোমার জ্যাকের প্রকাশিত লেখা

করাচি, পাকিস্তান : বহু বছর আগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ... ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে ... ।' এই বসন্তে পূর্ব পাকিস্তান/ বাংলাদেশের আমের বনে কেবল লাশের গন্ধ- হত্যাযজ্ঞে আজ অনেক হৃদয় দিশেহারা।

গণহত্যায় নিহতের প্রকৃত সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো পূর্ব পাকিস্তানেও যাচাই করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেউ বলে হাজার হাজার, কেউ বলে দুই লাখ। রক্ষণশীল হিসেবে সংখ্যাটি হতে পারে ৫০ হাজার। শরণার্থীর সংখ্যা জানা যাচ্ছে ১ মে'র হিসেবে ভারতের চারটি রাজ্যে ছয় লাখ ৫০ হাজার।

পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা জানাচ্ছে, গণহত্যার যারা শিকার, তারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান; ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের পদ্ধতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বলছে, পূর্বাঞ্চলে যারা নিহত হয়েছে, তারা ভারতের

বিহার ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত বিহারি মুসলমান– দেশ বিভাগের পর তারা অভিবাসী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে, কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিতে আত্মীকৃত হয়নি।

করাচি সফরকারী একজন পর্যটক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের অর্থনীতি তলিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়েছে আর সরকার মরিয়া হয়ে সবাইকে দেখাতে চাইছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। করাচিতে সবাই পূর্ব পাকিস্তানে বিহারি হত্যা নিয়ে বিপর্যস্ত, কিন্তু সেনাবাহিনী যে বাঙালিকে হত্যা করেছে, এটা প্রায় সবাই অস্বীকার করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা মনে করছে, সমস্ত ঘটনাই ভারতীয় পরিকল্পনা– ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী (সাদা পোশাকে ভারতীয় সৈন্য), ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এমনকি শরণার্থী যারা, তারাও ভারতীয় (পাকিস্তানী নয়)। আর তাদের সহায়তা করছে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি।

দিল্লি সফরকারী অপর একজনের মতে, সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে ভারত কদাচিত এতোটা একতাবদ্ধ হতে পেরেছে। দলমত নির্বিশেষে সব নাগরিক বাংলাদেশকে (স্বাধীন পূর্ব বাংলা) স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে চাপ দিচ্ছে। ভারতীয় প্রেস বাংলাদেশের গণহত্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে। এ পর্যন্ত ভারত অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দিলেও উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা আদায় করছে।

কলিকাতায়, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে যে কারও চোখে পড়বে হাজার হাজার শরণার্থী আসছে; ক্যাম্পে ঠাঁই পেয়েছে কেবল একচতুর্থাংশ। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের আশাবাদী সদস্যরা দেশের জন্য স্বীকৃতি ও যুদ্ধের জন্য অস্ত্র চাচ্ছেন। পশ্চিম পাকিস্তান যে পূর্ব পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে এতবছর ধরে বিবেচনা করে আসছে, শরণার্থীরাই এর প্রমাণ। তাঁরা মনে করেন, ২৫ মার্চ যা ঘটেছে, তারপর তাঁদের দেশ কখনো পাকিস্তানের দুই অংশের এক অংশ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত থাকতে পারে না।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসনের ৯৮ শতাংশেই শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। শেখ মুজিব যে ছয় দফা ভিত্তিক প্রচারণা চালিয়েছেন, তাতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল, বিচ্ছিন্নতার নয়। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, ক্ষমতাশালী আমলা কিছু শিল্পপতির সহায়তায় পাকিস্তানের সেনাশাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের এই বড় দাবিটির কাছে মাথা নোয়াতে রাজি হয়নি। ২৫ মার্চ তারা সামরিক আইন জারি করল, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করল এবং শুরু করল হত্যাযজ্ঞ। এই সেনা অভিযানের আগে ও পরে পূর্ব পাকিস্তানে কেউ কেউ কদাচিৎ অহিংস এই উপমহাদেশে নিজস্ব স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং বিশ্ব পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ কেন? আমেরিকানদের নিরুদ্বেগ হওয়ার কারণ কি এটাই যে, মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যা করছে, তা ছাড়া এতে তো আর সাদা আমেরিকান জড়িয়ে নেই? নাকি আদর্শগত কোনো

বিষয় নেই– এর সঙ্গে অন্তত কমিউনিজম তো নেই-ই? নাকি তারা নিরুদ্বেগ এ কারণে যে খুব সহজেই পূর্ব পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত করা যাবে।

জাতিসংঘ কেন নিরুদ্বেগ? যে যুগের বিধিবিধান নরহত্যার বিরুদ্ধে। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি কি কেবলই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এসব কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি এখনো কি অভ্যন্তরীণ? এমনকি যখন তা বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলছে, যখন সশস্ত্র ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি– বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথা বাদই থাক।

জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো কেন নিরুদ্বেগ? প্রতিটি দেশের পেটের ভেতর কি এমন নিজস্ব একটি বাংলাদেশ রয়েছে? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কি এই ১৯৭০-এর দশকে এমন একটা প্রক্রিয়া বের করতে পারে না, যাতে যেসব রাষ্ট্রের অংশ স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি কিছু চায় যেমন– পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন, এমনকি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হাজার মাইলের– যদি সত্যিই চায়, স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে?

জন্মগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সংগ্রাম করছে। সবুজ ও লাল পতাকার ভেতরে সোনালি মানচিত্রে সীমান্ত রেখা কলকাতায় পাকিস্তানের পুরোনো ডেপুটি হাই কমিশনের ওপর পতপত করে উড়ছে। আর মুক্তিযোদ্ধারা রবীঠাকুরের গানকে বেছে নিয়েছে জাতীয় সংগীত হিসেবে– আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং বিশ্ব কিছুই কি করবে না?

১৫ জুন, ১৯৭১, ডেইলি মিরর পত্রিকায় লেখা

"বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যে সকল শরণার্থী ভারতের সীমান্তে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সাহায্যার্থে জাতিসংঘ ভারতকে ৪ কোটি ডলার দেবে।"

পত্রিকাটি আরও লিখেছিল–

"এই জটিল সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র উপমহাদেশের শান্তিই শুধু নয়, পরন্তু বিশ্ব শান্তিও বিঘ্নিত হবে।"

১৬ জুন ছাপা হয়েছিল–

120 labour M. Ps demand Bangladesh Recognition.

"120 labour M. Ps demand Bangladesh Recognition. The motion calls for a meeting of the U. N Security Council to consider the situation, both a threat to international peace and a contravention of the Genocide Convention. And untill order is restored be U. N. supervision the provisional Government of Bangladesh should be recognised as the vehicle for the expression of self-determination by the people of East Bengal."

ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল– "এই রকম ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন হবার নিশ্চিত ঘটনাকে পিছিয়ে দিয়ে অবস্থা আরও বিপজ্জনক করে তুলেছেন।"

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাতে জাতিসংঘ থেকে পাঠানো এক জরুরি সংবাদ ছাপা হয়েছিল ১৯ জুন, ১৯৭১। তাতে লেখা হয়েছিল– "U. N. H. Q. A world Bank- IMF survey team has reportedly advised the western countries to refrain from

providing assistance to president Yahya Khan's regine, the New York Times reported to-day quoting authorities source in washington, reports PTI. The U. S. Administration has already stated moving away form its original position."

১৯ জুন, ১৯৭১ মস্কোতে রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা "নিউ টাইমস' পত্রিকার ভাষ্যকার মি. এ. উলানস্কি লিখেছেন–

"সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদিও জেনারেল ইয়াহিয়া খান পৃথিবীকে বোঝাতে চাইছেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু আসলে তিনি জনগণের রায় মানতে প্রস্তুত নন, যদি না তা তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মেলে। ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতিতে হয়তো জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হবে। তবে তিনি এডভেঞ্চারধর্মী।"

১৯ জুন, ১৯৭১ তারিখ ওয়াশিংটনে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেছেন–

পূর্ব বাংলার শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনে মার্কিন সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই বিরাট মানবিক বিপর্যয়কে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিক্সন প্রশাসনের ওপর তিনি দোষারোপ করেন।

তিনি আরও বলেন–

মার্কিন সরকারের পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ক্রমাগত নীরবতা এবং পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে ঔদাসীন্যে তিনি মর্মাহত।

সিনেটর কেনেডী পররাষ্ট্র সচিব মি. উইলিয়াম রজার্সকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন–

পাকিস্তানকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাতে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণকার্য প্রাধান্য পাবে বলে শর্ত আরোপ করা উচিত।

২০ জুন, ১৯৭১ তারিখে ব্রিটিশ দৈনিক অবজারভার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছিল–

"পূর্ববঙ্গে গণহত্যা বন্ধ করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং উদ্বাস্তুদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যাবস্থাসহ ব্যাপক ত্রাণ কার্যসূচি গ্রহণে জাতিসংঘ কেন হস্তক্ষেপ করছে না?"

এদিকে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল– পাকিস্তান সেনাদের হাত থেকে সতীত্ব রক্ষার জন্য রাজশাহী কলেজের ছাত্রী হাফিজা বেগম (১৮) এবং নূরজাহান (২০) দিনাজপুরে আত্মহত্যা করেছেন।

এই সময় এক ধরনের চোখের অসুখ ব্যাপক হারে শুরু হয়েছিল। সবাই ঐ চোখের অসুখের নাম দিয়েছিল "জয় বাংলা"। ছোঁয়াচে চোখের অসুখ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক তখন ঔষধ আরজেন্টানিউ–৩০ (তরল) এবং Achromycin ointment মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে সরবরাহ করা হয়েছিল।

টাইমস পত্রিকার এক নিবন্ধে, পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী এক নিবন্ধে মি. পিটার হ্যাজেল হার্স্ট লিখেছিলেন–

"ভুট্টোই এমন সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাধ্য করেন, যার ফলে পূর্ববঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে।"

'গেরিলাদের জন্য চাই অস্ত্র, রসদ'

ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান-এর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার সম্প্রতি একটি যুদ্ধ সমালোচনা বৈঠকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো ও গেরিলা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসারণে উৎফুল্ল হওয়ার কারণ নেই, অনেক ক্ষেত্রে তা হয়তো কৌশলগত পশ্চাদপসারণ।

এটা এখন স্পষ্ট, মূলত পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে গড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের কাদামটি ও জনস্রোতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এখন বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুম চলছে– এমন ঋতুতে যুদ্ধ করতেও তারা অভ্যস্ত নয়। এখনকার কৌশল সম্ভবত গোলাবারুদ অপচয় না করে জমিয়ে রাখা এবং শক্তি সঞ্চয় করে বর্ষার পর বড় ধরনের আক্রমণ চালানো।

মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে পাঠানো চিঠিতে কমান্ডাররা বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব, এই বর্ষা মৌসুমের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আক্রমণ বাড়িয়ে দিতে হবে। পাকিস্তানী বাহিনীর পশ্চাদপসারণের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর দখলাধীন এলাকা যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে হবে। কমান্ডাররা মনে করেন, বর্ষা মৌসুমের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার মতো 'অবকাঠামোগত' সব প্রস্তুতি রয়েছে।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পশ্চিম সেক্টরে কর্মরত বাঙালি গোলন্দাজ ও অন্য সেনারা দল ত্যাগ করে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় এর শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। এই দলত্যাগীরা সেই পশ্চিম থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এতো দূরে এসে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে যোগ দিয়েছেন। কমান্ডাররা মনে করেন, এখন মুক্তিবাহিনীতে পুরো এক রেজিমেন্ট গোলন্দাজ রয়েছে। যাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কিন্তু কমান্ডাররা মনে করেন, বর্ষা মৌসুম– যা অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকার কথা, যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো না হয়, বাংলাদেশের যুদ্ধ আরও দীর্ঘমেয়াদি হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেবে। কমান্ডাররা মনে করেন, আগামী তিন মাস ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ পুনর্ভরণ করা হলে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য। প্রথাগত যুদ্ধে পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় দেশ এবং কোনো ন্যাটো দেশে তাঁরা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলার পর তারা কী প্রক্রিয়ায় এগোতে পারে তা তাঁদের জানা। কমান্ডাররা মনে করেন এককপ্রতি গুলিবর্ষণ ক্ষমতার প্রশ্নে মুক্তিবাহিনী এমনকি ভারতীয় বাহিনীর তুলনায় পাকিস্তানী বাহিনী উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে।

আমেরিকা ও চীন থেকে সরবরাহ করা সব ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সজ্জিত। তাদের অস্ত্র মজুদ কমার সঙ্গে সঙ্গে চায়নিজ ও পশ্চিমের অন্যান্য শক্তি তা পূরণ করে দিচ্ছে।

কমান্ডোদের বিষয়টি স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। গেরিলা ও কমান্ডোদের জন্য সীমান্তে বিভিন্ন ক্যাম্পে পূর্ণোদ্যমে গেরিলা প্রশিক্ষণ চালানো হচ্ছে। অস্ত্রের সরবরাহ স্বল্পতার কারণে প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের অনেককেই কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

কিছুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলেছে। এসব স্থানে প্রশিক্ষণের সুবিধা পেয়ে স্থানীয় লোকজন অভিভূত। বেশ কিছু সময় ধরে প্রশিক্ষণ চলছে এবং দেশেই শক্তিশালী 'রিয়ার ইউনিট' গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ষা মৌসুমে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য মূলত নির্ভর করবে কতটা তাড়াতাড়ি সম্মুখ সমরে এবং পেছনে সেনা মোতায়েন সম্পন্ন করা যায় তার ওপর।

কমান্ডাররা মনে করেন, অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এখনই সম্ভাব্য সব উৎস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সম্প্রতি সেক্টর কমান্ডাররা বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে বৈঠক করে যুদ্ধ-পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছেন এবং আরও অস্ত্রের জোগান দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রয়োজনটা যত না অত্যাধুনিক অস্ত্রের, তার চেয়ে বেশি সাধারণ যুদ্ধাস্ত্রের। তাঁরা মন্ত্রি পরিষদকে বলেছেন, গেরিলারা কেবল লাঠি আর ডেগার নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করবেন– এটা আশা করা ঠিক নয়।

বাংলাদেশের গেরিলারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের গেরিলাযুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় নয়– বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রথম থেকেই বাড়তি সুবিধা পেয়ে আসছে। প্রথমত, জনগণ যুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে। দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীর মূল অংশ গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষিত সেনাসদস্যদের নিয়ে। মুক্তিবাহিনীর পদাতিক, গোলন্দাজ, সিগন্যাল ইউনিটসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ ইউনিট, রসদ সরবরাহ, প্রশাসন এবং চিকিৎসাসেবা ইউনিট রয়েছে।

কয়েকজন কমান্ডার প্রতিবেদককে বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, অস্ত্র সংগ্রহে বাংলাদেশ সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, যাতে বর্ষার অবশিষ্ট সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ অস্ত্র পাওয়া গেছে, তাতে মুক্তিবাহিনীর যে সাফল্য, তা এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে কোনো সেনাবাহিনীর জন্যই গৌরবের।

নিক্সনকে সিনেটর ফ্রাংক চার্চ

নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা ট্যাড শুল্‌ক এই সংবাদ প্রকাশ করলেন, ২২ জুন, ১৯৭১

পাকিস্তানী পতাকাবাহী একটি মালবাহী জাহাজ সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই অবস্থায় নিউইয়র্ক থেকে করাচির উদ্দেশ্যে রওনা করতে যাচ্ছে। এ ধরনের সরঞ্জাম পাঠাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে, পাকিস্তান সরকার আমেরিকান অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যায় ব্যবহার করছে। সেদিনই সিনেটর ফ্রাংক চার্চ মার্কিন সিনেটে বিষয়টি উত্থাপন করে জানালেন, তাঁর কাছে প্রামাণিক দলিলপত্র রয়েছে যে, দুটি মালবাহী জাহাজ সুন্দরবন ও পাম্পা ৮ ও ১২ জুন নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা। বিশেষ করে পাম্পা সেদিন বিকেলেই বন্দর ছেড়েছে। তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছেন, যেন সেদিনের চালানটি বন্ধ করার উপযুক্ত নির্দেশ দেন। ২৩ তারিখে জাহাজটি মন্ট্রিয়েল ডকে পৌঁছার কথা। তিনি বলেন, কোস্টগার্ড যদি যুক্তরাষ্ট্রের জলসীমায় জাহাজটিকে আটকাতে সমর্থ না হয়, তাহলে কানাডা সরকারের সাহায্য নিয়ে নিষিদ্ধ সরঞ্জাম পাঠানোর উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে।

৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক বহিষ্কার
নিউইয়র্ক টাইমস, ২৮ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার একটি হোটেলে ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় আটকে রাখার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে গতকাল (২৭ মার্চ, ১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান থেকে বের করে দিয়েছে।

উত্তর ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বের হলে তাঁদের গুলি করার হুমকি দিয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। সাংবাদিকেরা হোটেল থেকে দেখতে পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানী বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনকে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা গুলি করছে। করাচির উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের উড়োজাহাজে তোলার আগে নিউইয়র্ক টাইমস এর সংবাদদাতা সিডনি শ্যানবার্গসহ অন্য সাংবাদিকদের তল্লাশি চালানো হয়। তাদের নোট বই, ছবির ফিল্ম ও ফাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বহিষ্কৃত সাংবাদিকেরা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান, রাশিয়ার সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে কর্মরত।

ঢাকায় অবস্থানকালে সাংবাদিকদের সংবাদ পাঠাতে বা কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সিডনি শ্যানবার্গ বলেছেন, যখন সাংবাদিকদের আবাসন ইন্টারকন্টিনেন্টাল এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি সাংবাদিকদের কেন চলে যেতে হবে? তিনি জবাবে বলেন, 'সেটা আমাদের ব্যাখ্যা করার কথা নয়, এটা আমাদের দেশ।'

তারপর তিনি ঘুরে তাকালেন এবং অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'আমরা চাই, আপনারা চলে যান। এখানে থাকাটা আপনাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা হবে খুব রক্তাক্ত।'

দ্য টাইমস-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এ এম রোজেনথাল প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান :

'ঢাকা থেকে নিউইয়র্ক টাইমস এর সংবাদদাতা সিডনি শ্যানবার্গ এবং আরও ৩০ জন বিদেশি সংবাদদাতাকে বহিষ্কারের অপ্রত্যাশিত ও নজিরবিহীন ঘটনায় আমরা বিস্মিত। এটি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শ্যানবার্গ ও অন্যদের ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে, হুমকির মুখে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের জানানো হয়েছে যে, সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা যদি হোটেল ভবনের বাহিরে যান, তাহলে তাঁদের গুলি করা হবে।

শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের সব কাগজপত্র ও ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়। আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি ভুল মাত্র? আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের সরকার অবিলম্বে এই ভুল শোধরানোর ব্যবস্থা নেবে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিজয় মিত্র বাহিনীর

আত্মসমর্পণ পাকবাহিনীর

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ যখন যশোরের পতন ঘটে, পাকসেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা আর সামনে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের অস্ত্র সীমিত। বিমান নেই। নৌবাহিনী নেই। খাদ্যের সংকট দেখা দিলো।

৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় লে. জেনারেল নিয়াজী গভর্নর এ. এম মালিককে পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এসময় মূখ্য সচিব মোজাফফর হোসেন এবং রাও ফরমান আলী উপস্থিত ছিলেন। এই দিনেই দুপুর ১২টায় গভর্নর প্রেসিডেন্টের নিকট নিম্নের বার্তা প্রেরণ করেন–

From Governor, East Pakistan

For President of Pakistan

It is imperative that correct situation in East Pakistan is brought to your notice. I discussed with General Niazi who tells me that troops are fighting heroically but against heavy odds without adequate artillery and air support. Rebels continue cutting their rear and losses in equipment and men are heavy and can not be replaced. The front in Eastern and Western sectors has collapsed. Jessore has already fallen which will be a terrible blow to the moral of pro-Pakistan elements. Civil administration ineffective as they can not do much without communication. Food and other supplies remaining short as can not move from Chittagong or within the province. Even Dacca city will be without food after 7 days. Without fuel and oil there will be complete paralysis of life. Law and order situation in areas vacated by army pathetic as thousnads of pro-Pakistan elements being butchered by rebels. Millions of non-Bengalis and loyal elements are awaiting death. No lip sympathy or even material help from world powers except physical intervention will help amount. If any of our friends is expected to help that should have an impact within the next 48 repeat 48 hours. If no help is expected I beseech you to negotiate so that a civilized and peaceful transfer takes place and millions of lives are saved and untold missery avoided. Is it worth sacrificing so much when the end seems in evitable. If help is coming we will fight on whatever the consequences there may be. Request be kept enformed."

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হতে
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট,

'পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকার অবস্থান আপনাকে জানানো প্রয়োজন। আমি জেনারেল নিয়াজীর সাথে আলোচনা করেছি। তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনী অনেক অসুবিধার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র এবং বিমান সমর্থন ব্যতীত এবং অনেক অসুবিধার মধ্যে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে। বিদ্রোহীরা তাদের পিছন থেকে আঘাত হানছে। সমরাস্ত্র ও জনশক্তির ক্ষতি অনেক এবং এ ক্ষতি পূরণ করা যাচ্ছে না। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের সেক্টরের পতন হয়েছে। মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চলের পতন ঠেকানো যাবে না। যশোরের ইতোমধ্যে পতন ঘটেছে। পাকিস্তানপন্থীদের জন্য এ এক বিরাট আঘাত। বেসামরিক প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ পরিবহনের অভাবে তারা অগ্রসর হতে পারছে না। খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের সরবরাহের অভাব, কারণ চট্টগ্রাম অথবা প্রদেশের অভ্যন্তরে চলাচল করতে পারছে না। এমনকি ৭ দিন পরে ঢাকায় খাদ্য পাওয়া যাবে না। জ্বালানি ও তেলের অভাবে ঢাকার জীবন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। সেনাবাহিনী যে অঞ্চল ত্যাগ করছে সেখানে হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থীকে বিদ্রোহীরা হত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ অবাঙালি এবং অনুগত লোকেরা মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। কোনো মৌখিক সমবেদনা অথবা বিশ্বের শক্তিশালী দেশের দ্রব্য সাহায্য কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বারা উপকৃত হবে। কেউ যদি সাহায্য করতে চায় তা করতে হবে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে। যদি কোনো সাহায্য না আসে তা হলে আমি আপনাকে আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা এবং অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আলোচনার অনুরোধ করছি। যেখানে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী সেক্ষেত্রে এতো উৎসর্গ করার মূল্য কি? যদি সাহায্য আসে তবে আমরা যুদ্ধ করবো– ফলাফল যাই হোক, অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

৭ ডিসেম্বর ৭.২৫ মিনিট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গভর্নরের বার্তার উত্তর দেয়। প্রেসিডেন্ট গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলের কমান্ডারকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি জানালেন যে, রাশিয়ার ভেটো সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চলছে। একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল নিউইয়র্ক পাঠানো হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের বার্তা পূর্বাঞ্চলের অধিনায়কের মনোবল ভেঙ্গে দেয়।

৮ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতন ঘটে। মিত্রবাহিনী কুমিল্লাকে ঘিরে ফেলেছে। তারা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গভর্নরের অনুরোধে মূখ্য সচিব ও সচিবগণ গভর্নর হাউজে আশ্রয় নেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ৮ ডিসেম্বর। তিনি ভাষণে বলেন, "যুদ্ধ জয়ের সাথে শান্তি জয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। নিষ্ঠুর যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর সোনার বাংলার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সকল ছেলেমেয়েকে অংশগ্রহণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু যে বিপ্লব শুরু করেছেন তার শেষ হবে বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে।" তাজউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, "বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে, পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প কোনো পথ ছিল না।"

"পাকিস্তান এখন মৃত। পর্বত পরিমাণ মৃতদেহের নিচে তার কবর দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে এবং তা পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা করে ইয়াহিয়া খান নিজে জানেন যে, তিনি পাকিস্তানের কবর রচনা করেছেন। পরবর্তীতে তার আদেশে তার লাইসেন্সধারী খুনিরা জনগণের ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা একটি জাতির ঐক্য বজায় রাখার জন্য নয়। তা ছিল মানবতা বিবর্জিত জাতিগত ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার কাজ। পেশাজীবী সেনাবাহিনী নির্দেশ পেয়ে সেনাদের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে এবং শিকারী পশুর মতো দেখা গেল। তারা যে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসলীলায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তা সভ্যতার ইতিহাসে নেই। এ সকল কার্যাবলি প্রমাণ করে যে, ইয়াহিয়া এবং তার সঙ্গীদের মনে দু'দেশের ধারণা গভীরভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। তাদের দেশের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা চালাতে পারত না। তাদের অবশ্য উপলব্ধি করতে হবে যে, পাকিস্তান মৃত– ইয়াহিয়া খান তাকে হত্যা করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির আকাঙ্ক্ষা এবং সাহস তাকে রক্ষা করেছে। তারা প্রত্যেক দিন তাদের রক্ত দিয়ে তাদের নব্য জাতীয়তার শিকড় দৃঢ় করছে। পৃথিবীর কোনো শক্তি এ নতুন জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক ছোট-বড় সকল শক্তিকে তাদের সভায় তাকে গ্রহণ করতে হবে।"

"আমাদের বাংলাদেশের বিষয়টি পৃথিবীর কাছে তুলে ধরলাম। কোনো জাতির স্বীকৃতির জন্য আমাদের চেয়ে বেশি অধিকার নেই। কোনো জনগোষ্ঠী এই অধিকারের জন্য এতো কঠিন সংগ্রাম করেনি। জয় বাংলা।"

৯ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আখাউড়া হতে আশুগঞ্জের নিকট মেঘনা নদীর তীরে পৌঁছায়। পাকবাহিনী ভৈরব সেতুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে মিত্রবাহিনীর মেঘনা নদী অতিক্রম বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় জনগণ নদী পারাপারে সহায়তা করে। এই দিনেই ৯.৩০ মিনিটে জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের চীফ অব জেনারেল স্টাফের নিকট বার্তা পাঠান নিম্নোক্ত–

"Regrouping and readjustment not possible due to enemy being master of skies. No air support mission possible during last three days and in future. All jetties, ferries, river crafts destroyed by enemy air. Bridges demolished by rebels. Streets and strain telling upon own troops. Not slept for twenty days. Situation extremely critical. Request strike at enemy air bases. Reenforce Dacca by air borne troops."

"সেনাবাহিনীর পুনঃদলগঠন ও পুনঃসমন্বয় করা সম্ভব নয়। কারণ শত্রুরা আকাশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো বিমানের সাহায্য বিগত দিনে সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। শত্রুবিমান সকল জেটি, ফেরি এবং নৌযান ধ্বংস করেছে। বিদ্রোহীরা সেতু ধ্বংস করেছে। অসম্ভব পরিশ্রম ও চাপের ফলে সেনাবাহিনী ক্লান্ত। তারা বিগত ২০ দিন ঘুমায়নি। অবস্থা দারুণ ভয়াবহ, শত্রুর বিমান ঘাঁটি আক্রমণের অনুরোধ করছি। বিমানে সৈন্য পাঠিয়ে ঢাকাকে শক্তিশালী করুন।"

৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর প্রেসিডেন্টের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তাটি মুখ্য সচিব মুজাফফর হোসাইন এবং রাও ফরমান খসড়া প্রণয়ন করে এবং তাতে নিয়াজীর সম্মতি রয়েছে।

"Military situation desperate". পশ্চিমে শত্রুরা ফরিদপুর অগ্রসর হচ্ছে। কুমিল্লা ও লাকসামে আমার সৈন্যকে অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলে মেঘনা নদী পর্যন্ত পথ রুদ্ধ করেছে। চাঁদপুরের পতন হয়েছে। ফলে সকল নদীপথ বন্ধ হয়েছে। যদি বাইরের কোনো সাহায্য না আসে তবে শত্রুরা শহরের (ঢাকা) উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে। ঢাকাস্থ জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছেন যে, জনগণের বিশেষ করে অবাঙালিদের জীবন রক্ষার জন্য ঢাকা শহরকে উন্মুক্ত শহর ঘোষণা করা যেতে পারে। আমি এ প্রস্তাব গ্রহণে ইচ্ছুক ....।"

৯ ডিসেম্বর রাত ১১টায় প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে জানালেন, "আপনার প্রেরিত বার্তা পেয়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝেছি। আমার নিকট যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তার ওপর কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুমোদন দিচ্ছি। আমি আন্তর্জাতিকভাবে সকল ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিন্তু, একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার ন্যায়নীতির ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আমি তা অনুমোদন করবো। আমি জেনারেল নিয়াজীকে একই সাথে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। তদানুসারে কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছি। আপনি যে সকল ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন সে সকল জ্ঞানহীন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধের জন্য বিশেষ করে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।"

১০ ডিসেম্বর

হিলি সেক্টরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। ভৈরব ব্রিজ ভেঙ্গে দেয়ার কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারে মেঘনা নদী অতিক্রম করে নরসিংদীর রায়পুরায় অবতরণ করে। তারা ঢাকা আক্রমণ করবে। কিন্তু পাকিস্তানের ১৪ ডিভিশনের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করা হয়। চারদিক থেকে ঢাকা শহর ঘিরে ফেলা হচ্ছে। ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান শ্যাম মানেকশ, পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন। ফলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

তের দিনের যুদ্ধের সবচেয়ে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১০ ডিসেম্বর ঘটেছে। ঢাকার গভর্নর হাউজে গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক, চীফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন, বেসামরিক প্রধান রাও ফরমান আলী এবং জেনারেল নিয়াজী উপস্থিত। যুদ্ধের বিপর্যয়ের ওপর জেনারেল নিয়াজী সংক্ষেপে বিবরণ দিলেন। ফরমান আলী ও মোজাফফর হোসেন প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘে প্রেরণের জন্য পত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন এবং চারজনে তা অনুমোদন করেন। নিম্নে বার্তা উদ্ধৃত হলো ...

"For President of Pakistan. Your 60007 of 092300 Dec (9 December 11 pm). As the responsibility of taking final and fateful decision has been given

to me. I am handing over the following. Note to Assistant Secretary General Mr. Paul Mark Henry after your approval note begins. It was never the intentions of the armed forces of Pakistan to involve themselve in the allout war on the soil of East Pakistan. However cmm a situation arose which compelled the armed forces to take defensive action. The intention of the Government of Pakistan was always to decide the issues in East Pakistan by means of political solution for which negotiations were afoot. The armed forces have fought heroically against heavy odds and can still continue to do so but in order to avoid further bloodshed and loss of innocent lives, I am making the following proposals."

a. As the conflict arose as a result of political causes cmm it must end with a political solution. Therefore have been authorised by the President of Pakistan to hereby call upon the elected representatives of East Pakistan to arrange for a peaceful formation of the government in Dacca. In making this offer I feel duty bound to say that the will of the people of East Pakistan would demand immediate vacation of their land by the Indian forces as well.

I, therefore, call upon the United Nations to arrange for a peaceful transfer of power and request–

One. An immediate cease fire.

Two. The repatriation with honour of the armed forces of Pakistan to West Pakistan.

Three. Repatriation of West Pakistan personnel desirous of returning to West Pakistan.

Four. Safety of all persons settled in East Pakistan since 1947.

Five. Guarantee of no reprisals also against any person in East Pakistan.

In making this offer cmm I want to make it clear that this is a definite proposal for peaceful transfer of power. The question of surrender of the armed forces would not be considered and does not arise and if this proposal is not accepted the armed forces will continue to fight to the last man. General Niazi has been consulted and submits himself to your command. Request your immediate approval."

Dr. A M Malik

"যেহেতু চূড়ান্ত এবং দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন সে কারণে আমি নিম্নের প্রস্তাব আপনার অনুমোদনের পর জাতিসংঘের মহাসচিব মি. পল মার্ক হেনরির নিকট প্রদান করব।

পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে একটি পূর্ণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কখনো ছিল না। যা হোক এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, যার ফলে সেনাবাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের সর্বদা ইচ্ছা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে মীমাংসা করা হবে। সে কারণে

আলোচনা অব্যাহত ছিল। ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে সেনাবাহিনী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং এখনো করছে। কিন্তু রক্তপাত এবং নিরীহ লোকের জীবনের ক্ষতি পরিহার করার জন্য আমি নিম্নের প্রস্তাব করছি–

(ক) যেহেতু রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ শুরু; সেজন্য রাজনৈতিকভাবে তার সমাপ্তি হতে হবে। যেহেতু আমাকে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায়ন করেছে; আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আহ্বান করে ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হবে, এ প্রস্তাবের সাথে এ আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুসারে তারা তাদের ভূমি থেকে অবিলম্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানাবে। সুতরাং আমি জাতিসংঘকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি–

এক. অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি;

দুই. সম্মানের সাথে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ;

তিন. পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক যারা ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাতে হবে;

চার. ১৯৪৭ সাল হতে যারা বসতি স্থাপন করেছে তাদের নিরাপত্তা;

পাঁচ. পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা না নেয়ার নিশ্চয়তা।

আমি এ প্রস্তাব করার সাথে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই- এ হলো ক্ষমতা হস্তান্তরের সুনিশ্চিত প্রস্তাব। সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে না এবং সে প্রশ্ন আসে না। এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলে সেনাবাহিনীর শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে।

জেনারেল নিয়াজীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি আপনার নির্দেশাধীন আছেন। অবিলম্বে অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।"

জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরি উপরোক্ত বার্তা পেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট পাঠিয়ে দেন। মহাসচিব তার অনুলিপি নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যের নিকট দেন। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া খানের সংশোধিত বার্তা নিউইয়র্ক পৌছে যায়। ইয়াহিয়া খান গভর্নর ডা. মালেকের প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। প্রেসিডেন্ট উক্ত বার্তা সংশোধন করে জাতিসংঘে প্রেরণের জন্য অনুমোদন করেন–

"The proposed draft of your message has gone much beyond what you had suggested and I had approved. It gives the impression that you are talking on behalf of Pakistan when you have mentioned the subject of transfer of power cmm political solution and repatriation of troops from East to West Pakistan etc. This virtually means the acceptances of an independent East Pakistan. The existing situation in your area requires a limited action by you to end hostilities in East Pakistan. Therefore suggest a draft which you are authorised to issue. Quote : In view of complete blockade of East Pakistan by air and sea by over whelming Indian armed forces and the resultant indiscriminate and senseless bloodshed of civil population have introduced

new dimensions to the situation in East Pakistan. The President of Pakistan has authorised me to take whatever measures I may decide. I have therefore decided that although Pakistan Armed Forces have fought heroically against heavey odds and can still continue to do so yet cmm in order to avoid further bloodshed and loss of innocent lives I am making the following proposals:.

One. An immediate cease-fire in East Pakistan to end hostility;

Two. Guarantee of the personnel settled in East Pakistan since 1947;

Three. Guarantee of no reprisals against any person in East Pakistan. Safety of all Armed Forces personnel in East Pakistan. I want to make it clear that this is a definite proposal of ending all hostilities and the question of surrender of armed forces would not be considered and does not arise. Unquote : Within this framework you make additions or changes as you desire. The question of transfer of power and political solution will be tackled at National level which is being done."

"আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমি যা অনুমোদন দিয়েছি তা আপনার খসড়া বার্তাটি ছাড়িয়ে গেছে। আপনি যখন ক্ষমতা হস্তান্তর, রাজনৈতিক সমাধান এবং পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করেছেন, তখন আপনি পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছেন। এর প্রকৃত অর্থ হলো পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করা। আপনার এলাকার বর্তমান অবস্থার জন্য প্রয়োজনে সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষ শেষ করতে হবে। সুতরাং একটি খসড়ার সুপারিশ করুন যা ইস্যু করার জন্য আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হলো।

আকাশ ও সমুদ্রপথে এবং বিরাট ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে। ফলে জনগণকে নির্যাতন এবং নীতি জ্ঞানহীন হত্যা পূর্ব পাকিস্তানে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা আমাকে অর্পণ করেছে। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদিও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অসুবিধা সত্ত্বেও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তারা এখনো যুদ্ধ করতে পারে; তবু আরও রক্তপাত, নির্দোষ মানুষের হত্যা পরিহার করার লক্ষ্যে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি–

* যুদ্ধ বন্ধের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি;
* ১৯৪৭ সাল হতে পূর্ব পাকিস্তানে যারা বসতি স্থাপন করেছেন তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা;
* পূর্ব পাকিস্তানে কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেয়ার নিশ্চয়তা;
* পূর্ব পাকিস্তানে সকল সৈন্যের নিরাপত্তা।

আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এ হলো যুদ্ধ বন্ধের জন্য নিশ্চিত প্রস্তাব এবং তাকে আত্মসমর্পণ হিসেবে মনে করা যাবে না এবং সে প্রশ্ন ওঠে না। এই কাঠামোর মধ্যে আপনি প্রয়োজনীয় রদবদল করতে পারেন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাজনৈতিক সমাধান জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত হবে এবং তা করা হচ্ছে।"

গভর্নর কর্তৃক বার্তাটি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির আলোকে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের কিছু করার ছিল না। রাও ফরমান

আলী ৫ ডিসেম্বর থেকে বলে আসছে চীন প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবে। কিন্তু চীন কোনো প্রকারে উপমহাদেশের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না। তাদের ১৯৬২ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো পাকিস্তানের জন্য সঠিক ছিল। যা হোক ১০ ডিসেম্বর গভর্নরের বার্তা ও পরবর্তী সংশোধিত বার্তাটি কূটনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিজয় ব্যতীত কোনো যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। মুক্তিবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছে– জয় তাদের সুনিশ্চিত। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো পাকবাহিনী কখন আত্মসমর্পণ করবে? ঢাকা শহরে পাকবাহিনী প্রত্যেক রাতে কার্ফু দিচ্ছে– তার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর অপারেশন চলছে।

এ সময় ঢাকা শহরে ৩০,৩৫০ জন পাকিস্তানী একত্রিত হয়েছিল। পদ্মা নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণে ১১ ডিসেম্বর এবং মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে পাকবাহিনী ঢাকা রক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন অবস্থায় মিত্রবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। ফলে ঢাকা শহরে পলায়নরত পাকসেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকা রক্ষার জন্য শহরে তখন প্রায় ৩০ হাজার বিপর্যস্ত সৈন্য ছিল তারা ভীত হয়ে পড়ে, কখন তাদের মুক্তিবাহিনী মেরে ফেলবে– এ চিন্তায় তারা প্রহর গুনছে।

১১ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী, রাও ফরমান আলী পিণ্ডিতে চীফ অব স্টাফের নিকট নিম্নের সঙ্কেত প্রেরণ করেন–

"সকল সেক্টরে আমাদের সৈন্য প্রচণ্ড চাপের মুখে। দুর্গে তারা বিচ্ছিন্ন এবং শত্রু দ্বারা বেষ্টিত। শত্রুরা আকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, স্থানীয় জনসাধারণ এবং বিদ্রোহীরা আমাদের সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর। সকল যাতায়াত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন; শেষ সৈন্য শেষ গুলি– নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে গোলাবারুদ শেষ হলে অবস্থা রক্ষা করা যাবে না। নির্দেশের অপেক্ষায়।"

১১ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার ভাগ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা রাওয়াল পিণ্ডির সেনা সদরে প্রেরণ করা হয়–

"নরসিংদীর দক্ষিণে শত্রুদের প্রায় এক ব্রিগেড সৈন্য এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে এক ব্রিগেড সৈন্য হেলিকপ্টারে অবতরণ করেছে।"

হেলিকপ্টারে মিত্রবাহিনী অবতরণ করছে এবং তারা ঢাকা অগ্রসর হচ্ছে– এ সংবাদে ঢাকায় সেনাপ্রধান জেনারেল নিয়াজী এবং মালেক মন্ত্রিসভা ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দিন ঢাকায় ভারতীয় বিমান বোমা বর্ষণ করছে।

একই দিনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের গেটে নিয়াজী সাংবাদিকদের জানালেন, 'শত্রুরা তার মৃতদেহের ওপর দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করবে।' তার এ কথায় কেন্দ্রীয় সরকার বিব্রত হয়ে পড়ে। ১১ ডিসেম্বর বেসামরিক কর্মকর্তাগণ গভর্নর ভবনে আশ্রয় নেন।

১২ ডিসেম্বর

ভারতীয় নৌবাহিনীর ভিক্রান্ত থেকে বিমান চট্টগ্রামের ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করে। সিলেট শহরের চারদিক থেকে আক্রমণ চলছে। সবচেয়ে সঙ্কটময় ছিল ঢাকা দখল।

মিত্রবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিও ভারতের জেনারেল মানেকশ'র বাণী প্রচার করে। পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীর নিকট মানেকশ এক বাণীতে পাকিস্তান সেনাপ্রধান ও তার সৈন্যদের অস্ত্র সংবরণ করতে বলেন কারণ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। দিল্লী, কলকাতা বেতার থেকে বার বার পাকবাহিনীকে জেনারেল মানেকশ'র আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রচার করা হয়। তার নির্দেশ ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়। ৮ ডিসেম্বর আকাশবাণী থেকে বাংলা ও হিন্দীতে জেনারেল মানেকশ'র ঘোষণা পাক সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রচার শুরু হয় এবং তা ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। বার্তায় বলা হয়– 'হাতিয়ার ডাল দো' 'মিত্রবাহিনী আপনার সৈন্যদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আপনার বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস। আপনি অস্ত্র সমর্পণ করুন'। এ ঘোষণায় আরও বলা হয়– বিজয়ী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণায় কোনো লজ্জা নাই। ১৪ ডিসেম্বর এ সম্পর্কে ছাপানো প্রচারপত্র বিমান থেকে পাক ছাউনিতে ফেলা হয়।

১৩ ডিসেম্বর

মিত্রবাহিনী জামালপুর হয়ে টাঙ্গাইলে ভারতীয় ছত্রী সেনাদের সঙ্গে মিলিত হয়। ইতিমধ্যে কমান্ডিং অফিসার জেনারেল নাগরা তার অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারসহ টাঙ্গাইলে পৌছেন। টাঙ্গাইলে টাইগার কাদের সিদ্দিকীর সাথে মিলিত হন। জেনারেল নাগরা ২ ব্রিগেড ঢাকা অভিমুখে প্রেরণ করেন। জয়দেবপুরে পাকবাহিনী তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ঢাকা চলে যায়। এ সময় পাক সেনারা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। জেনারেল নিয়াজী এই দিন সন্ধ্যায় নিম্নের সিগন্যাল রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঠান–

All fortresses under heavy pressure. No replenishment even of ammunition. Dacca under heavy pressure. Rebels have already surrounded the city. Indians also advancing. Situation serious. Promised assistance (Chinese) must take practical shape by 14 December. Will be effective in Silliguri not NEEA and by engaging enemy air bases."

"সকল সেনা ছাউনি প্রচণ্ড চাপের মুখে। কোনো সরবরাহ নেই; এমনকি অস্ত্রের শূন্যতা পূরণ হচ্ছে না। বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে শহর ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয়রা অগ্রসর হচ্ছে। অবস্থা খুবই সঙ্কটময়। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিশ্রুতি (চীন) অনুসারে সাহায্য আসতে হবে। শিলিগুড়ি নয় নেফায় আক্রমণ চালাতে হবে। শত্রুর বিমান ঘাঁটিকে ব্যস্ত রাখতে হবে।"

১২ তারিখে প্রথম গভর্নর হাউস থেকে কামানের শব্দ শোনা যায়। ১৩ তারিখে মনে হচ্ছে আরও সন্নিকটে এসেছে। পিলখানা, পুলিশ লাইন প্রভৃতি স্থানে ঘন ঘন বিমান হামলা চলছে। ঢাকায় ১১ ডিসেম্বর হতে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ চলছে। মাঝে মাত্র এক ঘণ্টা বিরতি। বিদ্যুত ও পানির সরবরাহ অনিয়মিত হচ্ছে। নতুন খাদ্য সরবরাহ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাগণ শহরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দু'দিন পূর্বে রাও ফরমান প্রস্তাব করেছিলেন তারা বার্মার আকিয়াবে চলে যাবে এবং যুদ্ধবিরতির পরে চলে আসবে।

কিন্তু বিমানবাহিনী প্রধান ইনামুল হক রাজি হননি। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় মূখ্য সচিব মোজাফফর হোসেন, সচিব গিয়াসউদ্দিন, সুলতান মোহাম্মদ এবং এম কাইয়ুমের সাথে কথা বলেন। আশ্চর্য ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকার তখনো পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক খবর জানে না। তাদের কেউ পাট রপ্তানী, কেউ হিন্দুদের যানবাহন দখল করার নির্দেশ দেন। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে রাও ফারমান আলী ইউএন রেডক্রস কমিশনের সাথে আলোচনা করে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়ার ব্যবস্থা করেন। তারা সকলে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে আসেন। ভারতীয় বিমান ১৩ ডিসেম্বর সকালে গভর্নর হাউজে বোমা বর্ষণ করে। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ১২.৩০ মিনিটে গভর্নর পদত্যাগ করেন। কারণ জেনারেল ইয়াহিয়া তার কথা শুনছেন না।

১৩ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল নিয়াজীর বার্তার উত্তরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ উত্তর প্রেরণ করেন নিম্নোক্ত–

'নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা চলছে, খুব সম্ভব যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত নেয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ অব্যাহত রাখুন। পূর্বাঞ্চল কমান্ড গভীর সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তা বুঝতে পেরেছি।' ঢাকার পতন অবশ্যম্ভাবী। এ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া যে উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে বিমান ও নৌবাহিনী পর্যুদস্ত। স্থলবাহিনী পিছু হটছে। পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এমনি সময় ১৩-১৪ ডিসেম্বর রাতে ইসলামাবাদ থেকে ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া জেনারেল নিয়াজীকে ফোনে বলেন যে, গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে। ১৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩.৩০ মিনিটে ইয়াহিয়া খান নিম্নের সঙ্কেত প্রেরণ করেন–

For Governor and General Niazi. From President.

Governor's flash message refers. You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage when further resistant is no longer humanly possible nor will it serve any useful purpose. It will only lead to further loss of life and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel, all those from West Pakistan and all loyal elements. Meanwhile I have moved UN to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to gurantee the safety of the armed forces and all other people who may be the likely target of miscreants.

প্রেরক– প্রেসিডেন্ট

প্রাপক– গভর্নর এবং জেনারেল নিয়াজী।

সূত্র– গভর্নরের বার্তা

"আপনারা সীমাহীন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছেন। জাতি আপনাদের জন্য গর্বিত এবং বিশ্ব আপনাদের প্রশংসা করছে। সমস্যা সমাধানে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়ার জন্য সাহায্যের লক্ষ্যে যা যা করা সম্ভব তা আমি করছি। আপনারা যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে আর প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং

কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। প্রতিরোধ করলে মানুষের জীবন নাশ ও ধ্বংস ডেকে আনবে। যুদ্ধ বন্ধের জন্য এখন আপনাদের সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সেনাবাহিনী, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত নাগরিক এবং সকল অনুগতদের জীবন রক্ষা করুন। অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের অবসান হোক। সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য লোকজন যারা সন্ত্রাসীদের হাতে শিকার হতে পারে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট প্রস্তাব রেখেছি যে, তারা যেন পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ, সেনাবাহিনী এবং যারা সন্ত্রাসীদের শিকার হতে পারে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানায়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল নিয়াজীর সকল দম্ভ শেষ। তারা আত্মসমর্পণ করলেন। শেষ মুহূর্তেও মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করেননি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেন। গভর্নর টেলিফোনে জেনারেল নিয়াজীকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য নির্দেশ দেন। পেপার টাইগার নিয়াজী তখনো তার গভর্নরকে বলেছেন, 'I still had every intention of fighting on'- যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমার ইচ্ছা আছে।'

বুদ্ধিজীবী হত্যা, ১৪ ডিসেম্বর

পূর্বাঞ্চলে পাকবাহিনী সকল সেক্টরে ১৪ ডিসেম্বরের পূর্বে পরাজয় বরণ করে– ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সমর নায়ক, জামায়াত, আলবদরবাহিনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী, রাজনীতিবিদদের হত্যা করবে যাতে মুজিব নগর সরকার ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নামের দেশটি পরিচালনা করতে না পারে। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম ও মওলানা মতিয়ুর রহমান নিজামী। তারা তালিকা প্রণয়ন করে এবং আলবদর বাহিনীর তৈরি করা তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের বাসায় বাসায় গিয়ে ধরে এনে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর রাতে, মিরপুর ও রায়ের বাজারে ফেলে দেয় তাদের লাশ।

পাকিস্তান সামরিক সরকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের ১৪ ডিসেম্বর হত্যার পরিকল্পনা করে এবং তাদের গভর্নর হাউজে এক বৈঠকে আহ্বান করে। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর হাউজে একটানা বোমা বর্ষণের ফলে সভা বাতিল হয়। সামরিক সরকার এমনিভাবে হত্যার যে পরিকল্পনা করেছিল তা পরাজয়ের কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৪ ডিসেম্বর বিকেলে গভর্নর হাউজে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছে। এমনি সময় ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স গভর্নর হাউজে কয়েকবার বিমান হামলা চালায় এবং ভবনের ক্ষতি সাধন করে। গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক ও তার পুতুল মন্ত্রিসভা ত্বরিত গতিতে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের শেষ চিহ্ন শেষ; ঢাকার প্রশাসন, সেনাবাহিনী সব শেষ। এখন আত্মসমর্পণ। গভর্নর বার বার ইয়াহিয়া খানের সাথে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ। ইয়াহিয়া ফোন ধরছেন না। তেমনিভাবে জেনারেল নিয়াজী বার বার চেষ্টা করে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে জেনারেল হামিদ, জেনারেল গুল হাসানের সাথে আলোচনা করতে পারছে না।

একই দিনে সন্ধ্যায় লে. জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান শ্যাম মানেকশ'র নিকট বার্তা প্রেরণের জন্য ঢাকায় আমেরিকার কনসাল জেনারেল মি. হারবার্ট সিপব্যাকের নিকট যান এবং যুদ্ধবিরতির বার্তাটি দিল্লী পাঠাবার জন্য মি. সিপব্যাকের নিকট হস্তান্তর করেন। আমেরিকার কনসাল জেনারেল নিয়াজীর বার্তার একটি কপি ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। নিয়াজীর বার্তাটি ছিল–

"To bring to an end loss of further human lives and destruction we are willing to under honourable conditions :

A. Cease fire and stop all hostilites immediately in East Pakistan.
B. Hand over peacefully administration of East Pakistan as arranged by the UN.
C. The UN should ensure :
1. Safety and securities of all armed forces personnel of both military and para-military forces of Pakistan pending their return to West Pakistan.
2. Safety of all West Pakistan civilian and civil servants, pending their return to West Pakistan.
3. Safety of non-locals settled in East Pakistan since 1947.
4. Guarantee of no reprisal against those who helped and served the government and cause of Pakistan since March 1971.

এর একটি অনুলিপি রাও ফরমান গভর্নরের নিকট পৌঁছে দেন। নিয়াজী তার সেনাবাহিনী, পাকিস্তানী নাগরিক, অবাঙালিদের নিরাপত্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের শর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হন।

সিপব্যাক নিয়াজীর বার্তাটি দিল্লী না পাঠিয়ে ওয়াশিংটন পাঠান। কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে আর একদিন অপেক্ষা করতে বলেন। জেনারেল শ্যাম মানেকশ নিয়াজীর বার্তাটি ১৫ ডিসেম্বর পেয়েছিলেন।

গভর্নর ডা. মালিক ১৫ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর নিকট লিখলেন–

My dear General Niazi,

May I know of any action has been taken from your side, on Pak Army signal no. GOO 13 dated 14. 12. 1971 from the president to you and to me as the Governor? This message clearly said– "You should take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of armed forces personnel, all those are from West Pakistan and all loyal elements". The signal also says, "You have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible, nor will it serve any useful purpose. Hostility is still continuing and loss of life and disaster continue. I request you to do the needful."

Yours sincerely,
A. M. Malik

গভর্নর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের রেড ক্রিসেন্ট আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে (ICRC) অবস্থান করছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১০.৩০ মিনিট। রাওয়ালপিণ্ডিতে সিওএস-এর নিকট জানতে চাইলেন যে. তিনি যে প্রেসিডেন্টকে বার্তাটি পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো

উপদেশ আছে কি-না। জেনারেল আব্দুল হামিদ রাত ১১.৫০ মিনিটে নিয়াজীকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন।

Reference : G- 1310. Saw your reply to president and heard Indian COAS reply on AIR. Suggest accept terms by COAS (India) as they appear to meet your requirements. Will however, be local military decision with no bearing on political outcome.

জেনারেল হামিদ নিয়াজীকে ভারতের চীফ অব স্টাফের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ বিরতি গ্রহণের উপদেশ দেন। হাসান জহির লিখেছেন, "এদিন প্রত্যুষে (১৫ ডিসেম্বর) বিগত দিনের নির্দেশের ধারাবাহিকতা হিসেবে জিএইচকিউ (GHQ) পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ককে কাগজের টাকা, ট্রাভেলার্স চেক, ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেজারি চেক, সিগন্যাল এবং কোড বই ধ্বংসের নির্দেশ দেন। ১৫ তারিখ রাতে স্টেট ব্যাংক খোলা রাখা হয় এবং নোটসমূহ পুড়িয়ে ফেলে। আসন্ন শত্রুর দখলে যাওয়ার পূর্বে পাকবাহিনী পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। এ কাজ ছিল পোড়ামাটি নীতির অংশবিশেষ। আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশে এ কাজের বিরুদ্ধে ভীষণ সমালোচনা হয়েছিল।" পাকবাহিনী যে কত জঘন্য ছিল তা স্টেট ব্যাংকের নোট পোড়ানো থেকে জানা যায়। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে।

ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ জেনারেল নিয়াজীকে বার্তার উত্তর প্রেরণ করেন ১৫ ডিসেম্বর রাত ২৩.৩০ মিনিটে।

For Lt. General Niazi from Sam Manekshaw, Chief of the Army Staff India.

Firstly, I have received your communication of cease fire, in Bangladesh at 1430 hours today through the American Embassy at New Delhi.

Secondly, I had seriously informed General Farman Ali in two messages that I would guarantee (a) The safety of all your military and para military forces who surrender to me in Bangladesh. (b) Complete protection to Foreign Nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin who they may be since you have indicated your desire to stop fighting. I expect you to issue order to all forces under your command in Bangladesh to cease fire immediately and surrender to my advancing forces wherever they are located.

Thirdly, I give you my solemn assurence that presonnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to and I shall abide the provisions of the Geneva Convention.

Fourth, as you have many wounded I shall ensure that they are well cared for and your dead given proper burial. No one need have any fear for their safety, no matter where they came from. Nor shall there be any reprisals by forces operating under my command. Further, immediately I receive a positive response from you.

I shall direct General Arora the commander of India and Bangladesh Forces in the Eastern Theatre to refrain from all air and general actions against

your forces. As a token of my good faith I have ordered that no air action shall take place over Dacca from 1700 hours today.

Fifthly, I assure you I have no desire to inflict any unnecessary casuality on your troops, as I abhor loss on human lives. However should you not comply with what I have stated you will have me with no other alternative but to resume my offensive with the utmost vigour at 0900 hours Indian standard time on 16th December.

Sixthly, in order to be able to discuss and finalize all matters quickly I have arranged for a radio link on listening from 1700 hours Indian Standard Time today 15th December. The frequency will 6605 (6605) KHz by day and 3216 (3216) KHz by night. Call signs will be Calcutta and Dac (Dacca). I would suggest you instruct your signallers to restore microwave communications immediately (Emphases added)

প্রাপক : লে. জেনারেল নিয়াজী

প্রেরক : শ্যাম মানেকশ, ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান

প্রথম, আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আপনার যুদ্ধবিরতির বার্তা আমি আজ ১৪.৩০ পেয়েছি।

দ্বিতীয়, আমি জেনারেল ফরমান আলীর দুটো বার্তার মাধ্যমে পূর্বেই তাকে অবহিত করেছি যে, আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি (ক) বাংলাদেশে আপনার সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী যারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করবে তাদের সকলের নিরাপত্তা। (খ) বিদেশি নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু, পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক যেই হোক না কেন তাদের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান। যেহেতু আপনি যুদ্ধ বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সে কারণে আপনি আপনার অধীনের সকল সৈন্যকে অবলিম্বে যুদ্ধবিরতি এবং আমার অগ্রগামী সৈন্যদের নিকট যেখানে তারা অবস্থান করুন না কেন তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন।

তৃতীয়, আমি আপনাকে পবিত্র নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি যে, যে সকল ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে তাদের একজন সৈন্যর যে মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্য তেমনি তারা সম্মান ও মর্যাদার ব্যবহার পাবে এবং আমি জেনেভা চুক্তির ধারা মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনাদের আহত সৈন্যদের যথাযথ যত্ন নেয়া হবে এবং মৃতদের সঠিকভাবে কবর দেয়া হবে। যে যেখান থেকে আসুক তাদের নিরাপত্তাহীনতার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমার অধীনে যুদ্ধরত কোনো বাহিনী প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

চতুর্থ, আপনার নিকট থেকে এখনই সাড়া পেলে পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরাকে আপনার সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিমান ও স্থল বাহিনীর আক্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করবো। আমার বিশ্বাসের অংশ হিসাবে আজকের ১৭.০০ টা থেকে ঢাকায় বিমান হামলা না করার নির্দেশ দিয়েছি।

পঞ্চম, আমি মানব হত্যাকে ঘৃণা করি। সে কারণে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার লোকদের হত্যার ইচ্ছা নেই। আমি যা বলেছি তা যদি আপনি না মানেন

তাহলে আমার কোনো বিকল্প থাকবে না। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় স্থানীয় সময় সকাল ০৯.০০ সেনাবাহিনী তীব্রবেগে আক্রমণ শুরু করবে।

ষষ্ঠ, আলোচনা চূড়ান্ত করার জন্য আজ ১৫ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় ১৭.০০ হতে বেতার সংযোগের ব্যবস্থা করেছি ....।

জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশ থেকে উত্তর পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পাঠান। ১৬ ডিসেম্বর ৩টায় ভারতীয় সেনাপতির দেয়া শর্ত গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়।

এখানে একটি প্রশ্ন, রাও ফরমান আলী গভর্নর বা নিয়াজীকে না জানিয়ে কি করে মানেকশ'র সাথে যোগাযোগ করলেন। খুব সম্ভব তিনি রাওয়ালপিণ্ডির সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৫ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল রহিমকে হেলিকপ্টারে বার্মা পাঠানো হয়। তার সাথে ফরমান আলী যেতে চেয়েছিলেন। নিয়াজী তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে তিনি থেকে যান।

আমেরিকার ভূমিকা কি ছিল বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে,

রেডিওতে ঢাকায় ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের সংবাদ প্রচারে পররাষ্ট্র সচিব ইয়াহিয়া খানকে টেলিফোন করেন। প্রেসিডেন্ট তাকে পরদিন সকালে দেখা করতে বলেন। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ইয়াহিয়া খান পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদের সাথে যুদ্ধবিরতি গ্রহণে সম্মত হন। কিন্তু তা হবে সাধারণ পরিষদের কাঠামোর মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে সংবাদ এল পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হেনরি কিসিঞ্জারের নিকট থেকে একটি সংবাদ নিয়ে এসেছেন। কিসিঞ্জার জানিয়েছেন যে, তিনি ব্রিটেনের নিকট থেকে জানতে পেরেছেন, ভারত তার প্রস্তাব ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখবে এবং তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন সংযোজন পর্বের প্রস্তাবে ঐ রাতে নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করবেন। কিসিঞ্জার ইয়াহিয়া খানকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতের প্রস্তাব গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যথায় ভারত পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অজুহাত পাবে এবং তারা তাদের মতো প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করার সুযোগ পাবে।

পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে কিসিঞ্জারের পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রচণ্ডভাবে চাপ দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সামনে ভয়ানক বিপদ। ভারত তার সকল বিমান বাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তিনি তার বিমান অভিজ্ঞতা থেকে ধ্বংসের বিশেষজ্ঞ মতামত দিলেন যে, ভারত এক শ' বিমান নিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি কিছু বেঁচে যায় তা পুনরায় তুলে নেয়ার সময় ভারতের দ্বিতীয় আক্রমণে তা ভূমিতে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলেন যে, আকাশেই যুদ্ধে বিজয় লাভ হয় না। আমেরিকার মতের ওপর অনেক নির্ভর করে। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিকট যে পত্র লিখেছেন তার উত্তরের অপেক্ষায় আছেন।

ইয়াহিয়া সরাসরি ফারল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, Are you going to help or am I going to be left in the lurchd? and added in the same tone, "I do not want to

be led up the garden path. Several promises and hopes have been held but until now I do not see any sign of practical help."

আপনারা কি সত্যি সাহায্য করবেন, না আমি গভীর বিপদে পতিত হব? তিনি একই সুরে আরও বলেন, আমি ঝুঁকিপূর্ণ পথে নিপতিত হতে পছন্দ করি না। অনেক অঙ্গীকার এবং আশা দেখানো হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি কোনো বাস্তব সাহায্যের নমুনা দেখছি না। ফারল্যান্ড নিক্সনের অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য করার অভিযোগে প্রেস নিক্সনকে কঠোর সমালোচনা করেছে। এখন নির্বাচনের সময়। ডেমোক্রেটিক পার্টি বাংলাদেশকে নির্বাচনে ইস্যু করবে। নিক্সন যত দ্রুত সম্ভব সাহায্য প্রদান করবেন। ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে তার ভালোর দিকটি তুলে ধরেন– পূর্ব পাকিস্তানের বোঝা থেকে পশ্চিম পাকিস্তান মুক্ত হবে এবং পাকিস্তান হবে সমৃদ্ধিশালী দেশ। যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দেবে। ভারতের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নিম্নে—

Farland– I have a request. If you are not accepting the cease-fire, please let me know. I want to evacuate the Americans.

Yahya– why?

Farland– Pakistan is not to be a fit place to live in if India really starts this offensive.

Yahya– Do not lose your bloody nerve like that.

Farland– Not as a friend but I am asking you as ambassador of my country that if you are not accepting, please let me know in time so that I evacuate Americans. Pakistan will not be a healthy place for any human being.

ফারল্যান্ড ইয়াহিয়াকে বললেন, "আপনি যদি যুদ্ধবিরতি গ্রহণ না করেন, আমাকে বলুন। আমি আমেরিকার নাগরিকদের স্থান ত্যাগ করাব। কারণ ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান বাস করার যোগ্য হবে না। তাই আমাকে সময়মতো বলুন। আমি আমেরিকানদের নিয়ে যাব।" ফারল্যান্ড আমেরিকার মতামত জানালেন যে, ভারত চায় যে পাকিস্তান তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুক। তাহলে তারা সর্বশক্তি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত চলে যাবার পর ইয়াহিয়া খান সুলতান মোহাম্মদকে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের খসড়া প্রণয়ন করতে বলেন এবং জেনারেল হামিদ, লে. জেনারেল গুল হাসান এবং এয়ার মার্শাল রহিম খানকে ডেকে পাঠালেন। ফারল্যান্ডের সাথে তার যে আলোচনা হয়েছে তা তাদের অবহিত করেন। তারা তিন জনে ভারতের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হন। অন্যদিকে সচিবালয়ে ইমার্জেন্সি কমিটি কয়েকটি শর্ত জুড়ে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। তারা বলেন, জাতিসংঘের ৭ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের আলোকে যুদ্ধবিরতি গৃহীত হবে এবং পূর্ব বাংলা থেকে ভারত ও পাকিস্তানীদের সৈন্য প্রত্যাহার করালে জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী পূরণ করবে। এ সময় এম এম আহাম্মদ, তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান, জেনারেল পীরজাদা, গোলাম ইসহাক খান উপস্থিত ছিলেন। ইয়াহিয়া খান পররাষ্ট্র সচিবের খসড়া ভাষণটি সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করতে বলেন। রোয়েদাদ খান বলেন, যুদ্ধবিরতি জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে হচ্ছে না, হবে ভারতের প্রস্তাবে। ইয়াহিয়া খান

এই বলে আলোচনা শেষ করেন যে, "The responsibility is mine and I am not going to shift it to anyody else. Whether it is popular or not, I will do it."

দায়িত্ব আমার। আমি অন্য কারও ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছি না। এটা ভালো হোক না হোক, আমি এ করবই। রোয়েদাদ খান বলেন, এর ফলে জনগণ বিপক্ষে যেতে পারে। ইয়াহিয়া খান তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন—

The people should have been prepared. If they are not, it is your problem.– জনগণকে প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। যদি তারা না থাকে তা আপনাদের সমস্যা। শব্দের কিছু পরিবর্তনের পর সকলে খসড়া ঘোষণা অনুমোদন করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি গ্রহণের ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করে। ২৩ বছর একত্রে থাকার পর পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলো।

কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি কমিটির সদস্য এম. এম. আহমেদ, গিয়াসউদ্দিন, গোলাম ইসহাক খান, কামরুল ইসলাম, রোয়েদাদ খান, সুলতান মোহাম্মদ খান ১৫ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে প্রস্তাব দেন যে, পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ চলবে। ইয়াহিয়া তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন। বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর তিনি ১৫-১৬ ডিসেম্বর বেতার ভাষণ দেবেন। ভাষণ চূড়ান্ত করার পর তা প্রস্তাবিত প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনকে দেখাতে বলেন। পূর্ব পাকিস্তান হাউজে নূরুল আমিন ও মাহমুদ আলী অবস্থান করছিলেন। নূরুল আমিন ও মাহমুদ আলী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং তারা ইয়াহিয়া সরকারকে সমর্থন করে বাঙালি নিধনে সহযোগিতা করেন। খসড়া ভাষণ আলোচনার জন্য নূরুল আমিন, মাহমুদ আলী, তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে যান। নূরুল আমিন প্রেসিডেন্টকে উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'এতো সস্তা মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্রি করে দেয়া দেখার জন্য আজ আমি বেঁচে আছি কি?' প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তানের জন্য আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। নূরুল আমিন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আজই ঘোষণার জন্য দাবি তোলেন। ইয়াহিয়া আগামীকাল ঘোষণা করার নিশ্চয়তা দেন। ভাষণের উর্দু ও ইংরেজি অনুবাদ ১৫ ডিসেম্বর সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌছানো হয়। প্রেসিডেন্ট সন্ধ্যা ৮.৩০ মিনিটে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং জানান, যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানে চলবে। তিনি বলেন, একটি যুদ্ধের বিপর্যয় দ্বারা যুদ্ধের সমাপ্ত বুঝায় না। ১৭ ডিসেম্বর রাত ৮টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিম পাকিস্তানে একক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্ত হয়।

পাকিস্তানের পরাজয়– বিজয় বাংলাদেশের।

১৬ ডিসেম্বর। যুদ্ধ বিরতির শর্তাবলি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে নির্দেশের জন্য গভর্নর ডা. এ. এম মালিক এবং পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানী কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী অপেক্ষা করছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১২টায় গভর্নর একটি উচ্চ পর্যায়ের জরুরিসভা আহ্বান করেন। সকাল ৯.৩০ মিনিটে ভারতীয় সিগন্যাল ইনটেলিজেন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত লে. কর্নেল পিসি

ভাল্লা গভর্নর হাউজের সভার সংবাদ সিগনালে ধরে ফেলেন। লে. জেনারেল জ্যাকোব এই সংবাদটি শিলংয়ে অবস্থিত ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডার এয়ার ভাইস মার্শাল দেশ্বরকে অবহিত করেন। গভর্নর যাতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হন সে জন্য ভারতীয় বিমান গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন) বোমা বষর্ণ শুরু করে। এ সময় সাংবাদিক জ্যাবিন ইয়ং জাতিসংঘের প্রতিনিধি কেলির সাথে দেখা করার জন্য গভর্নর হাউজে গিয়েছিলেন। গভর্নর ভীত হয়ে কেলিকে বলেন, আপনি কি মনে করেন আমাদের এখন ছেড়ে দেয়া উচিত? ডা. মালিক ইয়াহিয়া খানকে সম্বোধন করে পদত্যাগপত্র লেখেন। এ সময় গভর্নর হাউজে উপর্যুপরি বিমানের বোমা হামলা চলছিল। তার মধ্যে তিনি জুতা খুলে অজু করে ট্রেঞ্চে নামাজ আদায় করেন। এ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শেষ সরকারের গভর্নর– তিনি পরে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কেন্দ্র– হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে যান।

১৫ ডিসেম্বর জেনারেল শ্যাম মানেকশ জেনারেল নিয়াজী প্রেরিত যুদ্ধবিরতির বার্তা পেলেন। মানেকশ নিয়াজীকে উত্তর প্রেরণ করেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৭.০০ ঘণ্টা থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি পালন করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। নিয়াজীর অনুরোধে যুদ্ধবিরতির সময় ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১৫ ডিসেম্বর রাতে ১০১ কমিউনিকেশন বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল নাগরা, টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী কালিয়াকৈর হয়ে নয়ারহাট-ঢাকা সড়ক ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। ঢাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার বাশার অস্থির; তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন মুক্তিবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি। সকাল ৬ টায় নাগরা দেখলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করছে না। নিয়াজী সকল সেনা ছাউনিতে যুদ্ধবিরতির বার্তা পাঠালেন। তুরাগ নদীর ওপারে গাবতলীতে পাকিস্তান বাহিনী এবং পূর্ব পাড়ে মিত্রবাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। ভোর রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি জীপে মিত্রবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য মিরপুর সেতুর ওপর যওয়ার চেষ্টা করলে পাকবাহিনীর মেজর সালামতের নির্দেশে পাকবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে জীপের ভিতরে একজন অফিসারসহ ৪ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। ভারতীয় সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করলে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়।

জয়ের আনন্দ- জেনারেল নাগরা ও টাইগার সিদ্দিকী ঢাকা দখল করবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা গোলাবর্ষণ বন্ধ করেছে। নাগরা সিদ্ধান্ত নিলেন এই মুহূর্তে নিয়াজীর নিকট দূত পাঠাবেন। জীপের সামনে থাকবে বিরাট সাদা ফ্লাগ। দু'জন অফিসার তাদের নিকট নিয়াজীকে নিম্নের বার্তা পাঠালেন–

"প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখন মিরপুর ব্রিজে। ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবো। শীঘ্রই আপনার প্রতিনিধি পাঠান।"

নাগরা তার এডিসিকে বার্তাটি নিয়াজীর হাতে পৌছে দিতে বলেন। সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে জীপটি ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টারে এসে পৌছলো। সকাল ৯টায় বার্তাটি নিয়াজীর হাতে তুলে দেন। তখন সেখানে বসা ছিলেন নিয়াজী, মেজর জেনারেল জামসেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, রিয়ার এডমিরাল শরিফ। নিয়াজী বার্তাটি নীরবে পড়ে

অন্যদের হাতে দেন। তখন সেখানে কবরের নীরবতা বিরাজ করছিল। মিত্রবাহিনীকে প্রতিহত করার মতো সৈন্য জেনারেল নিয়াজীর ঢাকায় ছিল না। হয়ত তিনি মিত্রবাহিনীকে কয়েক দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; তাতে লোক ক্ষয় হতো। জাতিসংঘ চেষ্টা করছে ভরত-রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে। কিন্তু পাকবাহিনীর যেভাবে মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল তাতে প্রতিহত করার শক্তি ছিল না। বিমান নেই, নৌবাহিনী নেই। তারা কয়েকটা শহরে জনবন্দী। তাদের আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা ছিল না। জেনারেল নিয়াজী ও তার যুদ্ধের সাথীরা ভাবলেন জেনারেল নাগরা সন্ধি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে আসবেন। সিদ্ধান্ত হলো তাকে অভ্যর্থনা দেয়া হবে। ঢাকার জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনার জন্য মিরপুর ব্রিজে যান। নাগরা সাদা ফ্লাগ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পাকিস্তানী এক মেজর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের বার্তা প্রদান করেন। জেনারেল জামসেদ ব্রিজের পশ্চিম পাশে অপেক্ষা করছিলেন। জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং ক্লার, কাদের সিদ্দিকী সাদা ফ্লাগের জীপে পশ্চিম পারে এলেন। জেনারেল জামসেদ তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তখন সকাল সাড়ে দশটা, কুয়াশা কেটে গেছে। জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকীর ঢাকা শহরে প্রবেশের সাথে সাথে ঢাকার পতন ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলো। তারা ৩৬ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে পৌছলে ইস্টার্ন আর্মির চীফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকের সবাইকে অভ্যর্থনা জানান। ইস্টার্ন কমান্ডারের কক্ষের অপারেশন ম্যাপ সরিয়ে কক্ষটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর জেনারেল নিয়াজী কক্ষ ত্যাগ করে সকলের সাথে করমর্দন করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। জেনারেল নাগরা কাদের সিদ্দিকীকে নিয়াজীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। পরিচয়ের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। জেনারেল নিয়াজী কাদের সিদ্দিকীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে কাদের সিদ্দিকী হাত না মিলিয়ে বললেন, "যারা নারী ও শিশু হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আমি আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে চাই না।"

১৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় কলকাতার থিয়েটার রোডে মুজিব নগর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নিকট খবর এলো ঢাকায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে। বিকেল ৩টায় পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে। ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী । কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। ভারতীয় বাহিনী চাচ্ছে ওসমানী উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও সেনাপতি ওসমানীর সাথে আলোচনাকালে বিশিষ্ট সাংবাদিক চরমপত্র লেখক-পাঠক এম. আর আখতার মুকুল উপস্থিত ছিলেন। পরে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার কমোডর এ. কে খন্দকারকে তাজউদ্দিন আহমেদ ঢাকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী কেন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি– এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে ঢাকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ জানান। ওসমানী ভয় পেলেন ঢাকা

গেলে পাকসেনারা হয়তো তাকে গুলি করে হত্যা করতে পারে। সেজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার জীবনের মূল্য খুব বেশি। আমি যেতে পারব না।" পরবর্তী জীবনে জেনারেল ওসমানীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, "আমি একখানা বই লিখছি তাতে সব ঘটনাই পাবেন।" জেনারেল ওসমানী অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময় পদমর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেকশ থাকবেন না; সুতরাং একটি স্বাধীন দেশের সেনাপতি হিসেবে তার চেয়ে নিচের পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়।

এমনি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দাকারকে বলেন, ' আজ বিকেল ৪টায় রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান। সেখানে আপনাকেই মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এটা আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। আপনার জন্য দমদম বিমানবন্দরে একটি হেলিকপ্টার তৈরি রয়েছে। আর একটা কথা- আমার জীপটা নিয়েই দমদম এয়ারপোর্টে চলে যান। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এ ফাইলটিতে রয়েছে। জীপে বসেই পড়ে নিতে পারবেন।

জেনারেল মানেকশ ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধ বিরতির বার্তা পান। তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও নাগরিকদের নিশ্চয়তা প্রদান করলে নিয়াজী আত্মসমর্পণে সম্মত হন। ১৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় জেনারেল মানেকশ লে. জেনারেল জ্যাকবকে ঢাকায় ঐদিন বিকেলে আত্মসমর্পণের আয়োজনের জন্য অতিশীঘ্র ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ দেন। জ্যাকব ইতিপূর্বে আত্মসমর্পণ দলিলের খসড়া জেনারেল মানেকশ'র নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। জ্যাকব ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অরোরাকে প্রধান সেনাপতির বার্তা জানালেন। নিয়াজী জ্যাকবকে দুপুরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জ্যাকব কর্নেল সেহনোকে নির্দেশ দেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানী ও এ. কে খন্দকার যেন ঢাকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণ দলিলের একটি খসড়া নিয়ে হেলিকপ্টারে যশোর হয়ে ঢাকা পৌছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হেলিপোর্টে জ্যাকবকে অভ্যর্থনা জানান। জ্যাকব দুপুর একটায় সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে পৌছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী পৌছেন। জেনারেল নিয়াজী তার কক্ষে জেনারেল জ্যাকবকে অভ্যর্থনা জনান। আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল নিয়াজী, রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জামসেদ, রিয়াল এডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডর ইনামুল হক। জেনারেল জ্যাকব যুদ্ধবিরতির খসড়া কপি জেনারেল নিয়াজীকে দেখান। কর্নেল খারা আত্মসমর্পণ দলিলের খসড়া পাঠ করেন। রাও ফরমান সারেন্ডার এবং বাংলাদেশ শব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। জ্যাকব পাকিস্তানী জেনারেলদের বুঝাতে সক্ষম হন। নিয়াজী দলিলটি জ্যাকবের হাতে ফিরিয়ে দেন। মনে হলো ইচ্ছা না থাকলেও তার মৌন সম্মতি ছিল। জ্যাকব নিয়াজীকে বলেন, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত হবে। নিয়াজী বলেন অনুষ্ঠান তাদের অফিসে হতে পারে। জ্যাকব বলেন, জেনারেল অরোরাকে ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী গার্ড অব অনার প্রদান করবেন। গার্ড

অব অনারের পর অরোরা এবং নিয়াজী সারেন্ডার ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করবেন। তারপর নিয়াজী তার তরবারি হস্তান্তর করবেন। নিয়াজী বলেন তার তরবারি নেই। তাহলে তিনি পিস্তল সমর্পণ করবেন। নিয়াজীকে অত্যন্ত অখুশি মনে হলো। তিনি চুপ হয়ে যান। জেনারেল জ্যাকব একটি সাধারণ টেবিল সংগ্রহ করেন। তাকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ দেয়নি। সাধারণভাবে তিনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সকাল থেকে মুক্তিবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করতে থাকে। জেনারেল নিয়াজী নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র রাখার অনুমতি চায়নি। তখনো ঢাকা শহরে ভারতীয় বাহিনী এসে পৌছায়নি। মুক্তিবাহিনী সারা শহরে এসে গেছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দার তার বাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা শহরে পৌছেছে।

দুপুরে খাবারের পর বিকেল ৩টায় নিয়াজীর গাড়িতে জ্যাকব জেনারেল অরোরাকে অভ্যর্থনার জন্য বিমানবন্দরে রওনা দেন। পথে মুক্তিবাহিনী ও জনগণ তাদের বাধা দেয়। নিয়াজির ওপর জনগণ ক্রোধে ফেটে পড়ে। নিয়াজীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত। জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী বিমানবন্দরে অরোরার জন্য অপেক্ষা করছেন। কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী নিয়ে জেনারেল নিয়াজীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেন। জ্যাকব বিপদ সঙ্কেত পেলেন। দলিলে স্বাক্ষরের জন্য নিয়াজীকে স্বাক্ষর করতে হবে। লে. জেনারেল জ্যাকব তার গ্রন্থে লিখেছেন – "I sensed trouble and asked the two paratroopers to shield Niazi. I walked toward siddiqui. It was imperative that Niazi should live to sign the instrument of surrender. I was afraid that siddiqi may have come to shoot Niazi."

জেনারেল জ্যাকব মনে করলেন কাদের সিদ্দিকী জেনারেল নিয়াজীকে হত্যা করতে পারেন। তাই তাকে অবিলম্বে বিমানবন্দর ত্যাগ করার আদেশ দেন। কাদের সিদ্দিকী রাগান্বিত হয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। বিকেল ৪.৩০ মিনিট ইস্টার্ন থিয়েটারের কমান্ডার এবং মিত্রবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ কাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, মিত্র বাহিনীর এয়ার মার্শাল দেওয়ান, রিয়ার এডমিরাল কৃষ্ণ, মিসেস আরোরা হেলিকপ্টার যোগে বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত বিমানবন্দরটি দ্রুত মেরামত করে অবতরণের উপযোগী করা হয়। বিমানবন্দরের টারমাকে ১৮ জঙ্গী বিমান ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। জেনারেল জ্যাকব, জেনারেল নিয়াজী এবং এয়ার মার্শাল দেওয়ান এগিয়ে গিয়ে মিত্রবাহিনীর প্রধান অরোরাকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর গাড়ির বহর রমনা রেসকোর্স ময়দানের দিকে এগিয়ে চলে। রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোক উপস্থিত। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কাদের সিদ্দিকীর কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা মিরপুর ব্রিজ হয়ে এবং ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দার ও তার বাহিনী ডেমরা-কমলাপুর দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। এটিএম হায়দার বেতার কেন্দ্র দখল করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো শশ্রুমণ্ডিত ছিল। বিজয় আনন্দে তারা আকাশে গুলি ছুড়ে মারে, সে কি আনন্দ। বাঙালি জাতির জীবনে এতো বড় বিজয় ও আনন্দ আর আসেনি। পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে শুনে দশ লক্ষ লোক ৯ মাস ৯ দিন পর আবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে হাজির হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে ময়দানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে পাকিস্তানের পরিসমাপ্তি হবে, জেনারেল নিয়াজী ও তার ৯৩ হাজার দুর্ধর্ষ, হত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারী, বর্বর সেনাবাহিনী মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবে; লক্ষ লক্ষ বাঙালি তা দেখবে।

মিত্রবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান এবং সামরিক শাসক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজী রেসকোর্সে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামলেন। পিছনের গাড়ি থেকে নামলেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী, ভারতীয় ১০১ মাউন্টেন ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল নাগরা, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ৯৫ মাউন্টেনের ব্রিগেডিয়ার এইচ. এম. ক্লার, ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল হেরা গাড়ি থেকে নেমে মিত্রবাহিনীর প্রধানের সারিতে দাঁড়ালেন। অন্য গাড়িগুলো থেকে শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত অবস্থায় নামলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জামসেদ, রিয়ার এডমিরাল শরীফ, ব্রিগেডিয়ার বাকের, এয়ার কমোডর ইনামুল হক। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে পাকিস্তানের ছোট একটি দল শিখ জেনারেল গান্ধব নাগরার নেতৃত্বে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। তারপর জেনারেল অরোরা ও নিয়াজী গার্ড অব অনার পরিদর্শনের পর টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। জেনারেল অরোরা আত্মসমর্পণ দলিল টেবিলে রাখেন। জেনারেল নিয়াজী দলিল দেখলেন। কিন্তু কোনো শব্দ করেননি। জেনারেল অরোরা প্রথমে মিত্রবাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং তার পর জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ নিয়জী দলিলে স্বাক্ষর করেন।

ইংরেজি ভাষায় স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণ দলিলের বঙ্গানুবাদ,

"পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়। পাকিস্তানের সকল স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর প্যারামিলিটারি এবং বেসামরিক সশস্ত্র সেনাবাহিনী এ আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সকল সৈন্য তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং লে. জেনারেল জগজিৎ সিং-এর অধীনস্থ নিকটস্থ নিয়মিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

এ দলিল স্বাক্ষরের সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনী লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে চলে আসবে। নির্দেশ ভঙ্গ করলে তা আত্মসমর্পণ শর্ত ভঙ্গকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা যুদ্ধের রীতি ও আইন অনুসারে বিচার করা হবে। যদি আত্মসমর্পণের শর্তের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিশ্চিত আশ্বাস দেন, যে সকল সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের সাথে জেনেভা কনভেনশনের বিধির অধীনে সেনাবাহিনীর প্রাপ্যতা অনুসারে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং পাকিস্তানের সৈন্য

এবং প্যারামিলিটারি যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনের সেনাবাহিনী বিদেশি নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।"

জগজিৎ সিং অরোরা
লে. জেনারেল
পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় এবং
বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান
সেনাপতি
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আমীর আব্দুল্লাহ্ নিয়াজী
লে. জেনারেল
সামরিক প্রশাসক
জোন-খ এবং
পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইংরেজি ভাষায় আত্মসমর্পণের দলিল

Instrument of surrender signed at Dacca at 1631 hours (1st) on 16 Dec 1971

The Pakistan Eastern Command agree to surrender all Pakistan Armed Forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Aurora, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all Pakistan land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. The forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora.

The Pakistan Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General Jagjit Sing Aurora will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the Geneva Convention and guarantees the safety and well–being of all Pakistan military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora.

(Jagjit Singh Aurora)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and Bangladesh Forces in the
Eastern Theatre
16 December 1971

(Amir Abdullah Khan Niazi)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)
16 December 1971

দলিলে স্বাক্ষরের সময় ছিল (ভারতীয় স্থানীয় সময়) বিকেল ৪.৩১ মিনিট (১৬.৩১ মিনিট)

তৃতীয় অধ্যায়
কিছু আলোচনা, ভাষণ ও সাক্ষাৎকার

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ

১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বিজয় লাভের প্রাক্কালে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও অন্যান্য দেশকে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন "আজকের বিজয় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর বিজয়, সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিজয়। আমাদের সাফল্যের এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। তিনি যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যেভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসে তার নজির নেই। তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এখনো শত্রুর কারাগারে। পাকিস্তানী শাসকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি তারা শেষ মুহূর্তেও অন্তত শুভবুদ্ধির পরিচয় দিন। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করুন।"

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রদান করেন–

I have an announcement to make. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered in Bangladesh. The instrument of surrender was signed in Dacca at 16.13 hours I.S.T. today by Lt. General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lt. General Jagjit Singh Aurora, Commnader in Chief of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre accepted the surrender. Dacca is now the free capital of a free country.

This house and the entire nation rejoin in this historic event. We hail the people of Bangladesh in their hour of triumphal. We hail the brave young men and boys of the Muktibahini for their valour and dedication. We are proud of our own Army, Navy, Air Force and the Border Security Forces, who have so magnificently demonstrated their quality and capacity ..... Our objectives were limited- to assist the gallant people of Bangladesh and their Muktibahini to liberate their country from a reign of terror and to resist aggression on our own land. Indian armed forces will not remain in Bangladesh any longer than is necessary We hope and trust that the father of this new nation, Sheikh Mujibur Rahman, will take his rightful place among his own people and lead Bangladesh to peace, progress and prosperity.

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "আজ আমি একটা ঘোষণা দিচ্ছি। ঢাকায় ১৬.৩১ ঘণ্টায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছেন এবং ইস্টার্ন থিয়েটারের ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণের দলিল গ্রহণ করেছেন। ঢাকা এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী।

এই ঐতিহাসিক ঘটনায় এই সংসদ ও সমগ্র জাতি আনন্দ উৎসবে মুখরিত। আমরা তাদের বিজয় মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা মুক্তিবাহিনীর সাহসী যুবক ও ছেলেদের তাদের দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমরা আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জন্য গর্বিত। তারা তাদের গুণাবলি ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছে ...। আমাদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল- নিষ্ঠুর নির্যাতনের রাজত্ব থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের সাহসী জনতা ও মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আমাদের নিজস্ব ভূমিতে আগ্রাসন প্রতিহত করা। ভারতের সেনাবাহিনী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করবেন না।

আমরা বিশ্বাস করি নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের মধ্যে সঠিক স্থান পাবেন এবং বাংলাদেশকে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করবেন।"

ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনা অফিসার মেজর জেনারেল লাছমান সিং তার গ্রন্থ Victory in Bangladesh রচনাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এক পত্রে ৭টি প্রশ্ন করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৭ জুন উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেন। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তরের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হলো।

প্রিয় জেনারেল সিং, আমি আপনার ২৭ মে তারিখের পত্র পেয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার (ইন্দিরা গান্ধী) রাজনৈতিক এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর : উদ্দেশ্য ছিল দশ মিলিয়ন উদ্বাস্তু নিরাপদে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো এবং আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমার মূল্যায়ন হলো- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা এতো জাগ্রত হয়েছে যে, তারা মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু আত্মসমর্পণ করবে না এবং এ চেতনার ফলে তারা অবশ্য স্বাধীনতা অর্জন করবে। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ফলে আরও বেশি রক্তপাত হতো এবং দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হতো।

সারা ভারতের জনগণ বিশেষ করে বাংলার জনগণ পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ ছাড়া পূর্ব সীমান্ত অথবা পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমি যুদ্ধ পরিহার করতে চেয়েছিলাম এবং উদ্দেশ্য মনে রেখে আমি ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করে পশ্চিমের দেশগুলোর সরকারকে আমাদের দ্বারপ্রান্তে, আমাদের সীমান্তের ভিতরে উপস্থিত এবং বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি বুঝাবার এবং বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা করেছি। পাকিস্তান আমাদের বিমানবন্দরগুলো আক্রমণ করে আমার শেষ চেষ্টাকে কেড়ে নেয়।

প্রশ্ন : আমেরিকা, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : আমরা চীন ও পরোক্ষভাবে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বাতিল করতে পারি না। সোভিয়েত রাশিয়া আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আমি মনে করি না যে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে পারত।

প্রশ্ন : আমাদের রাজনৈতিক কৌশল অথবা যুদ্ধ পরিচালনার ওপর ইন্দো সোভিয়েত চুক্তির প্রভাব কি ছিল?

উত্তর : আমাদের কৌশল অথবা যুদ্ধ পরিচালনার ওপর এর কোনো প্রভাব ছিল না। কিন্তু এ চুক্তি আমাদের নৈতিক মনোবল অটুট রেখেছে এবং নৈতিক সমর্থনের উৎস ছিল। এটা অবশ্য সান্ত্বনা ছিল যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ছিল না।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ ও পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর চাপ কি পরিমান ছিল এবং সে সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর : চাপের পরিমাপ করা কঠিন। তবে বেশ চাপ ছিল। অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ যারা গণতন্ত্রের জন্য চীৎকার করছিল। তারা পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের গণতান্ত্রিক মতামতের প্রতি অথবা পাকিস্তানের নির্বাচন এবং নির্দোষ জনগণকে হত্যার ব্যাপারে সামান্য শ্রদ্ধা বা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মি. নিক্সন আমেরিকার কোনো কিছু গোপন না করে তারা ভারতকে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে বলেছিল, তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও। জাতিসংঘের অধিকাংশই আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের বিব্রত করার জন্য তারা সবকিছু করেছে। আমি এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং-এর সেখানে তার খুব খারাপ সময় ছিল।

প্রশ্ন : বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রবেশ সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন কি ছিল?

উত্তর : সপ্তম নৌবহর পাঠানো ছিল আমাদের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। সত্য কথা বলতে কি আমি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করি না যে আমেরিকা আর বেশি কিছু করতে পারবে না।

প্রশ্ন : উপমহাদেশে ভবিষ্যতে শান্তি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় সিমলা চুক্তির প্রভাব কি ছিল?

উত্তর : সিমলা সম্মেলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ, যার ফলে ৩০ বছরের বরফ গলে গেল। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক ঘৃণা, তিক্ততা এবং সংঘর্ষের মধ্যে বরফ জমে ছিল।

ভারতের ঐতিহ্য হলো বন্ধুত্ব ও শান্তি। কিন্তু তা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে নয়। তার পর যাত্রাপথ ছিল কঠোর। কিন্তু কূটনৈতিক ও অন্যান্য দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কি করে ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রশ্ন : দু'বছরের বেশি যুদ্ধবন্দীদের আটকে রাখার কি ভূমিকা ও রাজনৈতিক লাভ ছিল?

উত্তর : মাটি অথবা মানুষের মধ্যে পছন্দ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমি দখল করে রাখলে আমেরিকা এবং অন্যান্যদের যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে তাদের হৈ চৈ করতে আরও উৎসাহিত করবে। পাকিস্তানের বিরাট ভূখণ্ড দখল করে রাখলে আমাদের অভিযুক্ত করা হবে। যেমন ছিল তেমন রেখে দিয়ে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছি। দর কষাকষি ছাড়া যুদ্ধবন্দীকে আটকে রাখার কোনো উপকারিতা নেই।

স্বা : ইন্দিরা গান্ধী

আপনার ঘনিষ্ঠ মেজর লছমান সিং
নতুন দিল্লী

মেদিনীপুরের সুভাষ কিরীটেশ ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ভদ্রলোক মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনার জন্যে মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের বালিচর এলাকায় "ডেবরা থানা বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক কমিটির" সেক্রেটারি। সভা শেষে তিনি মুহাম্মদ নুরুল কাদিরকে জানালেন– যদি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তাঁর সঙ্গে মেদিনীপুর যেয়ে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে এক জনসভায় বক্তব্য পেশ করে, তাহলে সভাশেষে চাঁদা তুলে তা মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে দেওয়া হবে। মুহাম্মদ নুরুল কাদির কিরীটেশ ভট্টাচার্য্যকে ৫৪ নং প্রিন্সেস স্ট্রিটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অফিসের সচিব অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁকে জানায়— চেক অথবা ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর গ্রহণ করছেন।

মেদিনীপুর জেলার "ডেবরা থানা বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক কমিটি"-এর উদ্যোগে বালিচর প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গনে ১৫ জুন, ১৯৭১ তারিখে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জনসভায় প্রথম কিস্তি ১,৪০০/- রুপির একটি ব্যাংক ড্রাফট অর্পণ করেন। উক্ত জনসভায় "নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন" মেদিনীপুর শাখার ছাত্র-ছাত্রীগণ জনৈক যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধার ছবি সম্বলিত বেশকিছু পোস্টকার্ড ছাপিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ফান্ড তুলতে আরম্ভ করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অধ্যাপক লরেন্স জারিং বলেন–

তিনি লিখেছেন,– "Bangladesh is a country challenged by contradictions. Born in the fire of civil war, it opted for a secular national state that permitted its population to fully express a significantly ethnic and cultural homogeneity. Federation with Pakistan proved untenable, and pull of Islamic brotherhood yielded to the push of utilitarian nationality. Religion could not sustain the Pakistan Union."

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যাকে বৈপরীত্যের মোকাবেলা করতে হয়। গৃহযুদ্ধের আগুনে সৃষ্ট দেশ অসাম্প্রদায়িকতা গ্রহণ করে এবং নৃতাত্ত্বিক ও সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশে জনগণকে যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পাকিস্তানের সাথে ফেডারেশন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কল্যাণমুখী জাতীয়তার নিকট ইসলামী ভ্রাতৃত্ব নতিস্বীকার করে। ধর্ম পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

একটি দেশের ট্র্যাজেডি

ইসলামিক সাময়িকী কিবলেত-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন। ইন্দোনেশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত আবু হানিফা লিখেছেন–

পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করেছে কর্তৃত্বের জন্য নেতাদের উচ্চাশা সাধারণ মানুষকে প্রায়ই অবর্ণনীয় দুর্যোগের মধ্যে ফেলে থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তানী বা পূর্ব পাকিস্তানীদের কেউ-ই তাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে এতোটুকুও সন্তুষ্ট নয়।

রাজনীতি সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অজ্ঞতা, পশ্চিম পাকিস্তানের আলী ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্র এবং পাঞ্জাবি জেনারেলদের নির্যাতন ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রক্তাক্ত ভূখণ্ডে পরিণত করেছে।

যদিও সে দেশের সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলা হয়েছে, কিন্তু নিজ দেশের মানুষের প্রতি তাদের যে আচরণ ও মনোভাব তাতে লেশমাত্র ইসলামের ছোঁয়া নেই। ফলে এই নেতারা আমাদের এমন একটা ধারণা দেন, যেন ইসলাম তাঁদের কাছে কেবল একটি অলঙ্কারমাত্র।

যদিও ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে, কিন্তু যে ভৌত ও মানসিক ধ্বংসযজ্ঞ এ অঞ্চলে ঘটে গেল, আগামী ১০ বছরের প্রচেষ্টায়ও তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না, আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট তো বাড়বেই।

কয়েকটি বড় দেশ যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে লাখ লাখ দেশত্যাগী দুর্গত মানুষকে সাহায্য করতে– এ প্রচেষ্টার গুণগান করতেই হয়।

সাহায্যের একান্ত চেষ্টার পরও একা ভারতের পক্ষে ভীতসন্ত্রস্ত ও বিপন্ন যারা নিজ দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে, তাদের সবার বোঝা বহন করা সম্ভব নয়।

ভারত বাংলাদেশের জন্য সহানুভূতিপ্রবণ এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চায়– কারণ তারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর মতো একই ধরনের মানুষ।

পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসা বাস্তুত্যাগীদের সমস্যাটি আসলে অন্তর্জাতিক প্যালেস্টাইন শরণার্থীদের মতো একই সমস্যা। সে জন্য জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন স্থাপন করেছে। জাতিসংঘ জরুরি শরণার্থী তহবিল খুলেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সমস্যাটি জাতিসংঘের হাতে তুলে দেওয়াই যুক্তিসংগত।

আরব অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোর নীরবতা দুঃখজনক– কারণ, দেখা যাচ্ছে ভুক্তভোগীরা এমনকি মুসলমান হলেও তাদের কাছে মানবকল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়াকে এখনই আরও ধনাত্মক সাড়া দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। মানবিক সমস্যায় সহানুভূতি প্রকাশ আমাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। তারচেয়ে বড় কথা আমাদের 'পঞ্চশীলা' নীতিতে মানবকল্যাণকামীতার বিশেষ স্থান রয়েছে, যা ইসলামের প্রথমসূত্র 'আল্লাহকে বিশ্বাস' থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

যখন প্যালেস্টাইনি শরণার্থীদের বিষয়টি উচ্চস্বরে আলোচনা হয়, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান নেতারাও সাহায্য প্রদানের জন্য চিৎকার করতে থাকেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বিপন্ন মুসলিম শরণার্থীর সংখ্যা প্যালেস্টাইনিদের তিনগুণ, তখন আমাদের মুসলিম নেতারা একজন অন্যজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলেন– সমস্যাটা ওখানে কী যেন? তাঁদের কাছেও মানুষের সমস্যার চেয়ে রাজনীতির সমস্যাটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধে আমরা হারব না— ইয়াহিয়া খান

১৯৭১ সালে নিউজউইক-এর সিনিয়র এডিটর Arraud de Borchgrave প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকারটি তাৎক্ষণিকভাবে ১ নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনসহ অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খোলামেলা বেশকিছু কথা তিনি বলেছেন।

প্রশ্ন : আপনি এবং ভারত যুদ্ধের কতটা কাছাকাছি?

উত্তর : আমার বলার কোনো কারণ নেই যে যুদ্ধ আসন্ন নয়। ভারতীয়রা যুদ্ধ শুরু করেই দিয়েছে। মুখোমুখি সংঘর্ষ না হওয়ার কারণ আমরা প্রত্যাঘাত করছি না। আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন যুদ্ধটা ছড়িয়ে না দেন। ভারত প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় ১৫০ থেকে ৩০০০টি আর্টিলারি ও মর্টার শেল পূর্ব পাকিস্তানে নিক্ষেপ করছে। এ সপ্তাহের প্রথমে এক দিনেই ২৫ পাউন্ড ফিল্ড গান এবং তিন ইঞ্চি মর্টার থেকে ৫০০০ গোলা নিক্ষেপ করেছে।

প্রশ্ন ভারত ৬,০০,০০০ মজুদ সেনা মোতায়েন করেছে। আপনিও কি তাই করেছেন?

উত্তর সৈন্যদের সতর্ক করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক অফিসারকে তলব করা হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার সেনারা কি যুদ্ধের জন্য মোতায়েন হয়েছে?

উত্তর : আমাদের সেনারা ক্যান্টনমেন্ট ও ব্যারাক থেকে বের হয়েছে, সামনে এগিয়ে গেছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য পজিশন নেয়নি।

প্রশ্ন : কেন নেয়নি?

উত্তর : কারণ আমি চাই না যুদ্ধ লাগুক।

প্রশ্ন : সুবিধাজনক আশ্রয়ে ভারতীয় সেনাদের অনুপ্রবেশের প্রতিশোধ না নিয়ে কত দিন সহ্য করবেন?

উত্তর : কিছু না করার কারণে আমার লোকজন নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে।

প্রশ্ন   যদি যুদ্ধ লেগেই যায়, আপনি কি মনে করেন জিততে পারবেন? নাকি অধিকাংশ বিদেশি পর্যবেক্ষক যেমন বলছে এতে একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য?

উত্তর : আমি অবশ্যই হারব না। আমার লোকজন যুদ্ধ করে জিতবে। কিন্তু পাঁচগুণ বড় যে সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করা এবং জেতা? তাদের যুদ্ধে ডেকে আনা আমার জন্য সামরিক উন্মত্ততা। কিন্তু আমাদের আক্রমণ করা হলে আমরা প্রত্যাঘাত করব।

প্রশ্ন   ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়ে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল– আপনার সশস্ত্র বাহিনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কত দিন যুদ্ধ করতে পারবে?

উত্তর : সেটাই আমাদের বড় সমস্যা। ভারতের জন্য এতোটা নয়। তাদের যুদ্ধযন্ত্র অনেক বড় এবং অনেক বিষয়ে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। যুদ্ধটা আমাদের শুরু করা তাই এক ধরনের পাগলামিরই সাক্ষ্য দেবে। তারা যদি দৈনিক ৩০০০ শেল নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তাদের হাতে অনেক গোলাবারুদ। এটা বিলাসিতা, আমাদের সেনাবাহিনীর সে সামর্থ্য নেই।

প্রশ্ন : যদি যুদ্ধ হয়, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে সাপ্লাই লাইন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বন্দর ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে ঘেরাও, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে কতটা সময় ধরে রাখতে পারবেন?

উত্তর : এটা সত্যি, কাজটা খুব সহজ নয়। সৌভাগ্যবশত পূর্ব পাকিস্তানের ভূপ্রকৃতি প্রতিরক্ষাকারী শক্তির জন্য সহায়ক। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এটা ওয়াকওভার হবে না। বড় যুদ্ধের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমাদের শক্তি এখানে, পশ্চিমে।

প্রশ্ন : যদি যুদ্ধ লেগে যায়– সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কতটুকু?

উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি তার নিশ্চয়ই একটা মানে আছে। ভারতের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সম্ভবত তারা তা ব্যবহার করবে। আর চীনাদের ব্যাপারে পাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীন তা সহ্য করবে না। সরাসরি হস্তক্ষেপ না হলেও আমরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাব। আর যদি রাশিয়ান ও চীনারা এসে যায়, তাহলে আমরা একটা বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়ে যাব, তখন কী হবে তা কল্পনাও করা যায় না।

প্রশ্ন : যুদ্ধ বেঁধে গেলে চীনের সামরিক সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি কি আপনি নিশ্চিত?

উত্তর : অবশ্যই নিশ্চিত।

প্রশ্ন : কোনো কোনো প্রথিতযশা ভারতীয় মনে করেন পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা সম্ভব এবং এক পক্ষকালের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব। ভারত যদি তাই করতে চায় এবং ভারত সফলও হয় আপনি আর কী করতে পারবেন?

উত্তর : ব্যাপারটা একটা ভিন্ন দেশের। বলপূর্বক তাদের নয় এমন একটা দেশ দখল করা। পৃথিবী সেটা গ্রহণ করতে পারে না। আমি সত্যটা জানি, পূর্ব পাকিস্তানীরাও তা গ্রহণ করবে না।   ভুলবেন না পূর্ব পাকিস্তানই একসময় একক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা তখন হিন্দুদের আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছিল। বাঙালিরা কারও কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা বুঝে পায়নি। আমরাও অনেক ভুল করেছি– তাদের উন্নয়নের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে আমরা চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : এখনো প্রতিদিন ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে– এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : না, তারা যাচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যেভাবে ভারতীয়রা গোলা নিক্ষেপ করছে, সীমান্তবর্তী মানুষদের এমনিতেই প্রাণের ভয়ে ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে। সীমান্ত চীনের প্রাচীরের মতো নয়। সীমান্তে চিহ্ন নেই– ভারতীয়রা বিদেশিদের ধরে নিয়ে যায়, দেখায় এটাই সীমান্ত– সেটা হয়তো ভারতের ১৫ মাইল ভেতর ভূখণ্ডে। সেজন্যই আমি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের কথা বলি, দুই পাশ থেকে তারাই দেখুক কি ঘটছে। কিন্তু ভারত এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে না, কারণ ভারত জানে ভারত কি করছে।

প্রশ্ন : মাত্র কয়েক মাসে নব্বই লাখ মানুষ কীভাবে নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়?

উত্তর : সংখ্যাটা আমি মানতে নারাজ। ২০ থেকে ৩০ লাখ হতে পারে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দিয়ে গুণলে ৪০ লাখও পাওয়া যেতে পারে। সংখ্যা যাই হোক, মার্চের পর যেকোনো পাকিস্তানী ভারতে গিয়ে থাকলে আমি তাকে ফিরিয়ে নেব। এটা একমাত্র জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (১৯৪৭-এর) গণ-অভিবাসনের সময় যারা ভারতে গিয়েছে তাদের অনেককে এখনো পুনর্বাসিত করা হয়নি। কলকাতার দিকে তাকিয়ে দেখুন এখনো ১০ লাখ লোক রাতের বেলা রাস্তায় ঘুমায়।

প্রশ্ন : আপনি যদি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে দেন এবং তিনি যদি স্বায়ত্তশাসনের বেশি দাবি করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং আপনি সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেন তাহলে কী হবে?

উত্তর : অনেকেই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি মনে করি তিনি ফিরে গেলে তাঁর নিজের লোকজনই তাঁকে হত্যা করবে। ভোগান্তির জন্য তাঁকে দায়ী করবেন। যাকগে এটা একটা একাডেমিক প্রশ্ন। তিনি দুই বছর অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন কিন্তু ফিরে গেছেন নিজের বক্তব্যে। তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন ...। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেনাবাহিনীর আনুগত্য বিনষ্টের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। দেশের সবচেয়ে ভালো এবং শ্রদ্ধেয় আইনজীবী কে ব্রোহি তাঁর পক্ষে মামলা নিয়েছেন। সামরিক আদালতে যাচ্ছে– তাই হতে পারে মনে করলে তিনি মামলা নিতেন না। অনেক সরকারই যেমন করে থাকে, আগে গুলি করে হত্যা, তারপর বিচার, আমি তা করিনি। সাজা হওয়ার পর কী হবে সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার। আমি খেয়ালের বসে তাকে মুক্তি দিতে পারি না– এটা অনেক বড় দায়দায়িত্বের ব্যাপার। কিন্তু জাতি যদি তার মুক্তি চায়, মুক্তি দেব।

মুজিবকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে— ইন্দরাগান্ধী

সানডে টাইমস-এ ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত নিকোলাস ক্যারোল-ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনা

ক্যারল : বাংলাদেশ প্রশ্নে আপনার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। আপনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ভারতের রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধির কোনো অভিলাষ নেই। তাহলে কবে নাগাদ শেষ ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের কাজটি সম্পন্ন হবে?

মিসেস গান্ধী : এ পর্যায়ে বলা কষ্টকর। বিষয়টি প্রধানত বাংলাদেশ সরকারের ওপর নির্ভর করে। আমরা আশা করি তা শিগগিরই ঘটবে।

ক্যারল : কত সপ্তাহ বা মাস এমন কিছু কি ভাবছেন?

মিসেস গান্ধী : এখনো বিষয়গুলো এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে বলে আমি এ অবস্থায় কিছু বলতে পারছি না। সেখানকার জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে। অবাঙালিদের প্রতি এবং অন্যান্য বিষয়েও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমি মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনী এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে।

ক্যারল : আপনি কি আবারও সুনির্দিষ্টভাবে বলবেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো এলাকা ভারতের অধিকারে রাখার ইচ্ছে আপনার নেই?

মিসেস গান্ধী : আমি মনে করি আমি সুনির্দিষ্টভাবেই জনসভায় এবং সংসদে বলেছি যে আমাদের সীমানা সম্প্রসারণের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

ক্যারল পাকিস্তানের অধিকারে যে এলাকা রয়েছে যা আপনার মতে ন্যায্যত ভারতের; সে ক্ষেত্রেও কি এমনই কথা প্রযোজ্য?

মিসেস গান্ধী : আমি বলেছি যে আমরা বল প্রয়োগ করে তা উদ্ধার করব না। কিন্তু আপনি জানেন, আমরা কেবল বিশ্বাসই করি না, এটা প্রমাণিতও হয়েছে যে যুদ্ধ রহিতকরণ রেখা বরং খামখেয়ালির মাধ্যমে নির্ধারিত এবং তা শান্তি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে না। তবে এটা নিয়ে সরকার নতুন করে বা নতুন কিছু ভাবছে না।

ক্যারল : বাংলাদেশের জন্য তার নেতা শেখ মুজিবুরের বিশেষ প্রয়োজন। তার মুক্তি নিশ্চিত করতে ভারত কী করছে? আপনি কোনো ধরনের চাপ দিচ্ছেন?

মিসেস গান্ধী : আমি মনে করি না আমরা অনেকটা চাপ দিতে পারব। আমাদের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে আমরা বিশ্ব সরকারগুলোর কাছে আপিল করেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে চিঠি লিখেছি। আমরা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি, তারা কিছুটা চাপ দেবে। আজ সকালেই দেখলাম আমেরিকান সরকার (পাকিস্তানের সাথে ভারতের) যুদ্ধ বিরতির কিছুটা কৃতিত্ব দাবি করে বসেছে; আশা করি তারা তাহলে এ ব্যাপারটাও দেখবে।

ক্যারল : কিন্তু আপনি তো তার জন্য জিম্মি হিসেবে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের আটকে রেখেছেন। এটা কি সমঝোতার দর কষাকষিতে একটা ভূমিকা রাখতে পারে?

মিসেস গান্ধী : এ নিয়ে আমি তেমন কিছু বলতে পারব না, কারণ আমি জানি না কীভাবে সে আলোচনা হবে বা কী ঘটবে।

ক্যারল : ভারত শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে বলে মনে করেন?

মিসেস গান্ধী : পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে ঐ নিয়ে আমার কখনোই কোনো সন্দেহ ছিল না। আমি মনে করি, দুর্ভাগ্যজনক দিকটি হচ্ছে, মাঝেমধ্যে এমন সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে যারা এই সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে আমাদের প্রতি একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ অনুভূতি রয়েছে। যখনই আমাদের কেউ যেকোনো উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছে যেমন শিখদের, অতীতে আমাদের ক্রীড়া দলকে তারা উষ্ণ স্বাগতম জানিয়েছে।

ভারতেও দেখবেন পাকিস্তানের ব্যাপারে কোনো কথা নেই; এটা ঠিক তাদের খবরের কাগজে ঘৃণা প্রচারণা অব্যাহত আছে। এমনকি শিক্ষা কর্মসূচিতে। ...... ভারতে কী ঘটছে, উন্নয়ন কীভাবে হচ্ছে সে দৃষ্টিতে যদি তারা তাকায়, আমরা যদি সহযোগিতা করি তাহলে দুই দেশই আরও শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হয়ে আমাদের কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করতে পারব।

ক্যারল : আপনাকে যুক্তিসংগত আশাবাদী শোনাচ্ছে।

মিসেস গান্ধী : আমি মনে করি আমি একজন আশাবাদী মানুষ।

ক্যারল : বাংলাদেশ ও শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের অবস্থান বুঝতে না পারায় আপনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তিরস্কার করেছেন, ফলে আপনার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। যদি ধরে নেই আপনার প্রত্যাশা যত দ্রুত সম্ভব এ সম্পর্কের উন্নয়ন, তাহলে আপনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদক্ষেপ গ্রহণ দেখতে চান?

মিসেস গান্ধী   হ্যাঁ, এটি আপনিই উল্লেখ করেছেন। শেখ মুজিবের মুক্তি তাদের বাংলাদেশ পরিস্থিতির বাস্তবতায় স্বীকার করতে হবে। তাদের পাকিস্তান পরিস্থিতির বাস্তবতাও মানতে হবে। একটা দূরের দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে পারে না, হস্তক্ষেপও করতে পারে না। আপনার পছন্দের বিশেষ সরকারকে আপনি সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সরকার সে দেশের জনগণের জন্য সঠিক কিনা? যদি তা না হয়, তাহলে এটি কখনো শক্তিশালী সরকার হতে পারে না– এর পেছনে যত সেনাবাহিনীই থাকুক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। এটা আমাদের বিষয় নয়, তাদের। এটা পাকিস্তানের ব্যাপার।

ক্যারল   বর্তমানে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের চমৎকার সম্পর্ক। এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথ বিষয়ক ব্রিটেন কি করতে পারে বলে আপনার ধারণা?

মিসেস গান্ধী : আমি আগেই বলেছি বাইরের শক্তি যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্রিটেন সম্প্রতি কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু আপনারা আগে করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতি অংশত সে কারণেই সৃষ্টি হয়েছে– কেবল আপনাদের নয়, অন্যদের হস্তক্ষেপও।

ক্যারল   আপনি কি মনে করেন আপনার এই উদ্বেগের বিষয়টি আমরা সবাই অবহিত?

মিসেস গান্ধী : হ্যাঁ, আমি মনে করি আপনারা জানেন।

ক্যারল : আমরা যদি বাংলাদেশকে আগে স্বীকৃত দিই, আপনি তা স্বাগত জানাতেন?

মিসেস গান্ধী : বাংলাদেশের জনগণ স্বাগত জানাবে।

ক্যারল : আপনি কি মনে করেন আমাদের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিকভাবে সংকট সমাধানে সহায়ক হবে?

মিসেস গান্ধী : আমি মনে করি তা হবে। এটা বাংলাদেশের জন্য ভালো, কারণ তারা বুঝবে তাদের বন্ধু আছে।

ক্যারল : গত সপ্তাহে মি. কুজনেতজভ যখন দিল্লিতে আসেন, তখন কি বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি দান নিয়ে আলোচনা করেছেন?

মিসেস গান্ধী না, আমরা এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলাপ করিনি। তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, আরও বহুসংখ্যক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

ক্যারল : অন্য সব দেশ পেছনে ফেলে কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ছুটে আসছে– এটাকে আপনি অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করেন না?

মিসেস গান্ধী : এটাকে বরং আমি এভাবে দেখতে চাই, যত বেশিসংখ্যক দেশ স্বীকৃতি দেবে, বাংলাদেশ তত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে, এখন বাংলাদেশকে যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে তখন তার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, স্বাধীনতা দরজাটা খুলে দেয়; কিন্তু আসল কাজ আসে তারপর।

পিণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর আলোচনা

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ও ৭ জানুয়ারি, ১৯৭২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিয়ানওয়ালী জেলে আটক থাকা অবস্থায় তাঁকে সংবাদপত্র ও রেডিও দেয়া হয়নি। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে তাও জানেন না। ২৬ ডিসেম্বর তাকে হেলিকপ্টারে রাওয়ালপিণ্ডিতে নিয়ে আসা হয় এবং একটি ঘরে সেনাবাহিনীর পাহারায় রাখে এবং সেখানে ভুট্টোর সাথে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর ও ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি আলোচনাটি ট্রান্সক্রিপ্ট করে রাখা হয়। উভয় নেতার কথোপকথন স্ট্যানলি উলপাট তার জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"One week after Zulfi took change in Pindi, he had himself driven after sun-down to a well-guarded army bunglow near the military airport. Mujib had been flown there the day before by helicopter from his prison cell, where he had seen no newspaper, heard no radio since his arrest in Dacca in late March. "When they brought me here, I was thinking that another disaster was coming. The tall, haggard prisoner said, finally smiling at the sight of his old friend, prisoner said, finally smiling at the sight of his old friend though as yet uncertain why all the armed guards were in that room as well. Then Zulfi told him of the transfer of power in Pindi. Mujib responded. "Believe me. I am happy. Tell me what is the condition of Bengali? I am perturbed."

Bhutto explained that Indian's army was occupying Dacca, had moved in with Soviet guns and trucks, undercover of Soviet warships and planes.

Mujib, "You would better get me to Dacca...."

Bhutto- Mujib Bhai (brother), if there is any possibility that we can live together?

Mujib- I will hold a public meeting in Dacca. I will meet my people, discuss with them and inform you ...

Zulfi played with his Bengali prisoner for another eleven days, leaving Mujib to simmer and sweat.

On the 27th you said we can have two or three things together," Zulfi reminded Mujib.

Mujib-Before that you have to allow me to go.

Zulfi offered, you should be our president.

Zulfi also offered fifty thousand dollars. But Mujib did not take any money from him, "suggesting instead that he contribute it for my chartered plane."

প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহ পরে পিণ্ডিতে নিজে গাড়ি চালিয়ে সূর্যোদয়ের পর সেনাবাহিনীর বিমান ঘাঁটির নিকট একটি বাংলোতে আসেন। শেখ মুজিবকে তার আগের দিন মিয়ানওয়ালী কারাগারের সেল থেকে বিমানে পিণ্ডিতে নিয়ে আসে এবং তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। মিয়ানওয়ালী জেলে তাঁকে কোনো পত্রিকা বা রেডিও দেয়া হয়নি। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। পিণ্ডিতে নিয়ে আসার পর শেখ মুজিব ভাবলেন, তারা আমাকে কেন এখানে এনেছে। আমি চিন্তা করলাম হয়ত আমার জন্য আবার বিপদ আসছে। লম্বা, শুকনো বন্দী তার বন্ধুকে পাশে দেখে কণ্ঠে হাসি দিয়ে একথা বলেন। তারপর ভুট্টো তাকে অবহিত করেন, পিণ্ডিতে ক্ষমতার রদবদল হয়েছে।

মুজিব উত্তর দিলেন, "আমি আনন্দিত, বিশ্বাস করুন আমি আনন্দিত। বলুন, বাংলাদেশের অবস্থা কি? আমি খুব চিন্তিত।"

ভুট্টো— ভারতের সেনাবাহিনী ঢাকা দখল করেছে, সোভিয়েত রাশিয়া নৌ, জাহাজ ও বিমানের সহায়তায় কামান ও ট্যাংক অভিযান চালিয়েছে।

মুজিব 'আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর।"

মুজিব আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন, আমি খুশি।

ভুট্টো– মুজিব ভাই, আমাদের একত্রে বাস করার কোনো সম্ভাবনা আছে?

মুজিব– আমি ঢাকায় জনসভা করব। আমি আমার লোকদের সাথে দেখা করবো, আলোচনা করে আপনাকে জানাব।

শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিয়ে তার সাথে আরও ১১ দিন টালবাহানা করে এবং তাকে গরমে দিন কাটাতে হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ২৭ তারিখ দু'তিনটি বিষয় একত্রে রাখার কথা বলেছিলেন। মুজিব বলেন, তার পূর্বে আমাকে যেতে দিন। জুলফিকার আলী প্রস্তাব করলেন, আপনাকে আমাদের

রাষ্ট্রপতি হতে হবে। জুলফিকার শেখ মুজিবকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়ার প্রস্তাব দেন। মুজিব টাকা গ্রহণ করেননি। তার পরিবর্তে প্রস্তাব দিলেন, এ থেকে আমার বিমান ভাড়া দিন।

নিক্সন, চৌ এন-লাই ও কিসিঞ্জারের মধ্যে কী কথা হয়েছিল?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, ড. হেনরি কিসিঞ্জার (জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা), জন হোল্ডারিজ ও উইন্সটন লর্ড (জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য), চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই, চিয়াও কুয়ান হুয়া (সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী), চাং ওয়েন চীন (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা), দোভাষী ও অন্যান্য। আলোচনা–

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, সময় ২.০০ থেকে ৬.০০

অতি গোপনীয় ভাবে আলোচনা হয়।

স্থান : রাষ্ট্রপতি অতিথি ভবন, পিকিং

নিক্সন : আমি প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ব্যাপারে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আমি জানি এ ব্যাপারে তার সরকারের একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদেরও। কালকে আমি জানিয়েছিলাম, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ স্বীকৃতি দিলেও এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বিলম্ব করছি।

চৌ : ফ্রান্সও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

নিক্সন : এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভুট্টোর মনোভাব জানতে চেষ্টা করেছি আমরা। ভুট্টো জানিয়েছে স্বীকৃতির ব্যাপারে তার আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে (স্বীকৃতির মাধ্যমে) মাঠ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছেড়ে না দেওয়ার যে সম্ভাবনা আছে সে কথা সে বেশ বোঝে। আমাদের জানা মতে, ২৪ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা। এরই ভিত্তিতে এখনো যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, আমরা স্বীকৃতি প্রশ্নটি বিবেচনা করব। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর (চৌয়ের) কী মনোভাব?

চৌ প্রথম প্রশ্নে আমরা তো বরাবরই বলেছি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি পালন করতে হবে। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আমাদের দুই দেশ এবং বিশ্বের মানুষ তাদের সমর্থন দিয়েছে।

নিক্সন : দশজনে একজন।

চৌ : সত্যি বলতে কী, অতীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতোটা সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। পরপর তিনবার ভেটো দেওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার ভেটো দিয়ে বিব্রত হতে চায়নি। ফলে তারা ভেটো দেওয়া থেকেই বিরত থাকে। একথা ঠিক, অনেক দেরি করে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তাহলেও এই প্রস্তাবের নৈতিক বাধ্যবাধকতা অবশ্যই রয়েছে। ভারত অবশ্য ততদিনে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিয়েছে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন থামিয়ে দেয়।

নিক্সন : আর সেটাই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

চৌ : এ কারণেই আমরা সত্যি সত্যি চাই তারা পূর্ব পাকিস্তান যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, সেখান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করুক। শুধু কথায় নয়, কাজে তা

আমরা দেখতে চাই। অবশ্য ওপর ওপরে লোক দেখানোভাবে সে কাজটি তারা করতে পারে, কারণ তারা যদি কিছু (ভারতীয়) বাঙালি সৈন্যকে রেখে দেয় মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগ দিতে তাহলে তা ধরার কোনো উপায় থাকবে না। তারা সবাই দেখতে একই রকম। কিন্তু তা করলে ভারত ও মিসেস গান্ধীর নিজের ভবিষ্যতের জন্যই বিপদ ঘটতে পারে।

আর পশ্চিমেও উভয়পক্ষকে যথাযথভাবে যুদ্ধবিরতি পালন করতে হবে এবং তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। তাদের দুজনকে সামনাসামনি আলোচনায় বসাতে হবে। ভারত বলছে, তাদের জমি দখলের কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা হলো এই যে, তারা জায়গা দখল করে বসে আছে, সরে যাচ্ছে না সেখান থেকে। আমরা ১৯৬২তে (চীনের বিরুদ্ধে) ভারতীয় আক্রমণের কথা স্মরণ করতে পারি। সে সময় আসামের তেজপুরে পাহাড়ের প্রান্তসীমায় আমাদের সৈন্যরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর চেয়ারম্যান মাও নির্দেশ দিলেন তাদের প্রত্যাবর্তনের। আমরা সব সরঞ্জামাদি ভারতীয়দের হাতে তুলে দিই। ম্যাক্সওয়েলের বইতে সে কথা বর্ণনা করা আছে। আমরা আমাদের সৈন্য উত্তরে তথাকথিত ম্যাকমোহন লাইন বরাবর সরিয়ে নিই। বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হলে অন্যের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অপেক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি।

(বাংলাদেশের ব্যাপারে) ভারত তো বলেছেই সে জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুসারে সমস্যার সমাধান করবে। তাই যদি হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে তাদের আগ্রহ নেই কেন? পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা না মিটিয়ে ফেললে সংকট আবারও দেখা দেবে, উপমহাদেশে যদি মাত্র একটি দেশও থাকে, তাহলেও সেখানে সমস্যা দেখা যাবে। কারণ সেখানে জাতিগত সমস্যা আপনাদের দেশের চেয়ে জটিল। আপনাদের ক্ষেত্রে অবশ্য জাতিগত সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে রাখা আছে। ভারত যদি আবারও উপমহাদেশ দখল করে নেয় তাহলে সমস্যা আরো বাড়বে। ভারত তার একক কর্তৃত্ব জাহির করতে পারবে না, এটিই আমাদের (রাজনৈতিক) দর্শন। তবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হলে বলতে হয়, তেমন কোনো চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রিটেনের হাতেই সেই বিভক্তি সম্পন্ন হয়।

নিক্সন : ১৯৪৯ সালে।

চৌ : ১৯৪৭।

নিক্সন : ১৯৪৭

চৌ এই অবস্থায় ভারতকে পশ্চিম পাকিস্তানে তার অধিকৃত এলাকাসমূহ ছেড়ে দিতে হবে এবং পাকিস্তানকেও ভারতের যেসব অনুল্লেখ্য জায়গা তারা দখল করেছে তা ছেড়ে দিতে হবে। ভুট্টো এ ব্যাপারে সম্মত আছে। এই দুটো ব্যাপার ভারতকে মেনে নিতেই হবে। এ সমস্যা মিটে যাওয়ার পর যদি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে জাতিসংঘে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে অবশ্য আপনিই ভালো বলতে পারবেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে (সকল ভারতীয়) সৈন্য প্রত্যাহার আপনারাও চান। আমার মনে হয় আপনি ভুট্টোকে (এ ব্যাপারে) সাহায্য

ও সমর্থন দেখাতে পারেন। ওদের এই সাহায্য এখন প্রয়োজন। আপনি বলেছেন আপনাদের পদক্ষেপ আমাদের পদক্ষেপের সমান্তরাল হোক। তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সে কথা আমরা দুজনেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বর্তমান প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি। আমাদের দুই দেশেরই ইয়াহিয়ার প্রতি ঋণ রয়েছে। নিজ দেশ পরিচালনায় যোগ্যতার পরিচয় তিনি দিতে পারেননি, একথা ঠিক। কিন্তু আমাদের দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে তিনি (গুরুত্বপূর্ণ) ভূমিকা পালন করেছেন।

নিক্সন : হ্যাঁ, তিনি সেতুর কাজ করছেন।

চৌ আমরা ভুলতে পারি না যে, ড. কিসিঞ্জার তার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একজন লোক যখন পৃথিবীর জন্য কোনো ভূমিকা রাখে আমাদের উচিত তাকে সে জন্য মনে রাখা।

কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট (নিক্সন) ইতিমধ্যেই ভুট্টোকে এক বার্তায় ইয়াহিয়ার প্রতি ভালো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন, বলেছেন কোনো প্রতিশোধের চেষ্টা হলে আমরা ভালো চোখে দেখব না। এটি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত বার্তা ছিল।

চৌ : ভুট্টো আমাদেরও বলেছেন তিনি ইয়াহিয়ার জন্য সুবন্দোবস্ত করছেন। তিনি তা না করলে অন্য জেনারেলরা তার প্রতি ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারে।

আমরা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। তবু বলছি, ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে তার সৈন্যদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। আমরা তাকে অস্ত্র দিয়েছি একথা ঠিক, কিন্তু সোভিয়েতদের মতো কোনো সামরিক উপদেষ্টা পাঠাইনি, একজনও নয়। আমরা কেবল কিছু লোক পাঠিয়েছিলাম বিমান ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে, পরে এরা সব ফিরে আসে। যুদ্ধবিরতির সময় পূর্ব পাকিস্তানে তাদের তখনো ৮০ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল। এমন কোনো অবস্থা হয়নি যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত না। আমরা জানি পাকিস্তানীরা ভালো যোদ্ধা, সৈনিকরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেও ছিল। সমস্যা ছিল কমান্ডারদের নিয়ে, ওরা ছিল মহা অযোগ্য। সৈন্যদের এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ফেলেছিল। (মার্কিন সেনাপতি) জেনারেল প্যাটন, যাকে আপনারা খুব শ্রদ্ধা করেন, তিনি এ কাজ কখনোই করতেন না। ইয়াহিয়ার উচিত ছিল বিজয়ের জন্য তার সৈন্যদের এক জায়গায় সংঘবদ্ধ করা। একবার একটি বিজয় অর্জিত হলে ভারতীয়রা আর অগ্রসর হতো না। কারণ পশ্চিম বাংলা তখন খুব সুরক্ষিত ছিল না। গোড়ায় ভারতের ছিল আট ডিভিশন সৈন্য কিন্তু সেগুলোও ছড়ানো-ছিটানো ছিল। পশ্চিম বাংলার পশ্চিমে তাদের ছিল তিন ডিভিশন, উত্তর-পশ্চিমে দুই ডিভিশন, আর পূর্বে দুই ডিভিশন ছিল। ম্যাক-মোহন লাইন বরাবর তাদের দুই ডিভিশন সৈন্য ছিল। কিন্তু তাদের সেখান থেকে সরানো হয়নি। ম্যাকমোহন লাইন থেকে মাত্র এক ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানে সরিয়ে নেওয়া হয়। সিকিমেও তাদের তিন ডিভিশন সৈন্য ছিল, সেখান থেকে এক ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়, বাকি দুই ডিভিশন রাখা হয় আমাদের সীমান্তে। সে সময় পাকিস্তান যদি ৪০ হাজারের মতো সৈন্য এক স্থানে জড়ো করে যুদ্ধে নামত এবং কোনো একটি ভারতীয় ডিভিশনকেও পরাজিত করতে পারত, তাহলে ভারতীয়দের মনোবল ভেঙ্গে পড়ত। তখন পর্যন্ত আমাদের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে আসছিলেন, পাকিস্তানের পক্ষে বিজয় অর্জন

সম্ভব। ভুট্টোরও সে বিশ্বাস ছিল। তারা দুজনেই জ্ঞানী লোক কিন্তু তারা সৈনিক নন। আমরা সে কথায় বিশ্বাস করিনি। আমরা বলেছি, তারা যুদ্ধ করলে উল্টো সব কিছুই খোয়াবে। (ড. কিসিঞ্জারের দিকে তাকিয়ে) কথাটা এখানে বলা যাবে?

কিসিঞ্জার : অবশ্যই।

চৌ : আপনার সঙ্গে হোয়াংহো'র সাক্ষাৎ হয় ১০ ডিসেম্বর?

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, ১০ তারিখে।

চৌ : ডিসেম্বরের প্রথম ১০ দিন ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কিন্তু এরপর তারা ২০ দিন নষ্ট করে। অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর। কিন্তু তখনো তাদের হাতে অনেক সময় ছিল। হতে পারে যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভালো মানুষ ছিলেন, হয়তো তার শুভ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু একটা সৈন্য বাহিনীকে কীভাবে চালাতে হয় তা তিনি জানতেন না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি সে কারণে দেশের তরুণ অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। কিন্তু তার সম্বন্ধে ভালো কথা বলার মতো যুক্তিও আছে। আমি এই যুক্তির সঙ্গে একমত।

নিক্সন : আপনার সঙ্গে আলাপচারিতায় ড. কিসিঞ্জার যেমন বললেন, কাজে দিয়েছে এমন কোনো সেতু গুড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়।

চৌ : চীনা ভাষায় আমরা বলি, সেতু পেরুবার পর তা ভেঙ্গে ফেলা ঠিক নয়।

নিক্সন : বাংলাদেশের প্রশ্নে, আপনি যা বললেন তার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বীকৃতি কবে হবে ড. কিসিঞ্জার তা আপনাদের আগে ভাগে জানিয়ে দেবেন। ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতেই আমাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কী সিদ্ধান্ত নিই তা আপনাদের আমরা জানাব। আমরা সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ভারতের ওপর চাপ দিচ্ছি। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বাড়তি সুবিধাও রয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যার ব্যাপারে আমাদের মত হচ্ছে তাদের সাহায্য করা দরকার। আপনার মতো আমরাও মনে করি উপমহাদেশের এই অঞ্চলে কোনো একটি দেশকে এককভাবে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়। তবে পাকিস্তানে সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। কংগ্রেস ও আমাদের দেশের জনমত পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিরোধী। কথা প্রসঙ্গে বলছি, আমার এখন মনে হয়, যদি পাকিস্তানকে আমরা আরো সামরিক সাহায্য প্রদান করতে পারতাম, তাহলে হয়তো যুদ্ধ ঠেকানো যেত। কারণ ভারত তাহলে (যুদ্ধ বাধাতে) আগ্রহী হতো না। এ যুদ্ধ সস্তায় জেতা যাবে বলেই তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সে সব নিয়ে কালক্ষেপণ এখন অর্থহীন।

চৌ : এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের নীতিতে অনেক ভুল ছিল। যেহেতু এটি ছিল তাদের নিজস্ব ব্যাপার আমরা সে ব্যাপারে তাই বড়জোর পরামর্শ দিতে পারতাম।

কিসিঞ্জার (একটি তারবার্তা থেকে পড়ে) মি. প্রেসিডেন্ট আপনি সামরিক সরবরাহের কথা বলছিলেন। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, নভেম্বর ১৯৭১ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোলান্ড থেকে ১৫০টি ট্যাঙ্ক ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ১০০টি সাঁজোয়া গাড়ি (ভারত) পাঠিয়েছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দু'দফায় এই সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারিতে তৃতীয় দফা সরবরাহ ভারতে পাঠানোর কথা।

নিক্সন : ভারতে?

কিসিঞ্জার : ভারতে।

নিক্সন : এখন যা করা দরকার তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম ও সাহায্য পাঠানোর একটা পথ বের করা। আমাদের তরফ থেকে যা করব তা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা। এর ফলে পাকিস্তান আমাদের বিবেচনায় তার সামরিক আত্মরক্ষার স্বার্থে অন্যান্য দেশ থেকেও অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারবে। ভারতে আমাদের নীতির ট্র্যাজেডিটা হলো এই যে, গত ২০ বছর আমরা ভারতকে ১০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য পাঠিয়েছি। এর মধ্যে সামরিক সাহায্য খুবই সামান্য। অধিকাংশই অর্থনৈতিক। আর এর ফলে ভারতের ওপর (অর্থনৈতিক) চাপ কমে যাওয়ায় তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিস্তর অস্ত্র কিনতে পারে, নিজেরাও অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম হয়। এরকম হোক তা আমরা চাইনি, কিন্তু হয়েছে ঠিক তাই।

ভারতের প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রশ্নে আমরা এখন থেকে খুব সাবধানতার সঙ্গে এগুবো। পত্রপত্রিকা ও জনমতের চাপ রয়েছে ভারতকে আগের পর্যায়ে সাহায্য পাঠানো হোক, কিন্তু আমি তা অগ্রাহ্য করছি (চৌ হেসে ওঠেন এই পর্যায়ে)। আমরা আগে দেখবো সীমান্ত প্রশ্নে ভারত কী করে।

চৌ : ভারত আসলে একটা তলাবিহীন গর্ত (নিক্সন সে কথায় হেসে ওঠেন)।

নিক্সন : ভারত ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, ভারতের স্বল্প সময়ের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, পশ্চিম বাংলাকে গিলতেই তো তার বিস্তর ঝামেলা গেছে। এখন যদি সে পূর্ব বাংলাকে গিলতে চায় তাহলে বড় ধরনের অজীর্ণ হতে বাধ্য।

চৌ : তা হতে বাধ্য। সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো (নেহেরু) কন্যা তার পিতার দর্শন-যা ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তা অনুসরণের চেষ্টা করছেন (গ্রন্থের নাম চৌ ইংরেজিত বলেন) বইটি পড়েছেন?

কিসিঞ্জার : তিনি এক মহান ভারতীয় সাম্রাজ্যের কথাই ভাবছিলেন, তাই না?

চৌ : হ্যাঁ, তিনি এক বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের কথাই ভাবছিলেন ... মালয়, সিলোন ইত্যাদি। সম্ভবত আমাদের তিব্বতও তার অন্তর্গত। সে গ্রন্থ রচনার সময় (নেহেরু) ইংরেজের বন্দিশালায় ছিলেন, তবে তা ছিল দার্জিলিংয়ে ভদ্রলোকদের জন্য সংরক্ষিত একটি কারা কক্ষ। নেহেরু আমাকে নিজে বলেছেন, সে কারাগার ছিল সিকিমে, হিমালয় পর্বতের মুখোমুখি। সে সময় বইটি আমার পড়া হয়ে ওঠেনি, কিন্তু আমার সহকর্মী চেনই তা পড়েছিলেন। তিনিই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থে এই ভারতীয় চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে বলে তিনি জানান। পরে বইটি পড়তে গিয়ে আমারও একই মনোভাব হয়েছিল।

নিক্সন : চেন-ই মারা গেলেন কবে?

চৌ : অতি সম্প্রতি, চেয়ারম্যান মাও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তার পাকস্থলীর ক্যান্সার হয়েছিল। ক্যান্সার নিরাময়ের কোনো প্রক্রিয়া কি আপনাদের দেশে পাওয়া গেছে?

নিক্সন : এটি একটি বড় সমস্যা। এবছর আমরা ক্যান্সার নিয়ে একটি বড় ধরনের গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছি। কে জানে কবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক মিলবে। বৈজ্ঞানিক

প্রতিভা, সে যে পৃথিবীর কোথায় ছড়িয়ে আছে তা তো আমরা জানি না। তবে যত টাকাই লাগুক ক্যান্সার গবেষণার জন্য তা দেওয়া হবে।

চৌ : এক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করতে পারি।

নিক্সন : সেটি আমরা স্বাগত জানাব। চিকিৎসায় গবেষণার প্রশ্নটি উত্থাপিত হলে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় তা আমি উল্লেখ করার কথা ভাবছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের সকল গবেষণা ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেব। চিকিৎসার জন্য গবেষণা কোনো একটি দেশের জন্য নয়, পৃথিবীর সব দেশের জন্যই হতে হবে।

চৌ : (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ, এক্ষেত্রে বিশ্বের জন্য অর্থপূর্ণ সহযোগিতা সম্ভব।

নিক্সন : উপমহাদেশের প্রশ্নে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের নীতি ভারত বিরোধী নয়, আপনাদের নীতির চাইতে অধিক ভারত বিরোধী নয়। আমাদের নীতি শান্তির পক্ষে (প্রো-পিস)। উপমহাদেশে প্রতিটি দেশেরই টিকে থাকার এবং সমৃদ্ধি অর্জনের পুরো অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের স্বীকৃতি ও তার সংরক্ষণ চাই। যদি এক দেশ আরেক দেশকে গিলে খায় আর তা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠবে। এই নীতি পৃথিবীর সব দেশের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রয়োগ করে থাকি।

চৌ : যদি সে দেশের মানুষ নিজেরাই সরকার পরিবর্তনের দাবি তোলে, তা হবে এক ব্যাপার। বিদেশী সৈন্য এসে আক্রমণ করলে তা হবে অন্য কথা। সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

নিক্সন স্বীকৃতির ব্যাপারে আপনাদের অবহিত করতে একটি প্রক্রিয়া আমরা অনুসরণ করব।

কিসিঞ্জার : হ্যাঁ, আমাদের নিয়মিত চ্যানেল মারফত।

নিক্সন : প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে।

চৌ : আমরা সম্ভবত আরো পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব। এ ব্যাপারে দুটি প্রশ্ন আমাদের বিবেচনা করতে হবে। প্রথম কথা হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা, ভারত বলতে পারবে না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, কারণ জাতিসংঘ এ ব্যাপারে একমত হয়নি এবং সেখানে আমাদের পর্যবেক্ষক রয়েছে। এটি অত্যন্ত জটিল একটি সমস্যা। তাছাড়া ইংরেজরা সমস্যাটা ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে যায়।

নিক্সন খুবই দুঃখের কথা যে, সেই ১৯৪৭ সাল থেকে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক বিষিয়ে আছে।

চৌ : কিন্তু ব্রিটেন ইচ্ছে করে সমস্যার সমাধান না করে ভারত ত্যাগ করে। অন্য আরেকটি বিষয় হলো ইসলামিক দেশগুলো এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের মতামতকেও আমাদের সম্মান দেখাতে হবে।

নিক্সন : হ্যাঁ, তা ঠিক।

কিসিঞ্জার আপনার অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমরা (তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট) বুরুগুইয়ার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।

চৌ ; এমনকি বুরুগুইয়া, যাকে ডানপন্থী ভাবা হয়, সে পর্যন্ত পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চেয়ারম্যান মাও যেমন গতকাল বলেছেন, কখনো কখনো ডান দিকে থাকা ভালো (To be on the right)।

নিক্সন : আরেকজন হলেন ইরানের শাহ্। তিনিও ডানপন্থী এবং এক্ষেত্রে তার ডানপন্থাও সঠিক (Right)। অনুবাদের আগেই চৌ হেসে ওঠেন।

স্বীকৃতি নিয়ে পাকিস্তানের খোলামেলা

'জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন, আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবেন। মুজিব তার ইচ্ছেমতো যেকোনো স্থানে যেতে পারেন, তার কাছ থেকে আগাম কোনো প্রতিশ্রুতিও চাওয়া হবে না। ভুট্টো বলেন, কোনো চাপের মুখে থেকে নয়, পাকিস্তানের দুই অংশের দুই নির্বাচিত নেতা হিসেবে তিনি ও মুজিব কথা বলেছেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্তান নামটি রেখে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে শিথিল কোনো মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হবে' (নিউইয়র্ক টাইমস, ২ জানুয়ারি ১৯৭২)।

'পাকিস্তান রেডিও জানিয়েছে, মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। বিমানবন্দরে মুজিবকে বিদায় দিতে গিয়ে ভুট্টো বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা হিসেবে মুজিবের ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা তিনি করবেন না।' (টাইমস, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২)।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। পরবর্তী ছয় মাসের ভেতরেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই নব্য স্বাধীন দেশটিকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। কিন্তু এই ধারায় প্রধান ব্যতিক্রম ছিল চীন, অধিকাংশ ইসলামি আরব দেশ ও পাকিস্তান।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল একাধিক কারণে। নব্য স্বাধীন এই দেশটি কাগজে-কলমে স্বাধীনতা অর্জন করলেও টিকে থাকার এক মরণপণ সংগ্রাম তার মাত্র শুরু হয়েছে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে তার অবকাঠামো বিধ্বস্ত। অধিকাংশ বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত। সে সময় তার বন্ধু বলতে একমাত্র দেশ প্রতিবেশী ভারত এবং তারই সূত্রে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাংলাদেশকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের কারোরই অফুরন্ত নয়। তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো সাহায্যের হাত বাড়ালে অবস্থা অনেকটা বদলায়। কিন্তু পাকিস্তানকে নারাজ করে তাদের কেউ সে পথে পা বাড়াবে না। জানুয়ারির গোড়ায় ভুট্টো ঘোষণা দিয়ে বসেছিলেন, বাংলাদেশকে যারা স্বীকৃতি দেবে, তাদের সঙ্গে পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করবে। জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জিত না হলে বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সাহায্য কার্যক্রম চালু হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু সেখানেও বাগড়া দিয়ে রেখেছে চীন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলায় তার কোনো আগ্রহ ছিল না। এ অবস্থায় পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান কূটনৈতিক অগ্রাধিকারে পরিণত হয়। ইসলামাবাদ স্বীকৃতি দিলে ইসলামি দেশগুলোর আপত্তি বা চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতা কমবে– এমন আশা করা অযৌক্তিক ছিল না।

পাকিস্তান বাংলাদেশের জন্ম মেনে নেয়নি। সে বিনা ওজরে তাকে স্বীকৃতি দেবে–তা আশা করা তাই বাতুলতা। পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে গ্লানির বিষয় ছিল, এই দেশ ভাগের ভেতর দিয়ে সে আজন্মশত্রু ভারতের কাছে রাজনৈতিকভাবে যেমন, সামরিকভাবেও মারাত্মক পরাজয় বরণ করে। ভারতের হাতে তখন প্রায় ১ লক্ষ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দি আটকা পড়ে আছে। ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের হাতে তারা আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশকে সমতার ভিত্তিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দিলে ভারত একা যুদ্ধবন্দি প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না, দিল্লি সে কথা ইসলামাবাদকে জানিয়ে দেয়। এদিকে ঢাকা বারবার ঘোষণা করে, যুদ্ধবন্দি যে ১৯৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য ও অফিসারকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের জন্য তাদের বিচারে সে বদ্ধপরিকর। পাকিস্তানের নব্য কর্ণধার জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্য সে সময় মাথা ব্যথার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়– একদিকে যুদ্ধবন্দিদের ফেরত আনার প্রশ্নটি, অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকান। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলেও তার ক্ষমতায় টিকে থাকাও সর্বতোভাবে নির্ভর করে পাঞ্জাবি সেনা কমান্ডের মর্জির ওপর। ভুট্টো সে কথা খুব ভালো করেই জানতেন। আটকে পড়া সেনাসদস্যদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবের চারটি জেলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুটি জেলার বাসিন্দা। ১৯৭২ সালের গোড়া থেকেই প্রদেশ দুটিতে সেনাসদস্যদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর অধস্তন সদস্যদের মধ্যেও ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। ইয়াহিয়া খানের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজে রাষ্ট্রনায়ক বনতে চেষ্টা করলেও বন্দি সেনাসদস্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবির মুখোমুখি ভুট্টোকে হতেই হয়। তাদের প্রত্যাবর্তন যত বিলম্বিত হচ্ছিল, রাজনৈতিকভাবে তত কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

এ অবস্থায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও জাতিসংঘে তার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন ভুট্টো। তিনি ইঙ্গিত করলেন, বাংলাদেশকে সময়মতো স্বীকৃতি দিতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে সকল পাকসেনাকে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের রণকৌশল দাঁড়াল, সৈন্য ফেরত পাঠানো প্রশ্নে কোনো আলাপ-আলোচনা করতে হলে আগে কূটনৈতিক স্বীকৃতি চাই। একমাত্র সমতার ভিত্তিতেই আলাপ-আলোচনা হতে পারে, আর সেই সমতার প্রথম শর্তই হলো স্বীকৃতি।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ব্যাপারে ভুট্টো অনেকটা দুমুখো পথ ধরেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি স্বীকৃতির প্রশ্নটি বাতিল করলেও কূটনৈতিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে তিনি স্বীকৃতির প্রশ্নটি শুধু সময়ের ব্যাপার বলে ইঙ্গিত দিতে শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো একাধিক বার্তায় সে কথা তিনি খোলাসা করে বলেন। বাংলাদেশকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 'খপ্পর' থেকে রক্ষা করার জন্যও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। সে যুক্তিও তিনি তুলে ধরেন। কিন্তু বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার আগে যে বিষয়টি তার জন্য প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে তা হলো ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি পেলে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে দরকষাকষিতে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়বে, সে কারণে তা ঠেকাতে ভুট্টো ব্যক্তিগতভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২

সালে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো চট করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন করেন, কারণ খুব তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দিলে 'মুসলিম বাংলার' সঙ্গে কোনো রকম সমঝোতায় আসা পাকিস্তানের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। পাকিস্তানের ভেতরে বাংলাদেশের জন্ম মেনে নিতে খুব কম লোকই প্রস্তুত ছিল। সে কথা স্মরণ রেখেই এ সময় ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের পুনঃসংযুক্তির কথা বারবার উচ্চারণ করছিলেন। মুসলিম দেশগুলোও পাকিস্তানী চাপের মুখে এবং ইসলামি সংহতির নামে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। জানুয়ারির ১০ তারিখে কায়রোতে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে বাংলাদেশ একটি বেসরকারি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। তারা সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে লিবিয়া ও অন্যান্য আরব দেশের প্রতিবাদের মুখে সে প্রস্তাব গ্রহণের বদলে তা একটি বিশেষ কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়।

কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে তাদের সঙ্গে পাকিস্তান সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলেও ভুট্টো এ সময় ঘোষণা করেন। স্পষ্টতই তার বিশেষ লক্ষ্য ছিল ইসলামিক দেশগুলো। তারা যাতে সে পথে পা না বাড়ায় সে উদ্দেশ্যে লবি করার জন্য ভুট্টো নিজে জানুয়ারির শেষ নাগাদ বেশ কয়েকটি ইসলামি দেশ সফর করেন। ভুট্টোর জোরালো ক্যাম্পেইন সত্ত্বেও জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে একের পর এক পূর্ব ইউরোপীয় দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করে। তিনি কথায় ও কাজে এক তা প্রমাণের জন্য তাদের কোনো কোনোটির সঙ্গে সত্যি সত্যিই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সে সব দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পূর্ব জার্মানি ও যুগোস্লাভিয়া। প্রায় একই সময়ে একাধিক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, যেমন– ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড, কিন্তু তাদের কারো সঙ্গেই পাকিস্তান তার সম্পর্ক ছেদ করেনি। সম্পর্ক ছেদের হুমকি দিয়ে পাকিস্তান যে খুব সুবিধা করতে পারছে না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে। ভুট্টো সেদিন মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। তার দেশ এখন মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে কি না জানতে চাওয়া হলে ভুট্টো জানান, বৃহৎ শক্তিসমূহের ব্যাপারে পাকিস্তানকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য কথায়, ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে কোনো পরাশক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ব্যবস্থা পাকিস্তান চাইলেও নিতে পারবে না। রাবাতেই ভুট্টো প্রথমবারের মতো ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ যে একটি বাস্তবতা, সে সত্যটি মেনে নেওয়া ছাড়া পাকিস্তানের আর পথ নেই (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)। জানুয়ারির শেষ নাগাদ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ব্রিটেনসহ অধিকাংশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। সে কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো তড়িঘড়ি করে কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেনের সঙ্গে তার দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখবে (নিউইয়র্ক টাইমস, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২)।

কূটনৈতিক হুমকি দিয়ে খুব একটা কাজ হচ্ছে না, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলে ভুট্টো তার সুর নরম করে আনেন। এবার তিনি আবদার তোলেন যে, স্বীকৃতির প্রশ্নে কোনো

সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মুজিবের সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলতে চান। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি যুক্তি দেখান, দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছে তা সংস্কারের সব চেষ্টা করে দেখতে চান তিনি (আয়ুবের গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৭)। একই বছর আগস্ট মাসে মুজিব লন্ডনে চিকিৎসার জন্য এলে ভুট্টো তাকে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন করে মুখোমুখি সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন। ২৫ মার্চ ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটি আদৌ জটিল কোনো ব্যাপার নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যদের তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে ঠিক সময় ও পরিস্থিতিতে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। ভুট্টো সে সাক্ষাৎকারের সময় জানান যে, এর আগের সপ্তাহে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেক ডগলাস হিউমকে তিনি জানিয়েছেলেন, স্বীকৃতির ব্যাপারে তিনি এই আগাম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত যে, মুজিবের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের পর তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন।' (দি আমেরিকান পেপারস, অক্সফোর্ড ইউ, প্রেস, ১৯৯৯, পৃ. ৮২৭)

মুজিবের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের দাবিটি এরপর আরো কয়েকবার তুলেছিলেন ভুট্টো। ১৯৭২ সালের জুলাইতে ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকের পর ভুট্টো এমন কথাও বললেন, মুজিবের সঙ্গে কথা শুরু হওয়ামাত্রই আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব। তার সঙ্গে আলোচনার ফলাফল যাই হোক না কেন। (স্টেটসম্যান, কলাকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)

মুজিবের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ভুট্টোর এই আগ্রহের একটি কারণ তার নিজ দেশবাসীকে বোঝান, কোনো রকম চাপের মুখে নয় নিজের শর্তেই তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন। স্বীকৃতি ছাড়াই বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হলে দেশের ভেতর ভুট্টোর প্রভাব নির্ঘাত বৃদ্ধি পেত। বাংলাদেশে প্রায় সবাই এবং পাকিস্তানের ভেতরে অনেকেই বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য ভুট্টোকে দায়ী করে থাকেন। সে দায়ভার ঘোচানোর একটা চেষ্টা ছিল মুজিবকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া। বাংলাদেশের সঙ্গে যেমন করেই হোক একটি কাঠামোগত সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি যে বদ্ধপরিকর, সে কথাও তার দেশবাসীকে বোঝাতে আগ্রহী ছিলেন ভুট্টো। এ ব্যাপারে মুজিবের কাছে তিনি প্রথমবারের মতো প্রস্তাব তোলেন ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। মুজিব তখনো পাকিস্তানে বন্দি। ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তাকে বিশেষ বিমানে করে মিয়ানয়ালীর জেল থেকে পিণ্ডিতে নিয়ে আসা হয়। কোনো কোনো ভাষ্যকার ইঙ্গিত করেছেন যে, সে বৈঠকে মুজিব পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। কিন্তু মার্কিন গবেষক স্টানলি ওয়ালপার্ট তার তথ্যনির্ভর গ্রন্থ 'জুলফিকার আলী ভুট্টো অব পাকিস্তান' (অক্সফোর্ড ইউ, প্রেস, ১৯৯৩) এ সরকারি আর্কাইভে রক্ষিত তাদের দুজনের রেকর্ডকৃত কথোপকথনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার ছবিটি কিছুটা ভিন্ন। কনফেডারেশনের প্রশ্নে মুজিব আপাতভাবে সম্মত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওয়ালপার্ট এ কথা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন যে, সেনা প্রহরায় বন্দি অবস্থায় চাপের মুখেই মুজিব সে কথা বলেছিলেন। সে কথোপকথন ওয়ালপার্টের মন্তব্যসহ এখানে তুলে ধরা হল :

"সেনা গার্ডসহ কারাকক্ষে ভুট্টো প্রবেশ করলে মুজিব খুবই বিস্মিত হন। ইতিমধ্যে কী ঘটে গেছে তার কিছুই তিনি জানতেন না। 'আমি ভেবেছিলাম আরেকটা দুর্যোগ বোধহয় নেমে এসেছে' তিনি ভুট্টোকে বললেন। পিণ্ডিতে ক্ষমতার হাত বদলের কথা ভুট্টো তাকে জানালে মুজিব মন্তব্য করল, 'আমি খুশি হয়েছি, বিশ্বাস করুন, আমি খুশি হয়েছি। এখন বলুন আমার বাংলার কী অবস্থা। আমি খুবই উদ্বিগ্ন অবস্থায় আছি।"

ভুট্টো তাকে ব্যাখ্যা করে জানালেন, 'ভারতীয় বাহিনী ঢাকা 'দখল' করে আছে। সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, সোভিয়েত বিমান ও নৌবহরের প্রহরায় তারা সেখানে গেছে।' সে কথা শুনে মুজিব আর্তনাদ করে ওঠেন, 'তার মানে তারা আমাদের হত্যা করেছে, ভুট্টো, তারা আমাদের মেরে ফেলেছে! আমাকে এখনি ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আপনাকে একটা আশ্বাস দিতে হবে। যদি ভারতীয়রা আমাকে জেলে পাঠায়, তাহলে আপনি আমার হয়ে লড়বেন।'

ভুট্টো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, 'আমরা একসঙ্গে লড়ব।'

'না, না! চেঁচিয়ে উঠলেন মুজিব। তিনি ভালো করেই জানতেন যার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন কেমন ধরনের মানুষ তিনি। তিনি এ কথা খুব ভালো করে জানতেন, তার প্রতিটি কথা রেকর্ড করা হচ্ছে। মুজিব বললেন, আমার সমস্যা আমাকেই মোকাবিলা করতে হবে। বিদেশী সেনাবাহিনী এখন সেখানে রয়েছে। আওয়ামী লীগ একা তাদের হঠাতে পারবে না। আপনার সাহায্য আমি চাই। আমি ভারতীয় বাহিনী থাকুক, তা চাই না। আপনি সে কথা বিশ্বাস করেন তো?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, আর সে জন্যই তো সবার আগে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করেছি।'

'আপনি এখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।'

মুজিব সে কথা ফের বললেন, যদিও তার গলা শুনে মনে হলো না তিনি খুশি হয়েছেন। তার তখন একমাত্র চিন্তা নিজের প্রিয়তম ঢাকাকে তিনি আবার কখন দেখতে পাবেন, আদৌ দেখতে পাবেন কি না তাও নিশ্চিত নয়। এরপর মুজিব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাহলে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছেন?

ভুট্টোর জবাব, সেটা কোনো জরুরি ব্যাপার নয়। সেনাবাহিনী আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। আমি শুধু চাই আমার দেশের ঐক্য, তা যে শর্তেই হোক না কেন। ভুট্টো তখনো স্বপ্ন দেখছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ফের এক হবে। তিনি আমাদের না বলে আমার দেশ বললেন, কারণ মুজিবকে তিনি তখনো বিশ্বাস করতেন না, যেমন মুজিব তাকে বিশ্বাস করতেন না।

'না না, কোনো শর্ত নয়, মুজিব বললেন, 'আপনি বলুন, আমাদের দেশের এখন কী অবস্থা।'

'মুজিব ভাই, আমরা একসঙ্গে থাকব, তার কি কোনো সম্ভাবনাই নেই?'

'আমি ঢাকায় জনসভা করব, আমি আমার দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলব, তারপর আপনাকে জানাব। এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। এ নিয়ে এখনি আমি কিছু বলতে পারব না।' প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে তিনি সমঝোতা করছেন সে কথা জানতে পারলে তার দলের

নেতা-কর্মীরা কতটা দুঃখ পাবে তা ভেবে মুজিব স্পষ্টতই ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লোকটি, যার হাতে তার জীবন ও মৃত্যুর চাবি রয়েছে, তার সঙ্গে তিনি মোটেই বিনীত হয়ে কথা বলছিলেন না।

এরপর আরো ১১ দিন জেলে আটকে রাখা হয় মুজিবকে। ৭ জানুয়ারি রাতে ফের তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভুট্টো। সে সময় তিনি মুজিবকে দলে টানতে খুবই উদ্‌গ্রীব। যে পাকিস্তান ইয়াহিয়ার কারণে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, তাকে তিনি ফের জোড়া লাগাবেন। দেশের মানুষ তাকে বলবে কায়েদে আজম শহিদ-ত্রাণকর্তা ভুট্টো।

'২৭ তারিখে আপনি বলেছিলেন সশস্ত্র বহিনী, পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থ, এ রকম দুটো বা তিনটি ক্ষেত্রে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি।' ভুট্টো মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মুজিব সন্ত্রস্তভাবে বললেন, 'কিন্তু সেসব বিষয়ে কথা বলার আগে আমাকে মুক্তি দিতে হবে।'

(দুই দেশের মধ্যে) কনফেডারেশন ব্যবস্থা, তা যত শিথিলই হোক না কেন, তাতে আমি সম্মত।

'না, না, আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কোনো একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। কনফেডারেশনের কথা আমি বলেছি। এ কথা কিন্তু একদম আপনার-আমার মধ্যে। আমি আশা করি এ কথা আর কাউকে আপনি বলেননি, মুজিব বললেন।

ভুট্টো বললেন, 'শুনুন, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, যা খুশি আপনি হতে পারেন। আমার কোনো কিছুতেই আর আগ্রহ নেই। আমি গাঁয়ে চলে যাব। পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে বলছি, আমি গ্রামে চলে যেতে প্রস্তুত।'

মুজিব বললেন, 'আমি তো বলেছি আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তার পথ তো আপনার জানা আছে। আমাকে ফিরতে হবে। আমাকে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের সেনাবাহিনী ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার মতো। আরেকটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলছি, পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের ঠেকাতে হবে, আমার মুশকিল তো আপনি বোঝেন।'

'হ্যাঁ, আমি বুঝি', ভুট্টো বললেন।

কারা প্রকোষ্ঠে সেনা প্রহরায় পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতিকে মুজিব যাই বলে থাকুন না কেন, স্বাধীন বাংলাাদেশের মাটিতে পা রেখে তার সিদ্ধান্ত ছিল একদম সরলরৈখিক। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রে তিনি ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের পুনঃসংযুক্তির কোনো প্রশ্ন ওঠে না এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য পাকিস্তানী সেনাসদস্যদের বিচার হতেই হবে।

'নয় মাসের কারাজীবনের পর শেখ মুজিব জনতার অভিনন্দনে সিক্ত হয়ে আজ দেশে ফিরেছেন। ঢাকার বিশাল জনসভায় তিনি বলেছেন, মুক্ত বাংলায় পা রাখতে পেরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন করেন, ৩০ লাখ বাঙালির হত্যার জন্য কারো বিরুদ্ধে কেউ যেন প্রতিশোধ না নেয়। আজ বাংলাদেশে সবাই বাঙালি, সবাই এখানে শান্তিপূর্ণভাবে থাকবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। মুজিব জানান, পাকিস্তান

থেকে বিমানে ওঠার আগে ভুট্টো তার শেষ কথায় পাকিস্তানকে এক রাখার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সে আবেদনের জবাব দেননি। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক বজায় রাখার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সম্পর্ক আর সম্ভব নয় বলে মুজিব ঘোষণা করেন।' (নিউইয়র্ক টাইমস, ১১ জানুয়ারি)

রেসকোর্সের সে ভাষণে মুজিব এ কথা স্পষ্ট করে দেন যে, শুধু সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনো আলোচনা হতে পারে। পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের সেনাবাহিনী যদিও আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ করেছে, তোমাদের প্রতি আমাদের কোনো ঘৃণা নেই। তোমরা তোমাদের স্বাধীনতা নিয়ে থাক, আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিকে থাবব। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নেও যে তিনি কোনো সমঝোতা করবেন না, তাও স্পষ্ট করে দেন। তিনি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধাপরাধের বিচারের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিরুদ্ধে ভুট্টোর একটি প্রধান যুক্তি ছিল, যতদিন ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে আছে, ততদিন দেশটিকে স্বাধীন বলা যায় না। সে কেবলমাত্র ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণে। এমন ভূখণ্ডকে সে যেমন স্বীকৃতি দেবে না, তেমনি অন্য কোনো দেশেরও উচিত নয় স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু ১২ মার্চ ১৯৭২ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ ভারতীয় সৈন্যটি দেশে ফিরে গেলে ভুট্টোর যুক্তির আর কোনো ওজন থাকল না। প্রকৃতপক্ষে ভারত আগে জানিয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চের আগে তারা সকল সৈন্য সরিয়ে নেবে। কিন্তু সে সময়সীমা পেরোনোর ১৩ দিন আগেই তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ভারতীয় আগ্রাসন বিষয়ে যে যুক্তি ভুট্টো তুলে ধরেছিলেন, তা আর ধোপে টিকল না।

মজার ব্যাপার হলো, ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তার মুসলিম মিত্রদের এ কথা বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখল যে, আসলে বাংলাদেশ ভারতের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারটা শুধু চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। বাংলাদেশ থেকে শেষ ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রায় ছয় মাস পরও পাকিস্তান সেই একই কথা বলতে থাকে। আগস্ট মাসে ভুট্টো মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য এম কে জাতোই মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফরে এসে প্রকাশ্যেই সে কথা বলে যান। জাতোই সে সময় দাবি করেন, শেখ মুজিব ভারতীয় অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত বন্দি রয়েছেন। তিনি যদি দেশের বাইরে এসে নিজের কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারতেন, তাহলে যুদ্ধবন্দি প্রশ্নটি কেবল সমাধান হয়ে যেত তা নয়, পাকিস্তানের দুই অংশের পুনঃএকত্রীকরণও সম্ভব হতো। বাংলাদেশ এ সময় জাতিসংঘে সদস্যপদের জন্য চেষ্টা শুরু করে। সেখানেও সেই একই যুক্তি দেখিয়ে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তান। জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়ালডহাইমের কাছে লেখা এক চিঠিতে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি দাবি করেন, 'পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা'র রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে 'সরাসরি' আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশ সে দাবি এক কথায় নাকচ করে দেয়। ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বলে অভিযোগ তোলে যে, পাকিস্তান পৃথিবীর মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পাক-ভারত আলোচনা ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন

মার্চ ১৯৭২ থেকেই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তাদের বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। দু'দেশের মধ্যে সামরিক নিয়ন্ত্রণ রেখা নির্ধারণ সে আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দি প্রত্যাহারের প্রশ্নটি সেখানে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটিও সে আলোচনার বাইরে রাখা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ছিল। দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে তৃতীয় কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান আলোচনার প্রস্তাব প্রথম আসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১। কিন্তু ভুট্টো বারবার চাপ দিচ্ছিলেন সরকারপ্রধান পর্যায়ে, অর্থাৎ তার ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে সরাসরি সে আলোচনার জন্য। কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনার আগে পূর্ব আলোচনার জন্য ভারত দূত পর্যায়ে মতবিনিময়ের প্রস্তাব দেয়। অনেক ওজর-আপত্তি তুললেও পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সে প্রস্তাব মেনে নেয়। এদিকে মার্চের ১৮ তারিখ ঢাকা সফরে আসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তার সফর শুরুর আগেই দিল্লি থেকে ঘোষণা করা হয়, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দি প্রশ্নে বাংলাদেশের দাবি ভারত সমর্থন করে। যেসব পাকিস্তানী যুদ্ধপরাধীর ব্যাপারে বাংলাদেশ তথ্য-প্রমাণ হাজির করবে তাদের বিচারের প্রশ্নে ভারত আপত্তি করবে না। বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে যে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করছে, তার আইনগত শুদ্ধতা নিয়ে ভারতের কোনো সন্দেহ নেই বলেও দিল্লি জানায়। (নিউইয়র্ক টাইমস, ১৮ মার্চ ১৯৭২)

আসন্ন পাক-ভারত আলোচনায় যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধী প্রশ্নে কোন রণকৌশল অবলম্বন করা হবে, তার একটি রূপরেখা ইন্দিরার ঢাকা সফরকালে নির্ধারিত হয়ে যায়। ইন্দিরা ও মুজিব দুজনই সে সময় এ ব্যাপারে একমত হন যে, পাকিস্তান যতক্ষণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিচ্ছে, যুদ্ধবন্দি হস্তান্তর প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো সমঝোতা হবে না। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীই পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এই সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে বলা হয় যে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে তার সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের দ্রুত বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ আগ্রহী বলে তিনি জানান। জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দোষী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যাপারে তার সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন (আয়ুবের গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃ. ৮০)।

ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের প্রশ্নটি একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে তিনি নাক গলাতে চান না। এ প্রশ্ন নিয়ে তার দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে কোনো বাধা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। (নিউইয়র্ক টাইমস, ১৯ মার্চ, ১৯৭২)

'বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে, যুদ্ধাপরাধের জন্য তারা ১ হাজার পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যের বিচার করবে। যাদের নাম এই তালিকায় রয়েছে তারা হলেন জেনারেল নিয়াজি ও জেনারেল রাও ফরমান আলী। জেনারেল টিক্কা খানকে তার

অনুপস্থিতিতে বিচার করা হবে। প্রধান অপরাধীদের দেশী ও আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত প্যানেলের হাতে বিচার হবে; অন্যদের ক্ষেত্রে বাঙালি বিচারকদের সে দায়িত্ব দেওয়া হবে।' (নিউইয়র্ক টাইমস, ৩০ মার্চ, ১৯৭২)

যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রশ্নে তার এই কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও পূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে সে কাজ সম্পন্ন করা খুব সহজ হবে না– বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই তা জানত। তার চেয়েও বড় কথা তার অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই জরুরি ছিল। পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া যে পূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে না, তা বাংলাদেশ ও ভারতের জানা ছিল। সে জন্যই যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির প্রশ্নটি তারা বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। ইন্দিরা ও মুজিব যে তাদের অভিন্ন রণকৌশল হিসেবে এই পথ অনুসরণ করবেন, তা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরের পরপর স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দূত পর্যায়ে বৈঠক শুরু হয় মারিতে ২৯ এপ্রিল ১৯৮২। ঠিক তার আগে ঢাকা সফরে আসেন সে বৈঠকে ভারতীয় দলের নেতা ডিপি ধর। পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রশ্নটি বাংলাদেশ ছাড়া ভারত একা আলোচনা করতে পারে না, আর বাংলাদেশ সার্বভৌম সমতা ছাড়া সে রকম আলোচনায় অংশগ্রহণে সম্মত নয়, তার এই সফরের পর সে কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী সৈন্যদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ যে আপস করবে না, একই সময়ে ঢাকা থেকে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত পাকিস্তানের ওপর চাপ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিচারের প্রশ্নটি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে তথ্য মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেন। কলকাতার স্টেটম্যান পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমার দেশের মানুষ নির্মমভাবে নিহত হয়েছে, 'কয়েক শ' নয়, কয়েক হাজার নয়, ৩০ লাখ। আমরা অন্ততপক্ষে সেসব পাকিস্তানী সেনার বিচার করতে চাই, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ভুট্টোর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের দাবি প্রসঙ্গে মুজিব সরাসরি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে কখনোই সাক্ষাৎ করব না। তার সমস্যার ব্যাপারটা আমি বুঝি, কিন্তু তাকে খুশি আমি করতে পারব না'। (দি স্টেটম্যান, ২৬ এপ্রিল ১৯৭২, আয়ুবের গ্রন্থে উদ্বৃত)।

পাকিস্তানী সেনা হস্তান্তর ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ যে সত্য সত্য অনড়, সে কথা বুঝতে ভুট্টোর কষ্ট হয়নি। ১৫ এপ্রিল ১৯৭২ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে লেখা এক 'গোপন' চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে তার উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। পূর্ববর্তী মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে তার সফরের কথা উল্লেখ করে সে চিঠিতে ভুট্টো বলেন, 'সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আমি (সোভিয়েত নেতাদের) জানিয়েছি যে, সরাসরি ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের মানুষ যেভাবে তাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে তা মেনে নেয়নি। (বাংলাদেশের) স্বীকৃতির প্রশ্নটি তাদের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করবে। এ অবস্থায় (স্বীকৃতির) পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে।' যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের

প্রসঙ্গে ভুট্টো লেখেন, 'ভারতীয় মদদে শেখ মুজিবুর রহমান ১৫০০ যুদ্ধবন্দির 'যুদ্ধাপরাধের' জন্য বিচারের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর বলে মনে হয়। যদি বাংলাদেশ সত্যি সত্যি তেমন পথে এগোয়, তাহলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় লাখ বাঙালি রয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার যাতে না হয় আমরা তা নিশ্চিত করতে পেরেছি। কিন্তু এই পরিকল্পিত বিচার যদি সত্যি সত্যি শুরু হয়, তার ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে তাতে ভারত ও 'বাংলাদেশের' সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়বে (দি আমেরিকান পেপারস, পৃ. ৮৪২)। একই চিঠিতে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আবেদন রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধে তার প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেন।

'২৬ মার্চ রাওয়ালিপিণ্ডিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তিনি পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি মেনে নেবেন না। ভারতের সঙ্গে কোনো শান্তি চুক্তির স্বার্থে বা ভারতে অন্তরীণ পাকসেনাদের দেশে ফেরার বদলে সে বিচার মেনে নিতে হলে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড ও সিলোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। বাংলাদেশে যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ মারা গেছে বলে শেখ মুজিবের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ভুট্টো বলেন যে, মোট মৃতের সংখ্যা ৫০,০০০-৬০,০০০- এর বেশি হবে না। ভুট্টো বেশ খেলামেলাভাবেই এ কথা বলেন যে, যুদ্ধবন্দিদের বিচারের চেষ্টা হলে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকজনের ক্রোধ দাবিয়ে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৬ মার্চ, ১৯৭২)

যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে অন্য আরেক সমস্যা ছিল তাদের অপরাধের আইনগত ভিত্তি নির্মাণ। যুদ্ধাপরাধের তথ্য সংগ্রহ ও তার প্রামাণিকীকরণে যে জটিলতা ও আইনগত কঠোরতা পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, বাংলাদেশ সে সম্বন্ধে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত ছিল না। মার্চের মাঝামাঝি বাংলাদেশ দাবি করে তারা ১,৫০০ যুদ্ধাপরাধীকে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তারা আদালতে উপস্থিত করবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে যে কঠোরতা প্রয়োজন, তা প্রয়োগের মাধ্যমে সে প্রমাণাদি দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার অভিযুক্তদের মোট সংখ্যা ১,৫০০ থেকে ১৯৫-তে নামিয়ে আনে। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের একটি সম্ভাব্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন ডেনিস রাইট তার গ্রন্থে। তার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ চাইছিল যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক, কারণ সে বিচার যত বিলম্বিত হবে, তা একদম না হওয়ার সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ভারত এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে মোটেই আগ্রহী ছিল না। ভারতের কাছে যুদ্ধাপরাধী বিচারের ব্যাপারটি ন্যায়বিচারের চেয়ে আলাপ-আলোচনায় 'বারগেইনিং পয়েন্ট' হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

লে. জেনারেল এ এ কে. নিয়াজী

১৯৭১ সালের যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছিলেন লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার হিসেবে। যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে ১৯৭৫ সালে তাঁকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়। যুদ্ধের পরই পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত থাকার পর কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে যুদ্ধের তিন দশক পর ২০০১ সালে মোশাররফ সরকারের সময়। রিপোর্টে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নিয়াজিকে কোর্ট মার্শাল করার সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে ৮৯ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয়-মার্কিন পত্রিকা ইন্ডিয়া অ্যাব্রড-এ এক সাক্ষাৎকারে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন নিয়াজি। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন : হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একাত্তর সালের পরাজয়ের ঘটনার জন্য দায়ী সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের সুপারিশের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন দেখা গেছে। আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উ : পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির পক্ষে যে জনমত রয়েছে সেই দাবির সঙ্গে আমি একমত। বিশেষ করে, যাঁরা সেনাবাহিনীতে ছিলেন এঁদের বিচার হওয়া উচিত। যুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তানে ফিরে আমি স্বেচ্ছায় কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সে সময়ের সেনাপ্রধান টিক্কা খান আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি আসলে প্যানডোরার বাক্সটি খুলতে চাননি। এ ধরনের কিছু শুরু হলে যুদ্ধ পরিচালনায় সেনা সদর দপ্তরের ব্যর্থতা ও সেনা রিজার্ভ কমান্ডার হিসেবে টিক্কা খানের ভূমিকা প্রকাশ হয়ে পড়ত। কোর্ট মার্শাল না হওয়ার কারণে হামদুর রহমান কমিশন গঠনের আগে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইনি। কোর্ট মার্শাল হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম না। পাকিস্তানের সেনা আইন অনুযায়ী আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনোকিছু নতুন করে পর্যালোচনা ও কোনো সাক্ষীকে হাজির করার সুযোগ চাইতে পারেন। এ ধরনের সুযোগ থাকার ফলে সেনা সদর দপ্তরের দুর্বলতা প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় আমাদের কখনো কোর্ট মার্শাল হয়নি। এ ধরনের কিছু হলে বরং আমি সহজেই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতাম। কমিশন আমার এই যুক্তি মেনে নিয়েছিল যে, আত্মসমর্পণের আদেশ আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

প্র : আপনি বললেন, কমিশন আপনার এই যুক্তি মেনে নিয়েছে যে, আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। কিন্তু মোশারফের সরকারের সময় প্রকাশ করা রিপোর্টে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য আপনাকে ও আরো কজন জেনারেলকে দায়ী করা হয়েছে।

উ : আমি যদি এতো বড় একটি ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী হয়ে থাকি, তবে আমার কোর্ট মার্শাল করা হলো না কেন? ১৯৯১ সালে একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত এক বক্তব্যে টিক্কা খান বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সেনানায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার

কাছে আত্মসমর্পণকারী লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রমাণপত্র পাইনি। কারণ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের আদেশ ছিল। কিন্তু আমরা তাঁকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিইনি এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে তাঁকে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধাসহ অবসর দেওয়া হয়।'

প্র : তবে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, ঢাকার পতনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এককভাবে দায়ী এবং আপনি শুধু তাঁর আদেশ অনুসরণ করেছেন?

উ : না, ইয়াহিয়া খান ছাড়াও আরও কজন সমানভাবে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের জন্য দায়ী। কিন্তু রিপোর্টে তাদের দায়ী করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল এবং পরিণতিতে জিন্নাহ'র ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল তার যথাযথ কারণগুলো ও পেছনে কাদের দায় রয়েছে– সেই সত্য কমিশন বের করতে পারেনি।

প্র : রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আত্মসমর্পণের কোনো আদেশ ছিল না। তবে আপনার কাছ থেকে সেখানকার পরিস্থিতির বর্ণনা পেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে আপনাকে প্রয়োজনে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়ে রেখেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আপনি যদি মনে করতেন যে, ঢাকাকে রক্ষা করা সম্ভব তবে আপনি সহজেই এ ধরনের আদেশ উপেক্ষা করতে পারতেন।

উ : আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি যে ইয়াহিয়া আমাকে আত্মসমর্পণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনো আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আমি বার্তা পাঠিয়েছিলাম। এ ছাড়া জেনারেল আবদুল হামিদ খান ও বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল রহিম আমাকে ফোন করেছিলেন এবং একাত্তর সালের ১৪ ডিসেম্বর পাঠানো সেনা সদরের বার্তা অনুযায়ী কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান বিপদের মুখে রয়েছে। এর আগে আমাকে সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বলা হয়েছিল।

আমি এখনো বিশ্বাস করি যে দুটি সাঁজোয়া ডিভিশন ও তিনটি পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্স যদি পাল্টা হামলা চালাত, তবে যুদ্ধের ফলাফল খুবই অন্য রকম হতে পারত।

প্র কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে আপনার সৈন্যরা লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। আপনার মন্তব্য কী?

উ পূর্ব পাকিস্তান কমান্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আমি সৈন্যদের লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও ও নির্বিচারে লোকজন হত্যার বেশকিছু অভিযোগ পেয়েছিলাম। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে আমি বিষয়গুলো জানিয়ে একাত্তর সালের ১৫ এপ্রিল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমি আমার চিঠিতে স্পষ্টভাবেই লিখেছিলাম যে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি সৈন্যদের এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে সেখানকার পশ্চিম পাকিস্তানীরাও ছাড় পাচ্ছে না। আমি আরও জানিয়েছিলাম যে, কর্মকর্তা পর্যায়ে কেউ কেউ এ ধরনের লজ্জাজনক কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বারবার এসব বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট কমান্ডাররা এই বিপজ্জনক উচ্ছৃঙ্খলতাকে বন্ধ করতে পারেননি। এর ফলে নিশ্চিতভাবেই সৈন্যদের যুদ্ধ করার দক্ষতা কমেছে।

প্র : একজন সেনা কমান্ডার হিসেবে আপনার ব্যর্থতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপমানকর আত্মসমর্পণের দায়ভার আপনি নেবেন কি?

উ : পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের ৪৫ হাজার সৈন্য লড়াই করছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য, কয়েক লাখ মুক্তিযোদ্ধা ও আমাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। শুধু বিদ্রোহ দমনের জন্যই আমার প্রয়োজন ছিল প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যের। সে সময় আমরা আমাদের মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কোনো বিরতি ছাড়াই আমরা লড়াই চালিয়ে গেছি। হামদুর যদি ভেবে থাকেন যে আমরা সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, তবে তাঁর উচিত ছিল আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে সেনাবাহিনী আমার কমান্ডের আওতায় পূর্ব পাকিস্তানে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই, বন্দুকের নল ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা দিয়েছিল এবং শেষ পরিণতি হচ্ছে একাত্তর সালের পরাজয়।

ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই একাত্তর সালের এই তালগোল পাকানো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন ক্ষমতা ধরে রাখতে, অন্যদিকে ভুট্টো চেয়েছিলেন তা দখল করতে। আর প্রকৃত সত্যটি হচ্ছে, নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। সরকারের দায়িত্বটি তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া উচিত ছিল। মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকত। এটা দুঃখজনক যে কমিশন ভুট্টোকে সব ধরনের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন : কমিশনের রিপোর্টে একাত্তর সালের পরাজয়ের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি জেনারেল চক্রকে প্রকাশ্যে বিচারের সুপারিশ করা হয়েছিল। অথচ জেনারেল টিক্কা, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান ও রাও ফরমান আলীকে (নিয়াজীর উপদেষ্টা) অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কি নির্দোষ ছিলেন?

উ : কমিশনের এই তিনজনকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টির সঙ্গে আমি একমত নই। এটা খুবই বিস্ময়কর যে কমিশন পাকিস্তান ভাঙার কোনো দায়ভার টিক্কা, ইয়াকুব ও ফরমানকে দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে ইয়াকুবের ব্যর্থতা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। সবকিছু গুলিয়ে ফেলার পর ইয়াকুব বিবেক ও নীতি নৈতিকতার তোয়াক্কা না-করে দায়িত্ব ছেড়ে দেন ও পদত্যাগ করেন। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত ছিল। ইয়াহিয়া তাঁর পদাবনতি করেছিলেন, কিন্তু ভুট্টো তার পদ ফিরিয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছিলেন। কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কী অপূর্ব পুরস্কার।

হামদুর কমিশন তাঁকে দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। এর মাধ্যমে আসলে কোনো জটিলতা দেখা দিলে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে সেনা কর্মকর্তাদের পদ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। একইভাবে রিপোর্টে টিক্কাকে দায়ী করা হয়নি। যদিও ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি কসাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কমিশন তাঁর ঘৃণ্য অপরাধকে উপেক্ষা করেছে। আর রাও ফরমান আলীর ক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, তিনি ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন।

প্রশ্ন : ভুট্টোর সরকার হামদুর রিপোর্ট প্রকাশ করেনি কেন?

উত্তর ভুট্টো এই রিপোর্ট প্রকাশে ভীত ছিলেন, কারণ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যে পরিস্থিতি পাকিস্তানকে ভাঙনের দিকে নিয়ে গেছে, তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। ভুট্টোর সহযোগীদের নিয়ে গঠিত সাত সদস্যের একটি উপকমিটিকে এই রিপোর্ট দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কমিটি এই রিপোর্ট প্রকাশ না-করার সুপারিশ করে। ভুট্টো পরে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে রিপোর্টটি ৩৪টি পাতায় কিছু সংশোধন করেন।

প্রশ্ন : আপনার মতে হামদুর রিপোর্ট ক্রুটিপূর্ণ, খণ্ডিত ও ভুট্টোর দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাঁদের কেউই ঢাকা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী জেনারেলদের কোর্ট মার্শাল করতে প্রস্তুত নন। দায়ীদের শাস্তি দিতে কী করা উচিত বলে মনে করেন? আপনার কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে কি?

উত্তর একাত্তরের বিপর্যয়ের প্রকৃত সত্য বের করতে ও দায়ীদের শাস্তি দিতে বিচার্য এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকতা দিয়ে একটি নতুন কমিশন গঠন জরুরি। সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে এই কমিশন হওয়া উচিত। এটা খুবই চমৎকার একটি কাজ হবে এবং অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে। চরম প্রতিকূল পরিবেশে ক্ষুদ্র, ক্লান্ত ও খুবই দুর্বল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পূর্বাঞ্চলীয় গ্যারিসন কীভাবে তাদের ওপর অর্পিত সব দায়িত্ব পালন করতে পারল এবং অন্যদিকে কেন পর্যাপ্ত সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ থাকার পরও পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্যারিসন ব্যর্থ হলো এবং ১০ দিনেরও কম সময়ে পাঁচ হাজার ৫০০ বর্গমাইল এলাকা হারাল—এ ব্যাপারে একটি সামরিক পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

ভারতে আটক থাকার পর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান ফিরে আমি যখন পূর্ব পাকিস্তান বিপর্যয়ের ব্যাপারে আমার রিপোর্ট প্রস্তুত করছিলাম তখন আমি সেনা সদরের বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাচ্ছিলাম যে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে বলি দেওয়া হয়েছে। এবং পূর্ব পাকিস্তানে পরাজয়ের জন্য এর সিনিয়র কমান্ডারদের বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। শুরুতে আমার এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ থাকলেও পরে বছরের পর বছর এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, সেনা সদর হাইকমান্ডের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রতারণা, চাতুরী ও বিদ্বেষের শিকার হয়েছে।

এটা এতোটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল যে ভারতীয় মেজর জেনারেল শাহ বেগ সিং আমাকে বলেছিলেন, 'স্যার, আপনার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তারা সব কিছুর দায় আপনার ও আপনার কমান্ডের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' তারপর আমি এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত যে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের বিষয়টি ছিল পরিকল্পিত।

প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানে পরাজয়ের বিষয়টি পরিকল্পিত ছিল– এ অবস্থানের পক্ষে আপনার যুক্তি প্রমাণ কী?

উত্তর ১৯৭০-এর নির্বাচনে মুজিবের বিজয়ের বিষয়টি ইয়াহিয়া ও ভুট্টো কারও জন্যই সুখকর ছিল না। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিতে হবে এবং ভুট্টোকে বসতে হবে বিরোধী দলের আসনে। ভুট্টো তা কোনোভাবেই চাননি। এ

অবস্থায় ভুট্টোর নিজ এলাকা লারকানায় এই দুজন মিলিত হন এবং এক পরিকল্পনা আঁটেন, যা অনেকের কাছেই 'লারকানা ষড়যন্ত্র' হিসেবে পরিচিত। তাঁদের পরিকল্পনাটি ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের সভা স্থগিত করা এবং নানা কূটকৌশল, হুমকি, ভয়-ভীতি ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকানো। শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তা দূর করার সময় এসেছে এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থে দেশ দুটির উচিত শান্তির জন্য সংলাপ শুরু করা?

উত্তর : আমাদের কখনোই ভারতকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। ভারতের কোনো সরকারই একটি শক্তিশালী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাকে মেনে নিতে পারেনি এবং তারা সব সময়েই আমাদের দেশটিকে দুর্বল করতে চেয়েছে। অতীতের রেকর্ড দেখলে দেখা যাবে যে ভারত সব সময় পাকিস্তানের ক্ষতি করেছে। ভবিষ্যতেও তারা যখন সুযোগ পাবে কখনো পাকিস্তানকে ছেড়ে দেবে না। এখনো কাশ্মিরে মোতায়েন হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে চলেছে।

জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি না-দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে পারে না।

প্রশ্ন : কাশ্মির সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বর্তমানে যে কূটনৈতিক উদ্যোগ চলছে, আপনাকে সুযোগ দেওয়া হলে আপনি কি সেখানে কোনো ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী?

উত্তর : না, আমি বরং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে শ্রেয় মনে করি। যদিও আমি এখন যুদ্ধ করার জন্য খুবই বৃদ্ধ, তবুও আমি জম্মু ও কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকাই বড় ছিল

লে. জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব। একাত্তরেরের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি ভারতের সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব জেনারেল স্টাফ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকার জন্য পি ভি এস এম (পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল) খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা, বার্থ অব এ নেশন। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮ প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : আপনার নামের আগে জে এফ আর শব্দটি দেখছি। নামকরণের গল্প বলুন।

উত্তর : পুরো নাম জ্যাকব ফ্রেডারিক রালফ জ্যাকব। কর্মক্ষেত্রে আমার উপনাম ছিল 'জেক'। আরবি জানা মা আমাকে একটি আরবি উপনামেও ডাকতেন। 'ফারাজ'। এর অর্থ সুখ। তৃতীয় নাম রালফ বা রাফায়েল, এটি বাইবেলের একটি নাম।

প্রশ্ন : আপনার পূর্বপুরুষেরা, কোথাকার?

উত্তর ২০০ বছর আগে বর্তমান ইরাক বা সিরিয়ার কোনো অঞ্চল থেকে আমার পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষে আসেন।

প্রশ্ন : ঠিক কোন এলাকা থেকে?

উত্তর : আমরা বাগদাদ থেকে এসেছি। পূর্বপুরুষেরা বিশুদ্ধ ইহুদি ছিলেন।

প্রশ্ন : ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া ১০টি গোত্রের (বাইবেলে বর্ণিত টেন মিসিং-ট্রাইবস) একটি উত্তর-পূর্ব ভারতে রয়েছে বলে একটি দাবি করা হয়। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?

উত্তর : এ নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা আছে। আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। এর উত্তর আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণে গিয়ে আপনি চিতাবাঘের দাঁত নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। বাঘ-বৃত্তান্ত বলুন।

উত্তর বহু বছর আগে আমি দিল্লিতে কুতুবমিনারের কাছাকাছি একটি রেঞ্জে ট্রেনিংয়ে ছিলাম। একদিন শুনলাম একটি চিতাবাঘ গ্রামবাসীকে বড় ভোগাচ্ছে। প্রায়ই ছাগল ধরে নিচ্ছে। আমি খুব কাছ থেকে চিতাবাঘটিকে শিকার করেছিলাম। বিমানে বহন কালে ওই চিতাটির একটি দাঁত খসে পড়ে। আমি দন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। চিকিৎসক প্রথমে অপমানিত বোধ করেছিলেন। পরে উপযুক্ত সম্মানীর বিনিময়ে তিনি তা মেরামত করেন।

প্রশ্ন : ইহুদি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে কি কোনো মিল খুঁজে পান? আপনার তো পড়াশোনা রয়েছে।

উত্তর আমি বিশেষজ্ঞ নই। বড় যে ধার্মিক, তাও নই। চোখ জুড়ানো নৈসর্গিক সৌন্দর্যখচিত লাদাখে আমি বহু মঠ ঘুরেছি। সব ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।

প্রশ্ন : ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো। আপনার বিবরণমতে কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে জেনারেল স্যাম মানেকশ ইন্দিরাকে রাজি করালেন যে এপ্রিলের মধ্যেই বাংলাদেশে ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হওয়া উচিত। আপনি বেঁকে বসলেন। বললেন, ১৫ নভেম্বরের আগে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এতে তিনি 'হতাশ ও অধৈর্য' হলেন।

উত্তর : প্রত্যেক ব্যক্তির কিন্তু নিজস্ব ধ্যান-ধারণা থাকবেই।

প্রশ্ন : কিন্তু আপনার বইয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনায় মানেকশ'র সামগ্রিক ভূমিকা কিন্তু ধূসর। ফোর্ট উইলিয়ামে একাত্তরের আগস্ট বৈঠকে মানেকশ বললেন, খুলনা ও চট্টগ্রাম দখল করতে পারলেই যুদ্ধ শেষ হবে। এমনকি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদাতা লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাও ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই মত পোষণ করেন। আপনি ছাড়া ঢাকার পতন চিন্তা কারও মাথায় ছিল না। তাহলে কি বলা যায়, একজন জ্যাকব না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারত?

উত্তর আমি এভাবে দেখি না। মানেকশ'র ছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গি, আমার ভিন্ন। হয়তো তিনিও সঠিক বলে প্রমাণিত হতে পারতেন, আমি তা জানি না। তিনি আমার বস ছিলেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চলাই ছিল আমার কাজ। আমি একজন ভালো সৈনিক ছিলাম। তা ছাড়া দুজন একই ভাবনা ভাবতে পারেন না।

প্রশ্ন : ভারত সরকারের তরফে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়ে আপনি লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজির পিআরও সিদ্দিক সালিকের থেকে তথ্য ধার করেছেন। সালিক লিখেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি পর্যায়ে সহযোগিতা দেওয়া হয়। এটা কি সঠিক?

উত্তর মোটামুটি এটাই সত্য। সালিক জানতেন কী ঘটেছিল।

প্রশ্ন : নিজের ঘরের তথ্য দিতে নির্ভর করলেন অন্যের ওপর। কেন?

উত্তর : আমাকে এটা স্পষ্ট করতে দিন যে ভারত সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি এখনো ক্লাসিফায়েড (গোপনীয়) হিসেবে বিবেচিত। সে কারণেই আমি অন্যের ওপর নির্ভর করেছি।

প্রশ্ন : সালিকের মতে বাংলাদেশের এক লক্ষ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিতে ভারত প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেছিল। কনভেনশনাল বা প্রথাগত যুদ্ধের জন্য ৩০ হাজার এবং গেরিলা কৌশল অবলম্বনের জন্য ৭০ হাজারকে প্রস্তুত করা হয়। এই তথ্য সঠিক?

উত্তর : শতভাগ না হলেও সাধারণভাবে সঠিক বলতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনি লিখেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা একটি বাদে সব ম্যাপ জোগাড় করতে পেরেছিল। তাতে কি সমস্যা হয়েছিল?

উত্তর : আমাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ম্যাপই ছিল না। যে ম্যাপ ছিল তা ৫০ বছরের পুরনো। ম্যাপ ছাড়া কীভাবে কী করব, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন এম এ জলিলসহ অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারের কাছে ম্যাপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলাম। তাঁরা দ্রুত সংগ্রহ করলেন। শুধু বগুড়া বা অন্য কোনো একটি এলাকার ম্যাপ পাওয়া গেল না, কিন্তু তাতে অসুবিধা হয়নি। আমরা পুরো যুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের তৈরি করা ম্যাপই ব্যবহার করি।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে আপনার বৈঠকের বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের সঙ্গে আমার বৈঠক হতো। সরকার হয়তো একদিন এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন : পাকিস্তানী বাহিনীর সাঙ্কেতিক বা ওয়্যারলেস বার্তা ধরার ব্যাপারে আপনাদের সাফল্য কেমন ছিল?

উত্তর এ কাজে খুবই সফল ছিলাম। আমরা তাদের গুপ্ত বার্তার অনেকটাই ধরে ফেলতাম। এ বিভাগটি সরাসরি আমার অধীনে ছিল। পাকিস্তানী বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে আমরা আগাম ধারণা পেতাম। অনেক আক্রমণ ডিকোডিংয়ের ভিত্তিতে হয়েছে। সাগরে সাবমেরিন 'গাজি'র উপস্থিতি আমরা আগেই টের পাই। একে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : মার্কিন সপ্তম নৌবহর কি সত্যি মার্কিন নাগরিকদের নিতে এসেছিল?

উত্তর : এটা খুবই বিতর্কিত। আমি তো আত্মসমর্পণ নিয়ে ১৩-১৪ ডিসেম্বরে নিয়াজির সঙ্গে কথা বলা শুরু করি। আমরা বিদেশি নাগরিক বহনে জাতিসংঘের একটিসহ চারটি বিমান অবতরণের অনুমতি দিই। ১১ ডিসেম্বর তারা চলে যায়। সুতরাং এরপর সপ্তম নৌবহর পাঠানোর তো যুক্তি নেই। ওটা ছিল 'শো অব ফোর্স'।

প্রশ্ন আপনার বইয়ে একাত্তরের ওয়ার থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা কি মুক্তিযুদ্ধের ওপর সামগ্রিকভাবে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর অবশ্যই ফেলেছিল। অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের খুব টানাপোড়েন যাচ্ছিল। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ ছিল। সৌভাগ্যবশত তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ছিল ভালো।

প্রশ্ন : ঢাকা অভিযানের পরিকল্পনা দয়া করে খুলে বলবেন কি?

উত্তর : ভারতের সেনা সদর দপ্তর ঢাকার জন্য কোনো সেনা বরাদ্দ করেনি। কারণ, ঢাকা দখলের কোনো চিন্তাই তাঁদের ছিল না। আমি আমার লক্ষ্য অর্জনে বেছে নিই টাঙ্গাইলকে। কারণ ছিল মূলত তিনটি। প্রথমত, টাইগার সিদ্দিকীর সাহায্য পাব। তাঁর অধীনে ২০ হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তিনি তাঁর বাহিনী দিয়ে আমাদের ছত্রিসেনাদের সুরক্ষা দেবে। দ্বিতীয়ত, জায়গাটা সীমান্ত থেকে খুব দূরেও নয়। তৃতীয়ত, ঢাকার সঙ্গেও যুদ্ধের দূরত্ব বেশি নয়। আমরা উত্তর দিক থেকে ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনা করি। আমরা আশা করি, সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে ঢাকামুখী মার্চে অংশ নেবেন। ছত্রিসেনা পাঠানোর আগে আমি ক্যাপ্টেন পি কে ঘোষকে পাঠাই সিদ্দিকীকে ব্রিফ করতে। তাঁকে ঢাকা অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলি, যাতে তিনি ঢাকায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিদ্রোহ নিশ্চিত করতে পারেন। নভেম্বরে সিদ্দিকীকে এই বার্তা দেওয়া হয়। সিদ্দিকী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি কথা অনুযায়ী ছত্রিসেনা অবতরণে সহায়তা দেন। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী প্রত্যাহার শুরু করলে তিনি আক্রমণ থেকে বিরত ছিলেন।

প্রশ্ন সিদ্দিকী বাহিনীর এতো অস্ত্রশস্ত্রের জোগান আপনারাই দিয়েছিলেন? কী ধরনের অস্ত্র ছিল?

উত্তর : পুরো অস্ত্র আমরাই দিই। রাইফেল, এলএমজি, গ্রেনেড, বিস্ফোরক ছিল।

প্রশ্ন : সিদ্দিকীর ওই সিদ্ধান্ত কি সুচিন্তিত ছিল?

উত্তর আমি জানি না। তাঁকেই জিজ্ঞেস করে জানুন, পাকিস্তানীরা যখন সরে যাচ্ছিল, তখন তিনি কী করেছিলেন? আর কেন তিনি ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে ঢাকায় মুভ করেননি? যুদ্ধবিরতির পরেই কেবল তিনি তাঁর কিছু সেনা ঢাকায় পাঠান। আমি তাঁকে ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় দেখি। না, আমি কোনো বিতর্কে যেতে চাই না। তিনি আপনাদের জাতীয় বীর। আমি ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছি মাত্র। টাঙ্গাইলে যখন ছত্রিসেনা নামল, তখন তিনি ভালো ভূমিকা রাখলেন। তাদের নিরাপত্তা তাঁরই দেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তিনি সেনাদের সঙ্গে ঢাকায় মুভ করেননি। আমি সিদ্দিকীকে বুঝতে পারিনি। তিনি নিশ্চয় মহান সৈনিক।

প্রশ্ন মস্কোপন্থি ডিপি ধর একাত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান। আত্মসমর্পণের কয়েক দিন পরই আপনি তাঁকে বলেছিলেন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, ছিটমহলগুলোর যথাযথ বিন্যাস এবং চট্টগ্রাম বন্দরসহ রেল ও নৌ ট্রানজিট বিষয়ে চুক্তি করতে। তাঁকে সতর্কও করেছিলেন যে এটা এখনই না করলে ভবিষ্যতে করা খুবই দুরূহ হবে। কীভাবে এমন দূরদর্শী হতে পারলেন?

উত্তর আমি বাস্তবতার নিরিখেই কথাটা বলেছিলাম। সীমান্তের মানুষের জন্য ছিটমহলের ফাঁড়া বহুদিনের। আর ট্রানজিট তো একপক্ষীয় নয়, এটা বহুমুখী হতে পারে। বাংলাদেশ ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে নেপাল যেতে পারে। ডিপি ধর কিন্তু আমার সঙ্গে একমত হননি।

প্রশ্ন : নক্সালবাড়ি আন্দোলন কি কোনোভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব রেখেছিল?

উত্তর চারু মজুমদারের সেই আন্দোলন দমনে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৯-১৯৭২ পর্যন্ত আমি ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ছিলাম। এসময় তাদের দমনে পরিচালিত বিশেষ অভিযানের দায়িত্ব আমিই পালন করছিলাম। সরকার এজন্য আমাকে পশ্চিমবঙ্গে দুই ডিভিশন আর্মি এবং ৫০ প্যারাস্যুট ব্রিগেড মোতায়েনের অনুমতি দেয়। পরে তাদের যুদ্ধের কাজে লাগে। সৌভাগ্যবশত একাত্তরের পরিস্থিতির কাছাকাছি সময়ে ওই অভিযান শেষ করতে পেরেছিলাম। এর উল্লেখ আমার বইয়ে নেই।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে ভারত কি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্য কোনো মিত্র দেশ থেকে অস্ত্র সহায়তা পেয়েছিল?

উত্তর : না। আমরা পাইনি। স্থানীয়ভাবে যা উৎপাদিত হয়েছে, তা-ই ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন : গওহর আইয়ুব দাবি করেছেন যে, মানেকশ পয়ষট্টির যুদ্ধের ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনা পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করেছিলেন?

উত্তর গওহর যখন এই দাবি করেন, তখন মানেকশ খুবই অসুস্থ, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মানেকশ একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমি মনে করি না যে এটা আদৌ সত্য। এর কোনো ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে একমাত্র নারী ছিলেন অরোরার স্ত্রী ভান্তি অরোরা। সত্যি?

উত্তর : সত্যি। আমার কাছে তাঁর ফটো রয়েছে। তিনি মারা গেছেন।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি আপনাকে তাড়া করে ফেরে?

উত্তর তাজউদ্দীন আহমদ একজন ব্রিটিশ এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। সীমান্তের কাছাকাছি একটি স্থানে বৈঠক বসল। কিন্তু দ্রুত বিপদ টের পেলাম। গোলাগুলি চলল। বললাম, প্রধানমন্ত্রী জলদি করুন। কারণ, পাকিস্তানী সেনারা খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে এখন। আমরা তাঁদের নিরাপত্তায় আমাদের সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছিলাম। সেদিন চেকপয়েন্টের মাস্টে আমার তদারকিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ল। সে পতাকা আর নামেনি। এ স্মৃতি আমাকে মাঝেমধ্যে আবেগাপ্লুত করে।

প্রশ্ন : আপনার সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা কেমন হলো?

উত্তর : আমি আনন্দিত যে বাংলাদেশের বর্তমান সেনাবাহিনী দারুণভাবে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা অর্জন করেছে। আমি সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ ও অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঢাকায় খুব ভালো সময় কাটিয়েছি। আপনাদের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবোধ দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ।

প্রশ্ন : আপনার এই ধারণা কি নতুন?

উত্তর : বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে আগে এমন প্রত্যক্ষভাবে তো আমি জানতাম না। কিন্তু সফরকালে আমি ভীষণ সন্তুষ্ট হলাম। হাইলি প্রফেশনাল আর্মি। খুবই ভালো প্রশিক্ষিত। খুবই ভালো শৃঙ্খলাপরায়ণ। আমার অন্তরের সবটুকু উষ্ণতা দিয়ে তাদের

জানাই অভিনন্দন। সেনাবাহিনীর আতিথেয়তা আমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। সেনাপ্রধান খুবই চমৎকার মানুষ। আমি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অব্যাহত ভালো সম্পর্ক দেখতে চাই। দুই দেশের অবশ্যই উচিত হবে একত্রে কাজ করা। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। উভয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। উভয় দেশেই রয়েছে যথেষ্ট দারিদ্র। আমাদের অভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ভুলবেন না যেন আমি বাংলাদেশের একজন মহান বন্ধু। বাংলাদেশের ভীষণ অনুরাগী। দয়া করে আমার বরাতে এমন কিছুই লিখবেন না, যাতে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আমার সম্পর্কে কোনো চিড় ধরে। বাংলাদেশের জনগণ আমার একান্ত আপনজন। আমি তাদের ভালোবাসি। ঢাকা সফরকালে মুক্তিযোদ্ধারা পরম মমতায় আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। আমি জনগণের ভালোবাসায় একেবারে সিক্ত হয়ে ফিরেছি।

প্রশ্ন : পেশাদারির বিবেচনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো তুলনা করবেন কি?

উত্তর : না। আমি তো দীর্ঘদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানি না।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের মুখ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে হাতে গোনা যে কজন বেঁচে আছেন, আপনি তাঁদের একজন।

উত্তর : আমি জানি না, আমি মুখ্য ব্যক্তিদের একজন কি না। আমি আমার কাজ করেছি। কাজটা পছন্দের ছিল। সৈনিকের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

প্রশ্ন : আর এটাই আপনার সামরিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

উত্তর হ্যাঁ। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। কিন্তু এটাই আমার জীবনে অনন্য সুযোগ, যা ইতিহাসের ওপর প্রভাব রাখতে পারে। সৈনিক হিসেবে আমি আমার সর্বোত্তম সামর্থ্য ও বিবেক দিয়ে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি রাজনীতিক নই, রাজনীতির সব সমস্যা বুঝতেও পারি না। আমাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল। আমি সবচেয়ে ভালো উপায়ে তা করতে চেষ্টা করছি। ব্যস, এটুকুই।

প্রশ্ন : শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : ইন্দিরা গান্ধী সাহস ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করে গেছেন পুরো সময়। তিনি নিক্সন-কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেপথ্যে ছিলেন তিনি এবং সেই যোগ্যতা তাঁর নিরঙ্কুশভাবেই ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ইন্দিরার জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর 'ফুল ক্রেডিট' প্রাপ্য। সেটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছা। এ প্রসঙ্গে ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির কথাও বলতে হয়, যা ছিল পাকিস্তান ছাড়াও চীনের তরফে সম্ভাব্য কোনো অনিষ্টের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন কেন ইন্দিরা এমন সাহসিকতার সঙ্গে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন। আপনার মূল্যায়ন কী?

উত্তর : ইন্দিরা ছিলেন গণতান্ত্রিক নেতা। তিনি দেখলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মুজিবকে স্তব্ধ করা হয়, তাঁকে কারাগারে নেওয়া হয়। নৃশংসতা, উদ্বাস্তু স্রোত তাঁকে বিচলিত করে।

প্রশ্ন : একাত্তরে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বাংলাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ভারতের অবস্থানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়। কারণ, তাদের মাধ্যমে তারা চীনের সঙ্গে দোস্তি করার উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ছিল আমাদের মৈত্রী চুক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির বিপক্ষে ছিল। তাই তারা মৈত্রী চুক্তি করল। চীন যাতে সংঘাতে না জড়ায়। তারা জড়ালে আমাদের জন্য যুদ্ধজয় কঠিন হতো।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিজয়কে যদি আমরা কেবলই সামরিক নিরিখে দেখি, তাহলে বিশ্বের ইতিহাসে এর কি কোনো নজির আছে?

উত্তর : বাংলাদেশে কিন্তু মূলত ছিল জনগণের সংগ্রাম। আমরা কেবল তাতে সহায়তা দিয়েছি।

প্রশ্ন : অন্য কোনো নজির?

উত্তর : ভিয়েতনামেরটাও স্বাধীনতার লড়াই। মার্কিন হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে যার সূচনা। তবে সেটা ভিন্ন প্রকৃতির। বাংলাদেশে জনগণের সংগ্রাম। মুক্তিযোদ্ধারা দারুণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। আমেরিকায়ও স্বীধনতার যুদ্ধ ছিল। তারা ব্রিটিশদের উৎখাত করে। ব্রিটিশরা সাতচল্লিশে ভারত ছেড়ে যায়। আর ভারত ভাগ তো বিপর্যয় ডেকে আনে।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, ভারতে নিযুক্ত শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন বাংলাদেশের জন্ম দেখেছিলেন।

উত্তর : আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে মাত্র দুবার আমার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম দেখা, আমি তখন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। ১৯৪২ সালের আগস্টে জাহাজে চেপে বোম্বে থেকে বসরায় যাই। উত্তর ইরাকে কর্মরত ছিলাম কিছুদিন। এরপর সমুদ্রপথে করাচি হয়ে শিয়ালকোট। অতপর বার্মায়। আরাকান উপকূলীয় যুদ্ধে আমরা রামরি দ্বীপ দখল করি। এ সময় জাপানি বিমান হামলায় আমি আহত হই। আমাদের বলা হয়েছিল, আমরা মাদ্রাজে বিশ্রাম নেব। কিন্তু পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই আবার নতুন অভিযানের প্রস্তুতির নির্দেশ আসে। আমরা ভয়ানক হতাশ হই। এ সময় আমাদের নৈতিক মনোবল দেখতে এসেছিলেন লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন। দ্বিতীয়বার দেখা, ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট ব্রাগে। তখন অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয়। তিনি ভারতের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বলেন। কিন্তু দেশভাগের প্রশ্ন আসেনি।

প্রশ্ন : একাত্তরের আগে পাক সেনাবাহিনীতে আপনার অনেক বন্ধু-সহকর্মী ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, নিশ্চয়, নবম ডিভিশনের জিওসি শওকত রেজা। পরে তিনি ডিজিএমও হন। তিনি ছিলেন আমার ব্যাটারি ক্যাপ্টেন। বার্মা ক্যাম্পেইনে সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন।

প্রশ্ন : অন্য কেউ?

উত্তর : আজমত ছিলেন। সেকান্দার হয়াত।

প্রশ্ন : যুদ্ধের সময় কারও সঙ্গে কথা হয়েছিল?

উত্তর : আমি যাঁদের জানতাম তাঁদের কারও সঙ্গে কথা হয়নি। নবম ডিভিশন দুর্নাম অর্জন করেছিল। ম্যাসকারনহাস অনেক লিখেছেন।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বরের পরে কি তাঁদের কারও সঙ্গে কথা হয়েছিল?

উত্তর : না। আমার তেমন কোনো আগ্রহও ছিল না। পরে কখনো পাকিস্তানেও যাইনি। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শিয়ালকোটে ছিলাম। পাকিস্তানের স্মৃতি এতোটুকুই।

প্রশ্ন : এমন কিছু বলুন, যা আপনি আপনার বইয়ে লিখেননি।

উত্তর পাকিস্তানী একজন ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে পাকিস্তানী স্টাফ কারে চেপে আপনাদের পুরোনো এয়ারপোর্ট থেকে নিয়াজির হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি ছোড়েন।

প্রশ্ন : তার মানে 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার?'

উত্তর : অনেকটা তা-ই। (হাসি)

প্রশ্ন : এই ঘটনাটা কি বইয়ে নেই। কখনো কি প্রকাশ করেছেন?

উত্তর : না। আপনাকেই বলছি। আমি এ ঘটনা লিখিনি। কারণ, মুক্তিযোদ্ধারা তো আর আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েননি। আমিই ছিলাম পাকিস্তান আর্মির গাড়িতে। তাঁরা তা জানতেন না। গুলি আসতেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ি।

প্রশ্ন : আপনি এ ঘটনা আপনার বইয়ে একেবারেই উল্লেখ করেননি?

উত্তর : ঈষৎ ইঙ্গিত রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের সকাল সোয়া নয়টায় জেনারেল স্যাম মানেকশ আমাকে টেলিফোন করেন। বলেন, দ্রুত ঢাকায় গিয়ে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের গোছগাছ করতে। যশোরে হেলিকপ্টার বদলে ঢাকার আকাশে পৌঁছাতে দেখি একটি হেলিকপ্টার চক্কর কাটছে। টারমাকে ১৮টি পাক যুদ্ধ বিমান (পরে জেনেছি ওগুলো ছিল ভূপাতিত)। আমরা দেখলাম বিমানবিধ্বংসী কামানের নল আমাদের হেলিকপ্টারের দিকেই তাক করা। আমাদের এয়ার কমোডর ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমি পাইলটকে অবতরণের নির্দেশ দিই। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকীর সাক্ষাৎ মিলল। জাতিসংঘ প্রতিনিধি ও ফরেন প্রেস কোরও ছিল। তো আমরা নিয়াজির সদর দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে মুক্তিবাহিনী আমাদের আটকায়। তারা মেজাজে যুদ্ধমান, ভাঙচুর শুরুর জন্যও প্রস্তুত ছিল। আমি তাদের বোঝালাম, বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি রক্তপাতহীন ক্ষমতা হস্তান্তরই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আপনি বইয়ে লিখেছিলেন, ওই সময় ফরেন প্রেস ছিল। তারা কি গুলিবর্ষণের কথা জেনে গিয়েছিল।

উত্তর : না, তারা পরে এসেছিল।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বর কয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে?

উত্তর : দুপুর ১২টার দিকে।

প্রশ্ন : আপনি বইয়ে লিখেছেন, 'অন দ্য ওয়ে টু নিয়াজি'স হেডকোয়ার্টার্স, উই ওয়্যার স্টপড বাই দ্য মুক্তিবাহিনী।

উত্তর এখানে পড়তে হবে উই ওয়্যার স্টপড বাই ফায়ার (হাসি)। আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বলি, থামুন থামুন।

প্রশ্ন : আপনি কেন পাকিস্তানী আর্মির গাড়িতেই চড়েছিলেন?

উত্তর : আমরা তো কেবল হেলিকপ্টারে এসেছি। তাদের গাড়িতে না চড়ে উপায় কী? নিয়াজির হেডকোয়ার্টারে তো আমি হেঁটে যেতে পারব না।

প্রশ্ন : আপনি লিখেছেন, একাত্তরের যুদ্ধের কোনো কর্তৃপক্ষীয় বা নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ এখনো বের হয়নি। একটি সরকারি ইতিহাস প্রস্তুত করা হলেও তা প্রকাশিত হয়নি। তবে এর লেখকদেরও সংবেদনশীল দলিলাদি দেখতে দেওয়া হয়নি।

উত্তর : বাষট্টি সালের যুদ্ধের ইতিহাস, হ্যান্ডারসন রিপোর্ট আজও অপ্রকাশিত। একাত্তরের ইতিহাস নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত?

উত্তর : উচিত। কোনোভাবেই বিকৃত ইতিহাস কাম্য নয়। ট্রুথ মাস্ট কাম।

প্রশ্ন : ভারত সরকার ভাবতে পারে এ বিষয়ে এখনো স্পর্শকাতরতা রয়েছে। আপনি কি মনে করেন এটা এখন ছাপার সময়।

উত্তর : আমি তা-ই মনে করি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ডিক্লাসিফাই বা উন্মুক্ত করেছে।

উত্তর : হ্যাঁ। সবচেয়ে চমকপ্রদ লেগেছে যে আত্মসমর্পণের পরেও কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলছেন, ওয়েলডান, উই গট পাকিস্তান টু সিজ ফায়ার। এটা কোনো কথা হলো? আমেরিকানরা কিন্তু সারেন্ডার আশা করেনি।

প্রশ্ন : রাশানদের আশা কী ছিল?

উত্তর : আমি তা জানি না। তবে তারা আমাদের চাপ দিচ্ছিল যাতে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করি।

প্রশ্ন : আজ এতো বছর পরে আপনার কী মনে হয়? নিক্সন-কিসিঞ্জার কেন এভাবে মরিয়া হয়ে পাকিস্তান ও ইয়াহিয়ার পক্ষ নিল?।

উত্তর : কৃতজ্ঞতা থেকে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দোস্তির সেতুটা তৈরি করেছিল পাকিস্তান।

প্রশ্ন : এটাই কি একমাত্র কারণ ছিল?

উত্তর : আমার তাই মনে হয়। অন্য কারণ থাকতে পারে। তবে এটাই মূল কারণ।

প্রশ্ন : একাত্তরের যুদ্ধের বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো মূল্যবান দলিল রয়েছে? ব্যক্তিগত কোনো সংগ্রহশালা?

উত্তর : কোনো দলিলপত্র নেই। বইটা লিখেছি আমার ব্যক্তিগত নোট থেকে।

প্রশ্ন   আপনি কি ডায়েরি লিখতেন?

উত্তর : না, তবে নোট রেখেছি।

প্রশ্ন : সেই নোটে কি আছে? দেখতে পারি?

উত্তর : বই লেখার পর আমি তা নষ্ট করে ফেলেছি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ কিছুই নেই। হাতের লেখা খুব খারাপ। তাই নোটগুলোও রাখিনি। তাতে আমার মত ইত্যাদি লেখা ছিল।

প্রশ্ন : তাই বলে কোনো স্মৃতিই নেই।

উত্তর : কিছুই নেই। কেবল একটি চিঠি। জেনারেল গিলের। কিন্তু তা যুদ্ধের পরে লেখা। অবশ্য জেনারেল মানেকশ ৮ মার্চ ১৯৭৮ আমাকে যে একটা প্রশ্নপত্র দিয়েছিলেন সেটাও ছিল। তার মূল কপি এখন নেই। নোটের সঙ্গে কিছু কাগজপত্রও আমি নষ্ট করেছি।

প্রশ্ন : তাহলে যুদ্ধের কোনো প্রত্যক্ষ স্মৃতিই নেই?

উত্তর : তিন সপ্তাহ আগে আমি একটা ভিডিও ক্লিপ পেয়েছি। ৮ ডিসেম্বরের দিকে পাকিস্তানীরা পশ্চিমাংশে মহড়া দিচ্ছিল। তারা গুজব প্রচার করছে অমৃতসর, শ্রীনগর, জম্মু দখল করে নিয়েছে। তারা যুদ্ধে জয়ী হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও। এসব খণ্ডন করে তখন যে ব্রিফ করেছিলাম তারই একটি ভিডিও ক্লিপ।

আমাদের সিস্টেমে কোনো রেকর্ড ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার নিয়ম নেই। তাই রাখিনি। তবে আমার নোটে রাখা এমন কোনো একটি বাক্যও রাখিনি, যা বইতে লিখিনি। যুদ্ধের পরে আমি কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছিলাম, তা দেখাব না। সে চিঠিগুলো যুদ্ধবিষয়ক নয়, বন্ধুবান্ধবদের লেখা। কোনো সরকারি কিছুই আমার কাছে নেই, এটা নিশ্চিত। আমি বইতে যা দিইনি, তার চেয়ে ঢের বেশি আপনাকে বলে ফেলেছি।

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে আপনার হাতে একটি ঘড়ি দেখা গেছে। সেটি থাকলে ছবি নিতে চাই।

উত্তর হ্যাঁ, সেটি কিন্তু রক্ষিত আছে। তবে আপাতত দেখাতে পারছি না। কারণ তালাবদ্ধ।

প্রশ্ন : আপনি কেন নিয়াজিকে তার তরবারি সমর্পণ করতে বলেছিলেন?

উত্তর ইতিহাস প্রাচীন প্রথা হলো পরাজিত জেনারেল তাঁর তরবারি বিজয়ী জেনারেলের কাছে সমর্পণ করেন। নিয়াজি বললেন, আমার তরবারি নেই। বললাম, তাহলে পিস্তল দিন, তাতেই চলবে। আমি যখন তার পিস্তলটি পরীক্ষা করলাম, দেখলাম অকেজো, কতকাল পরিষ্কারই করা হয়নি। এটা নিশ্চয়ই কোনো জেনারেলের পিস্তল হতে পারে না। যাক, সমর্পণ তো প্রতিকী ছিল।

প্রশ্ন : পিস্তলটি এখন কোথায়?

উত্তর : দেরাদুনের মিলিটারি একাডেমিতে।

প্রশ্ন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর ওসমানী মহান জাতীয় নেতা ছিলেন। কোনো সমস্যা ছিল না তাঁর সঙ্গে আমার। আমি তাঁকে খুবই পছন্দ করি। কিন্তু আমরা ভাবতাম ভিন্নভাবে। কেবল ওসমানীই নন, মানেকশসহ অনেকের সঙ্গেই আমার ভাবনার বৈপরীত্য ছিল। ওসমানী আমাকে বলেছিলেন, ইস্ট বেঙ্গলকে তিনি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন হিসেবে দেখতে চান। আর সেটি পাকিস্তান আর্মির মডেলেই রাখতে আগ্রহী।

প্রশ্ন : এতে কি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর : পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল পাঞ্জাবের মতো ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। পাকিস্তান আর্মির ডিজাইনটা ছিল প্রধানত

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যই। এমনকি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকেও গড়া হয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ কোনো সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য। তাদের যেসব অস্ত্রে প্রশিক্ষিত করা হয় তার পেছনেও ছিল ওই চিন্তা। সুতরাং একাত্তরের যে সময়টাতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হয় সে জন্য তাদের একটি ভিন্ন রণকৌশল নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যাতে তারা নদীমাতৃক, ঝোপঝাড়, ধানক্ষেতবেষ্টিত বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন : কেন ওসমানী সেটা করেছিলেন?

উত্তর : অন্য কোনো কারণে নয়। তিনি যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষিত ছিলেন, তাই তিনি সেই সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকেই হয়তো ভেবেছেন। অন্য কোনো কারণ নয়। তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সেভাবেই দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তবে পাকিস্তান আর্মিকে ধানেক্ষেত, বনবাদাড় ও নদীবেষ্টিত ভূখণ্ডে যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হয়নি। তাঁরা চেনে পাঞ্জাবের ভূখণ্ড।

সেক্ষেত্রে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির আলোকে তৈরি করা প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন : তাহলে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওসমানী সাহেবের ওই চিন্তা ভুল ছিল?

উত্তর না, আমি তাঁর সামরিক পরিকল্পনার বিচার করতে পারি না। তিনি বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমি আমার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ভিন্ন মত ছিল, কেবল এটুকু বলতে পারি।

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতিকে কীভাবে দেখেন?

উত্তর : আমি নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে, এমএজি ওসমানী এবং মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খোন্দকার থাকবেন। তাছাড়া তিনি তো যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু তিনি সিলেটে গিয়েছিলেন। তাকে আনতে হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু পথে বৈরী গুলিবর্ষণে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যথাসময়ে সেটি আর মেরামত করা যায়নি।

প্রশ্ন : তিনি কি তবে সুচিন্তিভাবেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান এড়িয়েছিলেন?

উত্তর : আমি তা জানি না। আমি তাঁর উপস্থিতি একান্তভাবেই চেয়েছিলাম। সুতরাং সেটা আমাদের ভুল নয়। তাকে ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে রাখার কথা নেহাৎ অপপ্রচার। খন্দকার তো ছিলেন।

প্রশ্ন জেনারেল ওসমানী ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও সামরিক উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তাঁকে বাছাই করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা ছিল?

উত্তর : আমি জানতাম না। তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। আগেই বলেছি, আমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁর মতের গরমিল হয়। সমস্যা হয়।

প্র-্ন : আপনি যুদ্ধজয়ের জন্য মুক্তিবাহিনীকে এবং ওসমানী নিয়মিত বাহিনীকে প্রধান শক্তি বিবেচনা করেছিলেন?

উত্তর ঠিক তাই। আমি আমার সবটুকু মনোযোগ মুক্তিবাহিনীর প্রতি ঢেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন গড়তেই মনোযোগী হন। আমি তাতে কিছু

মনে করিনি। কিন্তু সমস্যা হয়, আমি মুক্তিবাহিনীর জন্য যাদের সবচেয়ে মেধাবী ও যোগ্য মনে করেছি, তিনি তাঁর বাহিনীর জন্য তাদেরকেই আশা করলেন। নিয়মিত বাহিনী গড়তে সময়ের প্রয়োজন ছিল বেশি। আমি মুক্তিবাহিনীর প্রতি খুবই আস্থাবান ছিলাম। বাংলাদেশ কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও নিয়মিত উভয় বাহিনীর জন্য গর্ব করতে পারে। কারণ তাঁরা অসামান্য ভূমিকা রাখে। তবে তুলনামূলকভাবে মুক্তিবাহিনীই নিয়মিত বাহিনীর চেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তাদের ভূমিকাটাই বড় ছিল।

প্রশ্ন : তাঁর সঙ্গে আর কি মতানৈক্য ঘটেছিল যদি একটু খুলে বলেন?

উত্তর : আমি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলে সেনা সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনায় সংকল্পবদ্ধ থাকি; কিন্তু ওসমানী তা চাননি। তিনি যুক্তি দিলেন, তাঁর জন্মস্থান সিলেট। পরিচিত এলাকা। তাই তিনি তাঁর বাহিনীকে সিলেট অঞ্চলেই মোতায়েন করতে চাইলেন। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠক হলো। আমরা একমত হতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত 'হি মুভড হিজ ফোর্সেস টু সিলেট।'

প্রশ্ন   আপনি লিখেছেন, ওসমানীর সেকেন্ড ইন কমান্ড এ কে খন্দকার উত্তম অফিসার ছিলেন।

উত্তর   জেনারেল ওসমানী যেভাবে 'রিজিড' ও 'ভেরি সেট' আইডিয়ার লোক ছিলেন, খন্দকার ছিলেন এর উল্টো। তিনি যথেষ্ট সদাশয় ছিলেন। দেখুন এ নিয়ে যেন আবার অহেতুক বিতর্ক না হয়। আবার বলছি, ওসমানী ছিলেন মহান সৈনিক। আমি যাকে তাঁর কঠোরতা বলছি, সেটাই হয়তো তাঁর বিবেচনায় সঠিক পথ ছিল। তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা তো থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি তাঁর ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে আপনি বিদেশি সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন?

উত্তর : না, সাক্ষাৎকার দিইনি। তবে তাদের অফ দ্য রেকর্ড ব্রিফ করেছিলাম। লন্ডনের সানডে টাইমস এর নিকোলাস টমলিনের প্রথম ও শেষ রিপোর্ট আমার সঙ্গে কথার ভিত্তিতেই হয়েছিল। টমলিন পরে গোলান উপত্যকা কভার করতে গিয়ে নিহত হন।

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল?

উত্তর : এক দিনই। দিনটা হয়তো ২৩ মার্চ হবে। ভারতের সেনা প্রত্যাহারের ঠিক আগে। চার-পাঁচ ঘণ্টা তাঁর কাছে ছিলাম। তাঁকে খুবই বিশ্বস্ত ও ডেডিকেটেড মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে মেঝেতে বসেছিলোম। জায়গাটা তাঁর সরকারি দপ্তর হবে। কিন্তু সেখানে কোনো চেয়ার ছিল না। ফোনের পর ফোন আসছিল। কিন্তু তার কোনো রেকর্ড রাখা হচ্ছিল না। তাঁকে পছন্দ হয়েছে। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। তাজউদ্দীনও আমার খুব পছন্দের ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি তাঁর সঙ্গে মেঝেতেই বসেছিলেন? বাড়িটা তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন?

উত্তর   হ্যাঁ। তবে জায়গাটা আমি স্মরণ করতে পারি না। তিনি সেদিন দেশের উন্নয়ন, তাঁর জনগণের কিসে কল্যাণ হবে সে বিষয় নিয়েই কথা বলেছিলেন।

প্রশ্ন : সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে কথোপকথন মনে আছে?

উত্তর : খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাধারণ আলোচনা হয়েছে। আপনি আমাকে ৩৭ বছর আগের কথা স্মরণ করতে বলছেন।

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের সঙ্গে?

উত্তর : বিশেষ কিছু মনে পড়ছে না। তবে কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। তিনি খুবই উন্নত সৈনিক ছিলেন।

প্রশ্ন : কোথায় দেখা হয়েছিল?

উত্তর : আমি যখন পূর্বাঞ্চলে সফর করছিলাম। হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে।

প্রশ্ন : কোন সালে?

উত্তর আমি অনেক ঘুরেছি। কোন মাস মনে পড়ছে না। মে থেকে জুলাইয়ের কোনো সময়। জলিলকে জানতাম। জলিল কোথায় এখন?

প্রশ্ন : তিনি মারা গেছেন। আপনি লিখেছেন, জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

উত্তর : জিয়া ২৭ মার্চে ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন : আপনি বইয়ে তারিখ এটাই লিখেছেন। আপনি নিজেও শুনেছিলেন কি?

উত্তর : আমি নিজে শুনেছি। আমরা অনেকেই শুনেছি। তবে খুব স্পষ্টভাবে শুনতে পাইনি।

প্রশ্ন আপনি লিখেছেন, আপনি মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ধারণাটা আপনার মাথায় কীভাবে এল?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জেনারেল দ্য গল স্বাধীন ফ্রেঞ্চ সরকার গঠন করেছিলেন। আমি সেই ভাবনা থেকে একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করে তাজউদ্দীনকে দিই। তাঁরা অনেক আইনবিদকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন?

উত্তর : না। ঘোষণাপত্রের আকারে একটি শর্ট ড্রাফট দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার কি দু-একটি বাক্য মনে পড়ে?

উত্তর : না (হাসি)। অনেক আগের কথা।

প্রশ্ন : তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আপনার আলোচনা–

উত্তর তিনি পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চারকণ্ঠ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চেয়েছিলেন। এটুকু আমি স্মরণ করতে পারি।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধকালে আপনি কি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো বার্তা পেয়েছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : প্রবাসী সরকার কতটা যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছিল?

উত্তর : তারা খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাজউদ্দীন মেধাবী ছিলেন। তিনি খুবই মানবিক, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও মন ছিল বিশাল। চিন্তা-ভাবনাতেও ছিলেন উদারনৈতিক। ওই সরকারের সবাই ডেডিকেটেড ছিলেন। কলকাতায় পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব আমিই কিন্তু তাজউদ্দীনকে পৌঁছে দিই। বললাম, তাঁরা পেনশন ও চাকরিজীবনের নিশ্চয়তা চান। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন তা নিশ্চিত করেন। এরপর তাঁরা এলেন।

প্রশ্ন : খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আপনার কখনো যোগাযোগ বা আলাপের সুযোগ ঘটেছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন তাত্ত্বিকভাবে ভারতীয় সেনাদের সহায়তা ছাড়া মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল?

উত্তর : খুবই হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন। আমি যেটা বলতে পারি তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল একটি যৌথ প্রচেষ্টা। ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্ভরশীল ছিল। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকার আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য উভয়ে কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন : আপনি জেনারেল মানেকশ'র পরিকল্পনা পরিহার করে ঢাকার পতন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেন এবং তাতে সফলও হন। এ কথা যখন আপনি বইয়ে প্রকাশ করেন, তখন মানেকশ'র কী প্রতিক্রিয়া ছিল। এ নিয়ে কি কোনো কথা হয়েছে আপনাদের মধ্যে?

উত্তর : আমার বইটি ১৯৯৭ সালে প্রথম বের হয়। তখন মানেকশ বেঁচে ছিলেন। তিনি কোনো বক্তব্য দেননি। কারণ, আমি যা বলেছি তা তো রেকর্ডের ভিত্তিতে। সবকিছুই সেনা সদর দপ্তরে রক্ষিত আছে।

প্রশ্ন : কেন ও কীভাবে আপনি এমন অভাবনীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন?

উত্তর : অপারেশনের মূল আদেশে টার্গেট ছিল খুলনা ও চট্টগ্রাম এবং তার ভূখণ্ড। পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা। আমি বুঝলাম, কোনো আধাখেঁচড়া বিজয় দিয়ে প্রবাসী সরকার করা যাবে না। দরকার পূর্ণ বিজয়। আর সে ধরনের বিজয় ঢাকাকে মুক্ত না করে পারা যাবে না। ঢাকা কেবল বাংলাদেশের জিওপলিটিক্যাল নয়, জিওস্ট্রাটেজিক্যাল ও জিওকালচারাল কেন্দ্রবিন্দুও বটে। সুতরাং ঢাকাকে বাদ দিয়ে কোনো যুদ্ধজয় সফল হতে পারে না। এই ভাবনা থেকেই আমি সেনা সদর দপ্তরের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করি। তা ছাড়া পুরো যুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ। নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন। কারণ, যুদ্ধবিরতি ঘাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করাই ছিল শত্রুশিবিরের কৌশল। নিরাপত্তা পরিষদে কখন কী ঘটে সে চিন্তায় আমি বহু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি। বিশেষ করে ভেটো পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা আমাকে অস্থির রাখত। আমাদের আসন্ন যুদ্ধজয় সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমরা বিশ্বকে তেমন কিছুই দেখাতে পারছিলাম না। বড় কোনো শহরই আমরা দখল করতে পারিনি।

প্রশ্ন : ঢাকাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য কোনো সমর ইতিহাস থেকে কোনো পাঠ নিয়েছিলেন কি?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বার্মা, বার্মা থেকে সুমাত্রা। সুমাত্রার আরাকানসহ আরও কয়েকটি স্থানে আমরা অবতরণ করেছিলাম। কিন্তু সবাই ছিল সাবসিডিয়ার। মূল লক্ষ্য ছিল রেঙ্গুন। বার্মাকে স্বাধীন করা। রেঙ্গুনকে দখল করা ছাড়া বার্মাকে মুক্ত করার রণকৌশল সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। জাপানি বাহিনী রেঙ্গুন থেকেই পুরো বার্মা নিয়ন্ত্রণ করছিল। তো আমি ওই পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা

করলাম। ওই অবস্থা শতভাগ অভিন্ন নয়, তবে মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল অভিন্ন। আমি বুঝলাম খুলনার মতো কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পুরো দখল করে নিতে পারলেও তা খুব কাজে দিত না।

প্রশ্ন তবে জেনারেল মানেকশ তথা ভারতের সেনা সদর দপ্তরের পরিকল্পনায়ও নিশ্চয় একটা কৌশলগত যুক্তি ছিল।

উত্তর : ঠিক আছে, আমাকে বলতে দিন। আমি পাকিস্তানী বাহিনীর রণকৌশল খতিয়ে দেখলাম। তারা ভূখণ্ড রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত ছিল, এক ইঞ্চি ছাড়বে না, যা ছিল মূর্খতা। শহরগুলোকে রক্ষায় তারা ছিল ভীষণ ব্যাকুল। নিয়াজি যদি নদী পারাপারের স্থানগুলোতে পাহারা বাসাতেন, তাহলে আমাদের খুব দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

প্রশ্ন : সি এন বি সি প্রচারিত সাক্ষাৎকারে আপনি ফিল্ড মার্শাল মানেকশ'র মূল্যায়নে ভারত সরকারের রক্ষণশীলতা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। আপনার প্রতি সরকার কতটা সদয় হয়েছিল?

উত্তর : আমি একজন সৈনিক। সৈনিক হিসেবে আমি বিধিবিধানের বাইরে একচুলও নড়তে চাই না। সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে আচরণবিধি মানতে হবে। তাই আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। ভারতীয় সেনাবাহিনী অরাজনৈতিক।

প্রশ্ন : আপনি কি বিশেষ কোনো ভাতা বা আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন?

উত্তর : ৩৭ বছর সেনাবাহিনীতে কাটানোর পর মাসে এক হাজার ১০০ রুপি করে পেনশন ভাতা পেতে শুরু করি। মানেকশ সেনাপ্রধান ছিলেন। তাই পেতেন এক হাজার ৩০০ রুপি। এটা নিশ্চয় 'জেনারাস নয়' (হাসি)। সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র বেতনে চাকরি করেন। পেনশনও পান সেভাবে। তবে নতুন পে কমিশন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবমুক্ত হওয়া পেন্টাগন দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, একাত্তরের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রুশ-মার্কিন আলোচনা চলছিল কী করে পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায়।

উত্তর : যুদ্ধের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে আমি বলতে পারব না; যদিও মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংয়ের সঙ্গে আমার একাধিক বৈঠক হয়েছিল।

প্রশ্ন : যুদ্ধকালে কতবার কিটিং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?

উত্তর : দু'বার। তিনি কলকাতাতেই আসেন।

প্রশ্ন : কী ছিল আপনাদের আলোচনার বিষয় এবং এর ফলাফল?

উত্তর : কিটিংকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম , নিক্সন-কিসিঞ্জার কেন অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন দিচ্ছেন, যারা বাংলাদেশের জনগণের ওপর নৃশংসতা চালাচ্ছে? ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকের দিন আর্মি কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন। আমিই তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আমার মনে আছে, আমার প্রশ্নের জবাবে কিটিংয়ের সংবেদনশীল মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হলো। তবে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ কিংবা তাঁর সরকারের সমর্থনে কোনো বক্তব্য দেননি।

প্রশ্ন : কিটিং কোনো বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন?

উত্তর : না। কোনো বার্তাও বয়ে আনেননি।

প্রশ্ন : একাত্তরে সিনিয়র বুশ জাতিসংঘে ভারতকে আগ্রাসী শক্তি বলেছিল। এখন আপনি জীবদ্দশায় দেখলেন জুনিয়র বুশ পরমাণু চুক্তি করে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেমন লাগছে আপনার?

উত্তর : আমি আপনার সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছি। পরমাণু বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি এক সাধারণ সৈনিক। আমি যা জানি না, সে বিষয়ে কথা বলতে চাই না।

প্রশ্ন : পশ্চিম পাকিস্তান জয়ের কি কোনো লক্ষ্য ছিল? অবমুক্ত করা কোনো দলিল থেকে এমন আলামত মিলছে?

উত্তর : না। কোনো পরিকল্পনা ছিল না। পশ্চিম ফ্রন্টে সেনা মোতায়েন দরকার ছিল। আমি এখান থেকে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলাম।

প্রশ্ন : বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনে–

উত্তর : পশ্চিম পাকিস্তানকে ধ্বংসের কোনো উদ্দেশ্যই আমাদের ছিল না। 'ইট ওয়াজ এ লোকাল ওয়ার'।

প্রশ্ন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের করায়ত্ত করে নেওয়া প্রসঙ্গও তাতে দেখছি–

উত্তর : না। কোনো আলোচনাই হয়নি। আমি কখনো এমন আলোচনায় যোগ দেইনি।

প্রশ্ন এমন ইঙ্গিতের স্বপক্ষেও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ডিক্লাসিফাইড (উন্মুক্ত) দলিল রয়েছে–

উত্তর : আমি জানি, এ রকম কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। আমি বরং আপনাকে তাজউদ্দীনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার কথা বলতে পারি। দ্য গল কী করে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন, তা আমি তাঁকে বললাম। তিনিই আমাকে একটি খসড়া দিতে বললেন। আমি তো আইনের লোক ছিলাম না। কয়েকটি পয়েন্ট মুসাবিদা করে দিলাম।

প্রশ্ন : রাজাকার, আলবদরদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : তারা তো আপনাদেরই লোক। আপনারাই ভালো জানবেন তাদের সম্পর্কে। আপনারাই তাদের সম্পর্কে ভালো বিচার করার অবস্থানে রয়েছেন।

প্রশ্ন : না। আপনাকে বিতর্কে টানছি না। জানতে চাচ্ছিলাম রাজাকাররা কীভাবে রণাঙ্গনে আপনাদের জন্য প্রতিকূলতা তৈরি করেছিল।

উত্তর : হ্যাঁ। তারা যশোরসহ বহুস্থানে আমাদের অগ্রযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে। তারা অনেককে হত্যা করেছে। আমরা যশোর এলাকা থেকে মাগুরা অভিমুখে একদল সেনা পাঠিয়েছিলাম। ৭ বা ৮ ডিসেম্বর। রাজাকাররা পথিমধ্যে বাধা দেয়। সেই সংঘর্ষে আমরা একজন সিও ও বেশ কিছু সংখ্যক সেনা হারাই। একজন লে. কর্নেলসহ ১৩-১৪ জন প্রাণ হারায়।

প্রশ্ন : তারা নিহত হয় কি কেবল রাজাকারদের হাতেই, নাকি পাকসেনারা সহায়তা দিয়েছিল?

উত্তর : না। এ ঘটনায় কেবল রাজাকাররাই ছিল।

প্রশ্ন : দেশের অন্যত্র?

উত্তর : চট্টগ্রামসহ আরও অনেক স্থানে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে রাজাকারদের যুদ্ধ হয়েছে। একইভাবে তারা আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও লড়েছে।

প্রশ্ন : কতজন ভারতীয় সেনা প্রাণ হারায়?

উত্তর এক হাজার ৪২১ নিহত এবং চার হাজার ৫৮ জন আহত হয়। তিনজন জেসিও এবং ৫৩ জন ওআর আজও নিখোঁজ রয়েছেন।

প্রশ্ন : ঢাকার পতন নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনার সম্পর্কে মানেকশ'র মন্তব্য কী ছিল?

উত্তর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো আলোচনা হয়নি। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

প্রশ্ন : তিনি কি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন?

উত্তর আমি জানি না, তিনি আমাদের প্রশংসা করেছিলেন কি করেননি।

প্রশ্ন : তিনি কি আপনার বই সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেছিলেন?

উত্তর : না। কখনোই নয়।

প্রশ্ন আপনার যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহলের মূল্যায়ন কেমন?

উত্তর : তা আমার জানা নাই। আমার কাজ আমি করেছি। একাত্তরে রণাঙ্গনে আমি আমার সর্বোত্তম সামর্থ্য অনুযায়ী তা করেছি। যত দূর সম্ভব বিবেক দ্বারা পরিচালিত হতে চেয়েছি। আমি আমার কাজের বিচার করতে পারি না, এটা অন্যের কাজ।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের শেষ মুহূর্তগুলো একটু স্মরণ করুন।

উত্তর যখন আমি নিয়াজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেন, কে বলেছে যে আমি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। আমি এসেছি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে। তাঁর অধীনে ২৬ হাজার ৪০০ সেনা তখন ঢাকায়। ঢাকার দক্ষিণে আমাদের সেনাসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। হামদুর রহমান কমিশন নিয়াজিকে এ প্রশ্ন করেছিল যে ২৬ হাজার সেনা যখন ঢাকায়, তখন তারা আরও কয়েক সপ্তাহ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত। তখন জাতিসংঘের অধিবেশনও চলছে। ভারতীয় সেনাদের ফিরে যেতে বাধ্য করার একটা সম্ভাবনা ছিল। তাহলে তারা কেন জনসম্মুখে মানমর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে লজ্জাজনকভাবে আত্মসমর্পণ করল? এমনকি তাদের গার্ড অব অনার পর্যন্ত দিতে হলো? নিয়াজি উত্তর দিয়েছেন, 'জেনারেল জ্যাকব আমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন।' তিনি তাঁর বইয়েও তা লিখেছেন। আরও বলেছেন, তাদেরকে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি। এসবই অসত্য, রাবিশ। আমি নিয়াজিকে ব্ল্যাকমেইল করিনি। এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়া কীভাবে তৈরি হলো?

উত্তর : আমার নিজের হাতেই টাইপ করা। আমি ১৩ ডিসেম্বরে যখন নিয়াজির সঙ্গে কথা বলা শুরু করি, তখনো আমার সরকারের তরফে কোনো কনফারমেশন ছিল না। আমি নিজেই উদ্যোগী ছিলাম।

প্রশ্ন : আইনগত দিক কীভাবে খতিয়ে দেখেছিলেন?

উত্তর : আমি বিশেষজ্ঞ ছিলাম না। কিন্তু ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছি। যেটা চূড়ান্ত হয়ে এল, সেটা আসলে আমারই, কেবল হেডিংটায় ভুল ছিল। খসড়াটি আমি দিল্লি পাঠাই।

প্রশ্ন : রেসকোর্স কেন বেছে নিলেন?

উত্তর : আমি তাঁকে বললাম, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে রেসকোর্স ময়দানে, জনতার সামনে। নিয়াজি বললেন, না। আমার অফিসে হবে। আমি বললাম, না, ওখানেই হবে। ঢাকার মানুষ উপস্থিত থাকবে। কারণ, তাঁরাই বড় বেশি নির্যাতন ও নৃশংসতার শিকার হয়েছে। রেসকোর্সের সেই আত্মসমর্পণই ইতিহাসের একমাত্র পাবলিক সারেন্ডার।

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণের দলিল চূড়ান্তভাবে কলকাতায় সই হয়েছিল?

উত্তরঃ আত্মসমর্পণের যে দলিলটি কলকাতা থেকে টাইপ করে আরোরা বয়ে আনেন, তাতে কিছু ভুলক্রটি ছিল। দুই সপ্তাহ পরে কলকাতায় সেটি দ্বিতীয় বারের মতো সই হয়েছিল। চুক্তির হেডিংয়ে ভুল ছিল, লেখা ছিল আত্মসমর্পণের দলিল সই হবে ১৫৩১ (বিকেল ৩.৩১) মিনিটে।

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণের দলিলে লেখা এমন কোনো শব্দ বা বাক্যের কথা আপনার মনে পড়ে, যা পাকিস্তানীদের অনুরোধে সংযোজন করা হয়েছিল?

উত্তর না। জেনারেল রাও ফরমান আলী বরং চূড়ান্ত দলিল দেখে বললেন, কে বলেছে, আমরা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ কমান্ডের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণের কোনো প্রশ্নই আসে না। বললাম, আমি আপনাদের কাছে যে খসড়া দিয়েছিলাম, তাতে জয়েন্ট কমান্ডই লেখা ছিল। আমি নিয়াজিকে বললাম, এর চেয়ে ভালো শর্ত দিতে আমরা অপারগ। আপনাকে ৩০ মিনিট সময় দিলাম। হয় আপনারা এটা মেনে নিন, অন্যথায় আবার শুরু হতে পারে সংঘাত। তখন ঢাকায় তাদের ২৬ হাজার সেনা। আর ৩০ মাইল দূরে আমাদের তিন হাজার সেনা অপেক্ষমাণ।

প্রশ্ন : আপনার জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্ত কোনটি?

উত্তর : বেলা পৌনে দুটো। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। স্থান নিয়াজির অফিস। যখন আমি নিয়াজির টেবিল থেকে আত্মসমর্পণের দলিলটি হাতে তুলে নেই এবং কবরের নৈঃশব্দ ভেঙ্গে বলি, 'আই টেক ইট এ্যাজ একসেপ্টেড।' অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি, পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করল।

প্রশ্ন : আরেকটু বিস্তারিত বলুন।

উত্তর নিয়াজির সামনে যখন দলিলটি দিলাম তখন মনে হলো তিনি তা নাকচ করছেন। আমাকে বলছেন, হোয়াট ডু আই ডু? ২৬,৪০০ পাকিস্তানী সৈন্য তখন ঢাকায়। আর ঢাকার অদূরে আমাদের মাত্র ৩০০০ সৈন্য। আর নিয়াজি কিনা বলছেন, হোয়াট ডু আই ডু? এর উত্তর তো আমার জানা ছিল না। তাঁকে ৩০ মিনিট সময় দিলাম। আমি ঘড়ি

দেখছি। পায়চারি করছি। চাপা উত্তেজনায় টগবগিয়ে ফুটছি। তাঁকে বললাম, জেনারেল, এই টেবিলেই সই হবে। আপনি কি মেনে নিলেন? এই দলিল কি গ্রহণ করলেন? নিয়াজি কোনো জবাব দিলেন না। একাদিক্রমে তিনবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নিরুত্তর থাকলেন। হ্যাঁ বা না কোনো ধ্বনিই উচ্চারিত হলো না। তারপরই ঘনিয়ে এল সেই মুহূর্ত। কাগজটি তুলে নিয়ে আচমকা উচ্চারণ করি আই টেক ইট অ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড। আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি এটা গ্রহণ করেছেন। আমি অস্ফুটে বলে উঠি, থ্যাংক ইউ গড। মনে মনে প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। গড বা আল্লাহ যাই বলি, গড ইজ গড। তিনি আছেন। তিনি নিশ্চয় বাংলাদেশের জনগণের প্রতি করুণাবর্ষণ করছেন। এরপর আমি পাবলিক সারেন্ডার, গার্ড অব অনার ইত্যাদির জন্য চাপ দেওয়া শুরু করি।

প্রশ্ন : নিয়াজি যে কলমটি দিয়ে সই করেন সেটি কার ছিল?

উত্তর : আমার ধারণা কলমটি আরোরার ছিল।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান পরিকল্পনার নায়ক ছিলেন আপনিই?

উত্তর তা জানি না। তবে ঢাকার পতনের পরিকল্পনা আমার। আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়া আমার তৈরি। স্থান নির্বাচন করেছি আমি। গার্ড অব অনারও হয়েছে আমার নিজস্ব পরিকল্পনায়। বহু পরে ভেবে দেখেছি, আশ্চর্য, আমার পরিকল্পনায় কোনো ভুল ছিল না। জাতিসংঘের আওতায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে আমি রূপান্তর করেছিলাম পাবলিক সারেন্ডারে।

প্রশ্ন : পাক যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবাসন ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ১৪ দিন পর আমি ফোর্ট উইলিয়ামে ফিরি। আমি তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। পাক জেনারেলদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ আমি দিল্লিতে পাঠাই।

প্রশ্ন : তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর : প্রত্যেকের একটি অভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছিল– আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নেব।

প্রশ্ন : যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁদের বিচার না হওয়ার বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : দেখুন, আমি আইনজীবী নই। বিচারের প্রশ্নটি ছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার। এ ব্যাপারে যত দলিলপত্র তা সবই ছিল বাংলাদেশের হাতে। আমাদের কাছে পাকিস্তানীদের নৃশংসতার বিষয়ে রিপোর্ট ছিল, রেকর্ড ছিল না। আপনাদের ভালো আইনজীবীও ছিল। তবে একাত্তরে ডিসেম্বরের বিজয়ের পরপরই আমাকে কাশ্মিরে বদলি করা হয়। এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিজয়ের ৩৮ তম বার্ষিকীতে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : আমি একটি আবেদন জানাই। ভারত ও বাংলাদেশের অভিন্ন সমস্যা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই একযোগে কাজ করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে আমরা বাংলাদেশের প্রতি একদিকে নিরাপত্তার জন্য নির্ভরশীল। দারিদ্র্যের পরে এখন আমাদের অভিন্ন শত্রু হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় উভয় দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গোপন নথি ও দলিল-এর জানা-অজানা কিছু অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পাকিস্তান-এর একাত্তর সংশ্লিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক গোপন নথি ও দলিলের জানা-অজানা অধ্যায়।

বাংলাদেশের বিজয় দরজায় কড়া নাড়ে

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের এই দিনে বাংলাদেশের বিজয় দরজায় কড়া নাড়ছে। অথচ পাকিস্তান সরকার রাজাকার সমর্থিত অখণ্ডতা রক্ষার প্রচারণায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র নিজেরা নিশ্চিত যে, মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলেও পাকিস্তান পরাজিত হবে। কিন্তু মিত্র পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষায় তারা প্রকাশ্যে নানা তৎপরতা প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ছিল স্নায়ুযুদ্ধ যুগের জটিল সমীকরণে বিভক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা ও কনফেডারেশন গঠনে নিক্সন-কিসিঞ্জার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেন। এদিন কিসিঞ্জার তার সহকর্মীদের কাছে জানতে চান ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে জবাব মিলেছে কি না? তাকে বলা হয়, শুধু ইন্দিরা নয়, সোভিয়েত নেতা কসিগিনের কাছে দেওয়া পত্রেরও কোনো উত্তর নেই।

এদিন জাতিসংঘ থেকে দি গার্ডিয়ানের সংবাদদাতা ম্যালকম ডিন প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়, ১৬ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু জাতিসংঘের ১৩১ টি সদস্য দেশের একটিও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমানে জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত। মার্চে হত্যাযজ্ঞ শুরুর পর তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মুক্তিবাহিনী এ দিন কুষ্টিয়ার দর্শনা ও সিলেটের শমশেরনগর আক্রমণ করে। ছাতকে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি নিহত হয়। পাকসেনাদের পক্ষে এই যুদ্ধে লিপ্ত ৬৫ জন রাজাকারও খতম হয়।

আবদুস সালাম সম্পাদিত পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় এদিন পাঁচ কলামজুড়ে শিরোনাম ছিল 'শুধু সিলেটেই ১৬৮ জন ভারতীয় নিহত। ২৮টি স্থানে গুলিবর্ষণ ও হামলা' প্রথম পাতায় দুই কলামজুড়ে প্রকাশিত ছবির ক্যাপশন 'নিহত ভারতীয় সৈন্যদের কাছ

থেকে উদ্ধারকৃত গোলাবরুদ ও ব্যাজ প্রত্যক্ষ করছেন একদল বিদেশী সাংবাদিক।' ৩ ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত পাক প্রচারণার অন্যতম লক্ষ্য ছিল পূর্ববাংলায় ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি প্রমাণ করা।

রাওয়ালপিণ্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র আজ ঘোষণা করেন, মুজিবের বিচার শেষ হয়নি। রয়টারের এক রিপোর্ট : 'ওয়াশিংটনে সরকারি মুখপাত চার্লস ব্রে ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রমের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে দেওয়া অস্ত্রের ছাড়পত্র স্থগিত করেছে। গত মাসে পাকিস্তানকে প্রদত্ত খুচরা যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত সব ছাড়পত্র স্থগিতের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিবিসির সংবাদদাতা রোনাল্ড রবহন যশোরে গুলিবিদ্ধ একজন ভারতীয় সেকশন কমান্ডারের সাক্ষাৎ পান এবং পাকিস্তানীদের হেফাজতে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট আজ জানিয়ে দিয়েছেন ইয়াহিয়ার অনুরোধ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে পর্যবেক্ষক পাঠাতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের আগাম আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন অপরিহার্য। রাওয়ালপিণ্ডিতে আজ এক সরকারি মুখপাত্র দাবি করেন বিভিন্ন স্থানে আজকের সংঘর্ষে ১৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। শিয়ালকোটে ভারতীয় বিমানের আকশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগও আনে তারা। ভারত তা নাকচ করে দেয়। ওই মুখপাত্র বলেন, নবনিযুক্ত রাজাকাররা এক নিবেদিতপ্রাণ শক্তি। তারা সুপ্রশিক্ষিত ও আত্মনিবেদিত। ঢাকার কাছে তারা এক অভিযানে ১১ জন শত্রুসেনা খতম করেছে।

হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে উল্লেখ করা হয়, বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ভারত যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে ইয়াহিয়া পরাজয় নিশ্চিত জেনেও ভারতীয় বিমান ও সৈন্যদের অবস্থানে হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। লক্ষণীয়, এই বৈঠকে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ ও সিআইএ দপ্তর নিশ্চিত করে যে, দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত হলে তার নিষ্পত্তি এক মাসের মধ্যেই ঘটবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই গোলাবারুদের ব্যবহার সঙ্কুচিত করেছে, বিশেষ অনুমতি ছাড়া টিউবপ্রতি মাত্র ১০ রাউণ্ড কার্তুজ বিলি করা হচ্ছে। সীমান্তে ভারতের চাপ বৃদ্ধির কারণে পাকিস্তানীরা রক্ষণশীল হয়ে পড়ছে। আর এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা অবাধে বিচরণ করতে পারছে। এদিন নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টেও এ তথ্য দেওয়া হয়। ওই বৈঠকে অ্যাডমিরাল মুরার মন্তব্য করেন, পাকিস্তানীরা কার্যত পিছু হটছে। যশোরকে হারিয়ে তারা মারাত্মকভাবে নিজেদের পঙ্গু ভাবছে। সিআইএর লে. জেনারেল কুশম্যান বলেন, কারো অনুমান ভারতীয়রা যশোর করায়ত্তের চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য সেখানে বাংলাদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা।

বৈঠকে তথ্য দেওয়া হয় যে, পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানে উদ্যোগী হচ্ছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ভুট্টোর জন্য একটি ভাষণের খসড়া লিখতে বলা হয়েছে। চীন পাকিস্তানকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণযোগ্য যেকোনো প্রস্তাবে তারা ভেটো দেবে। তবে তারা এটাও জানে যে, ভারতের অপছন্দের কোনো প্রস্তাবেও ভেটো দেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সব শুনে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন– একটি অনিবার্য সামরিক পরিস্থিতিতেও নিরাপত্তা পরিষদ যেখানে বৈঠকে বসতে কুণ্ঠিত, সেখানে

জাতিসংঘে কেউ এ নিয়ে প্রস্তাব আনতে ভরসা না পাওয়াই স্বাভাবিক। কুশম্যান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা ক্রমবর্ধমান।

এদিকে পিপিআই-এর এক রিপোর্টে বলা হয়, পিকিং বলেছে মস্কো আগুনে ঘি ঢালছে। পাকিস্তান অবজারভার উইকলি ফ্রন্টিয়ার অব ক্যালকাটার রাজনৈতিক সংবাদদাতা কর্তৃক ২৩ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত একটা নিবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশ পুনঃমুদ্রিত করে। এতে বলা হয়, প্রত্যেকেই যুদ্ধের কথা বলছে। যেন এর মাধ্যমেই তথাকথিত বাংলাদেশ সমস্যা চিরকালের জন্য সুরাহা হবে। আসলে জেনারেল ইয়াহিয়া যুদ্ধ ছাড়া পূর্ববাংলা হাতছাড়া হওয়া হজম করতে অপারগ। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লি লাসকেজের একটি রিপোর্টের বরাতে অবজারভার লিখেছে, আখাউড়া ডেটলাইনে এই সংবাদদাতা খবর দিয়েছেন যে, এক পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার তাকে বলেছেন, তারা যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই গ্রামবাসী স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে স্লোগান— পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

করাচি ডেটলাইনে আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, চীনের মন্ত্রী লি শুই-চিং ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠককালে 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধে জনগণের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দেখে অভিভূত।' ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় মার্কিন কলামিস্ট জোশেফ আলসোপের বরাতে পাকিস্তান অবজারভার জানায়, প্রমাণ না থাকলেও এমন ইঙ্গিত মিলছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে আগে-ভাগেই ভারত সব রকম সহযোগিতা দিতে নিশ্চয়তা দিয়েছিল।' পূর্ব পাকিস্তানে হামলা শুরুর আগেই পশ্চিবঙ্গ সীমান্তে ভারতের ৬ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে এই পদক্ষেপ নেওয়ার অজুহাত ছিল পশ্চিমবঙ্গের নিরস্ত্র বামপন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করা। ওই মার্কিন নিবন্ধকারের মতে, পাকিস্তানকে আংশিকভাবে ধ্বংস করার সম্ভাব্য ফল হচ্ছে, ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে একজন মানুষকে লাথি মারা। আর সুদূরপ্রসারী রণকৌশলগত তাৎপর্য হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ভারতকে উল্লেখযোগ্য সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা। আন্দামান দ্বীপ ও বম্বে হবে সোভিয়েতের নৌঘাঁটি।

রাওয়ালপিন্ডিতে গোলাম আযম পিপিআইকে বলেন, 'মনে হয় যেন ইন্দিরা শেখ মুজিবের কৌসুলি হিসেবে কাজ করছেন। যদি কিছুসংখ্যক আওয়ামী লীগার ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ ইন্দিরাকে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে। যখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সমাধান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির কথা বলেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় অবিলম্বে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা উচিত। (ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১)

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স আজ দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে প্রেরিত এক টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করেন, ভারতীয় বাহিনী ক্রমেই পাকিস্তানী ভূখণ্ডে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। আর সে কারণেই ভারতের কাছে আমাদের অস্ত্র বিক্রির নীতি নিয়ে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন। পূর্ব পাকিস্তানে সমস্যা সৃষ্টির সূচনায় আমরা পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি সীমিত করি এবং শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন ভারতের বিরুদ্ধেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। প্রায় ২০ লাখ ডলারের একটি ক্রয় চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে সাড়ে ১১ মিলিয়ন ডলারের অবশিষ্ট লাইসেন্সের বৈধতা বহাল থাকবে। আজই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। এবং আশা করা যায় ভারতে এর প্রতিক্রিয়া হবে তীব্র। রজার্স রাষ্ট্রদূতকে লিখেছেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আপনি এটা জানিয়ে দেবেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও আমেরিকান জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সুরাহা হবে না।

আজ ওয়াশিংটন সময় বিকেল ৪টা ১৭ থেকে ৪টা ৫০ মি. পর্যন্ত কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্পেশাল গ্রুপের ওই বৈঠকে সিআইএ'র লে. জে. রবার্ট ই. কুশম্যান অবহিত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেও ভারতীয় শক্তির কাছে পাকিস্তান দুর্বল। তাদের অধিকাংশ ডিভিশনই অবশ্য সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘাত হলে তারা ভারতের সঙ্গে টিকবে না। তাদের হাতে বড়জোর ৩০ দিনের রসদ আছে। জেনারেল নিয়াজি আজ সিলেটের এক সমাবেশে বলেন, আমরা সবসময় সংখ্যায় কম ছিলাম। কিন্তু আমাদের ইতিহাস হচ্ছে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া। আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাব।

চীনের ভূমিকায় কিসিঞ্জারের সংশয়

২ ডিসেম্বর ১৯৭১। মার্ক টালি সম্পাদিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'আজ পাক সামরিক সূত্র ৫১৫ গুর্খা রেজিমেন্টের দুই ভারতীয় সৈন্যর শনাক্তকরণ নম্বরসহ আলোকচিত্র প্রকাশ করে। এই দুই সৈন্য পাকিস্তানী ভূখণ্ড জৈন্তাপুরে নিহত হন। বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সম্পৃক্ততা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই এ উদ্যোগ। গত ২৪ ঘণ্টায় বিদ্রোহীরা, সরকারি মতে দুর্বৃত্তরা রাজধানীর বিভিন্ন অংশে পাঁচটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। একটি বামপন্থি দলের দপ্তরে একটি বোমা ফাটে, যখন দক্ষিণপন্থি নেতা প্রফেসর গোলাম আযম ইঙ্গিত দেন, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হতে পারে। এতে ভুট্টো থাকবেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন জয় করতে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে।

কিসিঞ্জার আজ প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, "জনশক্তি ও রসদ সরবরাহে ভারতের তুলনায় বহুগুণ বেশি পিছিয়ে থাকা পাকিস্তানী বাহিনী ক্রমেই পিছু হটছে। তারা ভারতীয় বাহিনীর চাপের মুখে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাদেশিক শহর হাতছাড়া করেছে। গেরিলারা দেশের অভ্যন্তরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে। তারা অবাধে ঘুরছে। পাকসেনাদের এখন মূলত সীমান্ত মোকাবিলায় জড়ো করা হচ্ছে। বহু শহরে বাংলাদেশী পতাকা উড়ছে, এমনকি ঢাকা থেকে ১৭ মাইল দূরবর্তী শহরের নিয়ন্ত্রণভারও গেরিলাদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজ চলাচল রোধে নিজেদের বাহিনীর অংশগ্রহণে ভারতীয়রা 'মুক্তিবাহিনী নেভি' গঠন করেছে। জাতিসংঘে আপাতত স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। জাপান ও বেলজিয়াম নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানে আগ্রহ হারিয়েছে। সোভিয়েত ও ভারতীয়রা এ মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় থেকে নিজেদের পন্থা খুঁজছে। জাতিসংঘে পাক রাষ্ট্রদূত অবশ্য ভাবছেন ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানে পিণ্ডির কাছ থেকে তিনি নির্দেশ পেতে পারেন।"

টোকিও ডেটলাইনে রয়টার্স বলেছে, জাপান সরকার ২৭ নভেম্বর মিসেস গান্ধীর একটি চিঠি পেয়েছে। চিঠিতে বিরোধ মীমাংসার জন্য জাপানি সহযোগিতা চাওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের প্রস্তাবও নাকচ করা হয়েছে। জাপান সরকার মনে করে, পাক-ভারত সংঘর্ষে টোকিও বৃহৎ শক্তিবর্গের মতো গভীরভাবে জড়িত না থাকায় তার পক্ষে সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া সহজ হবে।

লক্ষণীয় যে, কিসিঞ্জার চীনের ভূমিকা সম্পর্কে নিক্সনকে আজ সতর্ক করে দেন। তিনি মন্তব করেন, গত দশ দিনে চীনা গণমাধ্যমে পাক-ভারত সংকট ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। ভারতীয় তৎপরতাকে 'আগ্রাসন' এবং 'উসকানি' হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। সোভিয়েত সম্পৃক্ততাকে সরাসরি টার্গেট করা হচ্ছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সংকটকে তার নিরাপত্তার জন্য কোনো হুমকি বিবেচনার বিষয়টি তুলে ধরছে না। কিসিঞ্জারের কথায় পাকিস্তানের প্রতি চীনা প্রকাশ্য সমর্থনের বিষয়টি এখনো সাধারণই রয়ে গেছে। এমনকি অন্তত একবার তারা পরোক্ষভাবে এ ইঙ্গিতও দিয়েছে যে, পাকিস্তানের সহায়তার কোনো দরকার নেই। তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ 'আলাপ আলোচনা' চাইছে।

রয়টার্স এদিনই পিকিং ডেটলাইনে খবর দেয়, চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন নিয়েন এক অনুষ্ঠানে পাক-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ শুরুর জন্য দিল্লি ও মস্কোর কঠোর সমালোচনা করেন। এ সময় ভারতের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিশ্র ও ভারতীয় সামরিক অ্যাটাচে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে বলেন, আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তা-ই করব। বিপুল-সংখ্যক সিনেটর, বিদেশী মন্ত্রী প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘুরে গেছেন। কিন্তু তা কি বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে? এসব বৃহৎ জাতি গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের প্রতি কি আহবান জানিয়েছে? না, তারা তা করবে না। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ খণ্ডন করে গান্ধী বলেন, তাদের জন্য উপযুক্ত মনে হলে তারা কিন্তু অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। চীনের মতো দেশও অন্য জাতির বিষয়ে নাক গলিয়েছে। বলা হচ্ছে, আমরা ভারতের মাটি মুক্তিবাহিনীকে ব্যবহার করতে দিয়েছি। আমরা কীভাবে এটা প্রতিরোধ করব। পূর্ব বাংলার সঙ্গে ভারতের সীমান্ত এতই দীর্ঘ যে, পুরো সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেও তাদের রোধ করা সম্ভব হবে না। জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে তারা মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু তারা কি ভুলে গেছেন, সব বিধিনিষেধের দেয়াল ভিয়েতনামের গেরিলারা ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। তিনি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'দেহ-বর্ণের গর্বে তিন হাজার মাইল দূরে বসে ভারতকে তার ইচ্ছেমতো কাজ করার হুকুম চালানোর দিন আর নেই। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতকে আক্রমণকারী বলে ব্রিটেন ভুল করেছিল।'

ডেইলি টেলিগ্রাফে ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ ঢাকা থেকে লিখেছেন– মনে হচ্ছে, ভারতীয় কোনো অভিযানেই এ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের (৬০০ থেকে ৮০০) সৈন্য অংশ নেয়নি। অধিকাংশ অভিযানেই শুধু এক কোম্পানি (১২০ জন) সৈন্য অংশ নিয়েছে। ভারতীয়রা রংপুরের কাছে গতকালই ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে । লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফে

কলকাতা ডেটলাইনে ডেভিড লোশক লিখেছেন, ভারতীয় হাইকমান্ডের পরিকল্পনা হলো, যদি একবার যশোরকে মুক্ত করা যায় তাহলে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এপিপির এক রিপোর্টে বলা হয়, আম্মানের দুটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক আল-রাই ও আল দোস্তর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় হামলার কঠোর নিন্দা করেছে।

ইন্দিরা গান্ধীর অভিযোগের জবাবে ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসে পাকিস্তান অভিযোগ করে, কাশ্মির সীমান্তে ভারতীয় বিমানবাহিনী আগ্রাসীভাবে তৎপরতা চালিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশসীমায় তিন-চার দিনের তৎপরতার পর আজ বিভিন্ন চৌকিতে হামলা চালায়। এদিন পাক মুখপাত্র ভারতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি স্থগিতের মার্কিন সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের প্রশংসনীয় পরিবর্তন হিসেবে উল্লেখ করেন। পিন্ডিতে সফররত মার্কিন সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবে মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানালেও তা রক্ষা করা হয়নি। ইয়াহিয়াকে তিনি বলেছিলেন, মুজিব জীবিত আছেন কি না তিনি তা দেখতে চান। মুজিবের স্বাস্থ্য চমৎকার আছে– এ মর্মে প্রেসিডেন্ট তাকে অবহিত করেন। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওসমান ওলকে আজ রাতে পিন্ডিতে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেন্টোর উদ্যোগী হওয়া উচিত।

রয়টার্স ত্রিপলি ডেটলাইনে এক রিপোর্টে বলেছে, জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা মাহমুদ আলী লিবিয়ার গাদ্দাফির কাছে ইয়াহিয়ার চিঠি হস্তান্তর করেন। কিন্তু তার বিষয়বস্তু তিনি প্রকাশ করেননি। জানা গেছে, এই বাঙালি মাহমুদ আলী বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আজও মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করছেন। সরকার আসে যায়, কিন্তু মাহমুদ আলী গাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়েই চলাফেরা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে হামলা নিয়ে বিভ্রান্তি

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। কলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী । নানা জল্পনা। তিনি কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন? যুদ্ধ ঘোষণা করছেন? একটি চিরকুট এল, নুতন কোনো ঘোষণা এল না। সভা শেষ হলো। তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন দিল্লি।

পাকিস্তান আজ প্রথম কাশ্মির সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালায়। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের শুরু। এ জন্যই বলা হয়, একাত্তরে পাক-ভারতের যুদ্ধের মেয়াদ ১৪ দিন। ইন্দিরা এদিন জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণে বলেন, আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হলো। এদিন ভারতে জরুরি অবস্থাও জারি হয়। পিআইএ'র সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ঢাকায় কার্ফ্যু জারি করা হয় রাতে। ভুট্টো এই প্রথম বলেন, তার দলীয় একজন পূর্ব পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি আছেন। তবে তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে কে কার বিরুদ্ধে প্রথম হামলা চালিয়েছে, তা নিয়ে ছিল পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। দৈনিক আজাদে ৪ ডিসেম্বরে প্রথম পাতায় ৮ কলামজুড়ে শিরোনাম : 'সারা পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা শুরু।' দৈনিক পাকিস্তানের ৭ কলামজুড়ে ব্যানার হেডলাইন 'এযাবৎকালের বৃহত্তম হামলা।' এপিপির রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনী আজ পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত আক্রমণ করেছে। পাকিস্তান বিকেলে ভারতের

অগ্রবর্তী এলাকার বিমানক্ষেত্র অমৃতসর, পাঠানকোট, অবন্তিপুরা ও শ্রীনগরে বোমাবর্ষণ করে। ওয়াশিংটনের কাছে হামলার কথা স্বীকার করে পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াশিংটন সেদিন তা প্রকাশ করেনি। এদিন ওয়াশিংটন সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে দুজনের টেলিসংলাপ : কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলছেন, মনে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটছে। আর সে কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ হলো। পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতকে সামরিক সহায়তা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিতে এ ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহারে আগ্রহী। কিন্তু আমি মনে করি, এ ঘটনার পর ভারতকে সহায়তাদান কর্মসূচি একেবারেই বাতিল করা সঙ্গত। কিসিঞ্জার আরো বললেন, পাকিস্তান যদি যুদ্ধ ছাড়াই তাদের দেশের অর্ধেক হারায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবেও হয়তো তাদের বিনাশ ঘটবে। কিন্তু তারা তো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। জবাবে নিক্সন : পাকিস্তানের ঘটনাবলি আপনার চিত্তকে অস্থির করে তুলছে। .... ভারতকে আমাদের অব্যশই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। কেন আমরা তা করব না। পশ্চিম পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে? তাদের বলে দিন, ভারত যখন দাবি করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানই তাদের আক্রমণ করেছে তখন মনে হয়, এ যেন রাশিয়ার দাবি, ফিনল্যান্ড তাদের আক্রমণ করেছে।

১০টা ৫৫ মিনিটে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রর্জাসের ফোন আসে। কিসিঞ্জার রজার্সকে বলেন, প্রেসিডেন্ট আজ দুপুরের মধ্যেই অস্ত্র সহায়তা বন্ধ সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশে বেপরোয়া। তিনি চাইছেন, আমরা যেন পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকি। রজার্স বলেন, আমিও তা-ই চাইছি। তবে ভারতকে নিন্দা জানিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশে আমি কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে। প্রশ্ন হলো, কে দোষী তা নির্ধারণ করে কোনো বিচার বিভাগীয় ভূমিকা পালন কি আমাদের ঠিক হবে? আমার তো মনে হয়, বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করাই সমীচীন হবে। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট কিন্তু ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার কথাও ভাবছেন।

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি (পরে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব) ইকবাল আখুন্দ ১৯৯৭ সালে তার 'মেমোয়ার্স অব এ বাইস্টান্ডর এ লাইফ ইন ডিপ্লোম্যাসি' বইয়ে নিশ্চিত করেন যে, পাকিস্তানই এদিন কাশ্মিরের চম্ব সেক্টরে হামলা চালায়। এ হলো সেই 'সাধারণ যুদ্ধ', যার হুমকি গোটা বছরজুড়ে দিয়ে আসছিলেন ইয়াহিয়া। ১৯৮৯ সালে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণামূলক গ্রন্থ বাংলাদেশ : এ কান্ট্রি স্টাডিতে তথ্য দেওয়া হয়। শেষ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ বিমান হামলা চালায়।

কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে এদিন সকাল ১১টা ১৯ থেকে ১১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১. পাক-রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপের পরে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের দিনক্ষণ নির্ধারণ। ২. আমাদের প্রস্তাবিত রেজুশেলনসহ রাষ্ট্রদূত বুশের জন্য ভাষণের খসড়া তৈরি। ৩. সোমবার পর্যন্ত ভারতকে অতিরিক্ত কোনো ঋণপত্র না করতে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দান। ৪. কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এটা জেনে নেবেন যে, পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ২২ মিলিয়ন ডলারের ভাগ্যে কী জুটবে। কারণ যে ক্যাটাগরিতে ভারতকে বন্ধ করা হচ্ছে,

তাতে পাকিস্তানের বিষয়েও একই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ৫. পররাষ্ট্র দপ্তর প্রেসিডেন্টকে লেখা (ইয়াহিয়া) ২ ডিসেম্বরের চিঠির জবাব তৈরি করবে।

কিসিঞ্জার বৈঠকের শুরুতেই চাপা উত্তেজনায় বলতে শুরু করেন, আমি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে প্রত্যেক আধ ঘণ্টা অন্তর গুঁতো খেয়ে চলেছি। তিনি বলছেন, আমরা যথেষ্ট কঠোর হচ্ছি না। তার ধারণা, পররাষ্ট্র দপ্তর কঠোর হতে চাপ দিচ্ছে, কিন্তু আমিই বাগড়া দিচ্ছি। তিনি সত্যিই বিশ্বাস করছেন না যে, আমরা তার ইচ্ছাই পূরণ করে চলেছি। তিনি চাইছেন, আমাদের নীতি ও কাজ হবে পাকিস্তানঘেঁষা, কিন্তু ভিন্ন খাতে।

কিসিঞ্জারের এ বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তিনি অন্যদের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেন। নিক্সন-কিসিঞ্জার দুজনেই জানতেন স্টেট ডিপার্টমেন্টসহ প্রশাসনের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন। একাত্তরে নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন এই বৈঠকের বিবরণীসহ বেশকিছু দলিল প্রকাশ করতে পেরেছিলেন এদের কল্যাণেই। এ ক্ষেত্রে 'ডিপথ্রট' ছিলেন কিসিঞ্জারেরই সহকারী চার্লস রেডফার্ড। তবে সেই দলিল, যা এন্ডারসন পেপারস ও ২০০২ সালে এফ এন আইয়াজুদ্দিন সম্পাদিত 'দি হোয়াইট হাউস অ্যান্ড পাকিস্তান' (অক্সফোর্ড)- এ মুদ্রিত হয়েছে। তার সঙ্গে ৬ মে ২০০৫ প্রকাশিত নথিপত্রের সঙ্গে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন ৩ ডিসেম্বরের বৈঠকে কিসিঞ্জারের প্রশ্ন : ভারত কি পাক ভূখণ্ড জবরদখল করছে? জবাবে সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেলমস বলছেন, হ্যাঁ, ভারত নিশ্চিতভাবেই ক্ষুদ্র হলেও পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে (আইয়াজুদ্দিন)। গত ৬ মে সরকারিভাবে অবমুক্তকৃত দলিল মতে হেলমস বলেন, না। তাদের দ্বারা সামান্য অংশ ব্যতিরেকে পাক ভূখণ্ড গ্রাস বা অপদখলের কোনো প্রশ্নই আসে না।

এই নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, সিআইএ জানত পাকিস্তানীরাই শ্রীনগর, অমৃতসর ও পাঠানকোর্টে হামলা চালিয়েছে। অ্যাডমিরাল মুরার এ মর্মে আক্ষেপও করেন, পাকিস্তানীদের এ পদক্ষেপ একেবারেই কাঁচা কাজ। ৬৫-এর যুদ্ধের মতো দক্ষতাও তারা দেখাতে পারেনি।

এদিনের আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতির স্বার্থে তখনো জাতিসংঘকে ব্যবহারে উদগ্রীব। বৈঠকে কিসিঞ্জারের একটি মন্তব্য, প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস এই ইস্যুতে জাতিসংঘ যদি কিছু না করতে পারে তাহলে তার টিকে থাকা অর্থহীন।

সামরিক চুক্তি : কাগুজে দলিল

সাম্প্রতিক মার্কিন গোপন নথি সন্দেহাতীতভাবে এক অর্থে পুনঃপ্রমাণ করেছে যে, নিজের শক্তি না থাকলে বৃহৎশক্তির সঙ্গে প্রকাশ্য কিংবা গোপন আঁতাত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অর্থহীন মনে হতে পারে। ৬৫-এর যুদ্ধের পরে ভুট্টো বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে এ যুদ্ধ চলবে হাজার বছর। ইয়াহিয়া ২ ডিসেম্বরে নিক্সনকে ১৯৫৯ সালের চুক্তির দোহাই দিয়ে মরিয়া হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিহাস হচ্ছে, ৩ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে শীর্ষস্থানীয় নীতিনির্ধারকরা এই চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু এটা কেউ কবুল করেননি যে, এটা পালনে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সংকটের

৯ মাস পর স্বয়ং কিসিঞ্জারও বলছেন, আজকের আগে এ চুক্তির কথা আমি কখনো গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি। দুই দেশেরই দুটো রক্ষাকবচ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। ভারতের সঙ্গে ১৯৬৩-তে সই হয় গোপন আকাশ প্রতিরক্ষা চুক্তি। তবে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছিল সুনির্দিষ্ট। ১৯৫৯ সালের ৫ মার্চে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হলে দুই দেশের সম্মত উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহায়তা দেবে।

আজ দিনের শেষভাগে ফ্লোরিডায় অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের টেলিসংলাপ চলে। কিসিঞ্জার দিব্যি নিক্সনকে বললেন, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান নয়, ভারতই হামলা করেছে।

এদিকে আজ এপিপির এক রিপোর্টে বলা হয়, জর্ডানের বাদশা হোসেন ইয়াহিয়াকে লেখা এক বার্তায় বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতির প্রতি কোনো মতেই আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। ডা. চৌহান লন্ডনে বলেন, স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র গঠনে পাকিস্তানের কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস মিলেছে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মনোভাব রহস্যঘেরা

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১; পিন্ডিতে সরকারি মুখপাত্রের দাবি, পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় আক্রমণ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে ৩ ডিসেম্বরের পাকিস্তানী 'প্রি-এম্পটিভ' হামলা অবশ্য 'ডি-ডে' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ভারতীয় বোমারু বিমান আজ তেজগাঁও ও কুর্মিটোলায় সর্বাত্মক হামলা চালায়। ভারতের ৯টি ও পাকিস্তানের ৩টি বিমান ভূপাতিত হয়। ভারত বিশাখাপত্তমে পাক সাবমেরিন গাজী ডুবিয়ে দিয়েছে। পাক সশস্ত্র বাহিনীর ওপর থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা আজ প্রত্যাহার করা হয়। কিসিংস আরকাইভস লিখেছে, ভারত আজ বলেছে, সে ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ (আগ্রাসনের হুমকি সংক্রান্ত) প্রয়োগের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখছে।

নিরাপত্তা পরিষদে আজ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠক হয়। তবে বাদানুবাদের কারণে প্রস্তাব গ্রহণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ নিয়ে পাক-ভারতের একটা উভয় সংকট অবস্থা চোখে পড়ে। ভারত পাক হামলার ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপন করবে না বলে জানিয়ে দেয়। দিল্লিতে একজন মুখপাত্র বলেন, এর কারণ ভারত কাশ্মির প্রশ্নে ইতিপূর্বে এক দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

তৎকালীন পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান হোসেন খান তার 'মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস' (১৯৯৭) বইয়ে লিখেছেন, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আজ প্রত্যুষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড দেখা করেন। কিন্তু তিনি বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। আমি জানতে চাইলে বলেন, 'দ্রুত ফিরতে হবে। আমাদের এয়ার এটাশের নিশ্চিত ধারণা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারত বিমান হামলা শুরু করবে।' দেখলাম তার কথাই সত্য হলো। সাইরেন বাজল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো এদিন আমাকে বোঝালেন, 'নিরাপত্তা পরিষদে কালক্ষেপণেই লাভ। যা খুশি প্রস্তাব পাস হোক, আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে মানব না। তাই এ

উদ্যোগ থেকে দূরে থাকাই ভালো।' এই দুই নেতা তাদের এমন মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। লক্ষণীয় হচ্ছে সুলতানের একটি মন্তব্য। তার কথায় সূক্ষ্ম আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল অথবা সুলতান অন্তত এমনও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুলতান লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কেউ আমাদের কোনো ভরসা দেয়নি যে, তারা সামরিক সহায়তা দেবে। তাহলে কেন এ দুজন নিরাপত্তা পরিষদ এড়াতে চান? পূর্বের অবস্থা বেগতিক ও পশ্চিম ফ্রন্টে সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ইয়াহিয়া তাহলে কোন অজ্ঞাত জিনিসের ভরসা করছেন? '৬৫'র কায়দায় আমরা এখনো ধরাশায়ী হইনি– ইয়াহিয়া খোঁচা দেন আইয়ুব খানকে। তাদের এ মনোভাবে আমি হতাশ হলাম। সুলতান এরপর মন্তব্য করেন, এই উপসংহার অকাট্য যে, হয় তারা বাস্তবতা বুঝতে অপারগ কিংবা তাদের মনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রয়েছে, যা শুধু তারাই জানেন (পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৫)। মার্কিন নথিপত্র পর্যালোচনায় সুলতানের এ বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কেউ পাকিস্তানকে কোনো কথা দেয়নি। তবে নির্দিষ্ট সামরিক সহায়তা না দিলেও নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের ঘাটতি ছিল না। যেমন চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফি আজ বলেন, সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের (রাশিয়া) সমর্থনপুষ্ট হয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত তার আক্রমণ তীব্র করছে। চীন আজ ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করে। এবং পাকিস্তানের প্রতি 'দৃঢ় সমর্থন' দেওয়া সংক্রান্ত একটি খবর এপিপি প্রচার করে। জেনারেল অরোরা কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের পূর্ব সীমান্তে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় তিনি উদ্বেগ বোধ করছেন।

আজ ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে এক ব্যাক চ্যানেল বার্তায় জানান, 'গতকাল ইয়াহিয়া তার কাছে আকুল আকুতি জানিয়ে বলেছেন, আপনারা যখন সরাসরি আমাদের অস্ত্র দিতে পারছেন না, তখন তৃতীয় কোনো বন্ধু দেশের মাধ্যমে পেতে সাহায্য করুন। আল্লাহর দোহাই, কোনো বাধা সৃষ্টি করবেন না। আমি বলেছি বটে বিষয়টি আপনার নজরে নেব। কিন্তু তাকে এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, 'পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার অতীত ইতিহাসের নিরিখে আপনি যা চাইছেন তা পূরণ করা কঠিন।'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার এদিন আলাপ করে ঠিক করেন যে, ইরানের শাহকে বলা হবে অস্ত্র দিতে। আমরা তাদের পরে পুষিয়ে দেব। নিক্সন বলেন, এ তথ্য যদি ফাঁস হয় তাহলে আমরা অস্বীকার করব। এদিন এ দুজন এক দীর্ঘ টেলিসংলাপ পাকিস্তানকে সহায়তাদানে নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবহার ও ভারতকে সব রকম সাহায্য বন্ধের মধ্যেই সীমিত রাখেন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে আশ্বস্ত করেন যে, রাষ্ট্রদূত বুশ কঠোর বক্তব্য রাখবেন। নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয় অবস্থান সম্পর্কে নিক্সন খোঁজ নেন। কিসিঞ্জার তাকে বলেন, টাইমস এখনো কিছু বলেনি পোস্টের তাগিদ নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে। নিক্সনের প্রশ্ন, তারা কি ভারত বা পাকিস্তান বা উভয়কে দোষারোপ বা অন্য কিছু বলছে। কিসিঞ্জারের উত্তর তারা ভারসাম্য বজায় রাখছে। সামরিক পদক্ষেপের জন্য তারা ভারতকে দুষছে। আবার উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও বলছে। তবে গোড়াতে ঝোঁক ছিল ভারতের বিপক্ষে। কিসিঞ্জার আরো বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান কিন্তু আমাদের সব

প্রস্তাবই কবুল করেছে। আমি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বললাম এক বছরের মধ্যে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে আমরা একটি পূর্ণ কর্মসূচি একসঙ্গে প্রণয়ন করতে পারি। যদি তারা .... আসলে ভারতকে সাহায্য বন্ধ করে দিলে দেখা যাবে তাদের দৌড়। তাদের উন্নয়নে রাশানরা নিশ্চয় ৭০০ মিলিয়ন ডলার দেবে না। নিক্সন : আমাদের একটা কঠিন খেল খেলা উচিত। আমি মনে করি একটা আগ্রাসী দেশকে অর্থ সহায়তা দেওয়া মার্কিন জনগণ সমর্থন করবে না। কিসিঞ্জার : ভাবুন তো, বিষয়টি কত খারাপ। ওরা আমাদের টাকায় জাতিসংঘে আমাদেরই নাস্তানাবুদ করছে। আচ্ছা, বলুন তো এই বেজন্মারা (ভারতীয়রা) কখনো আমাদের সমর্থন করেছে? নিক্সন : কখনো নয়। কিসিঞ্জার : তারা যদি রাশিয়ার তাবেদারই হবে, তাহলে রাশানদেরই উচিত বছরে এক বিলিয়ন ডলার তাদের পেছনে খরচ করা। আমরা বাধা দেব না। নিক্সন : আমরা ভারতকে ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছি। এখন যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত সব সাহায্য বন্ধ করে দেব।

এদিন ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের ২৮ মিনিটের বৈঠকে জাতিসংঘে মার্কিন অবস্থান সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বলা হয়, আমরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলব। কিন্তু মুজিবের মুক্তির বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো বাক্যের অন্তর্ভুক্তিতে রাজি হব না। এটা ছিল কিসিঞ্জারের মন্ত্রণা। বৈঠকে তিনি প্রশ্ন করেন, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানীরা আর কতক্ষণ টিকবে। অ্যাডমিরাল জুম ওয়াল্ট বলেন, আর বেশিদিন নয়। তাদের হাতে এক বা দুই সপ্তাহের রসদ রয়েছে। ভারত কিছু জায়গা দখল করতে পারে, কিন্তু পুরোটা নয়। আর সোভিয়েতেরা সম্ভবত বিসাকের নৌঘাঁটি স্থায়ীভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারতকে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন ঘটাবে। এদিন দুপুর সোয়া ১২টায় ফ্লোরিডায় অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে ফের কথা বলেন কিসিঞ্জার। কিসিঞ্জার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় ও সোভিয়েতেরা বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যাতে প্রস্তাব পাস না হয়। কিন্তু এই আলোচনাতেও ভারতকে ঘায়েল করতে কিসিঞ্জার সাহায্য বন্ধেরই পরামর্শ দেন। কিসিঞ্জার আরো বলেন, বাঙালিরা যদি মনে করে থাকে পাকিস্তান নিষ্ঠুর, তাহলে তারা যেন ভারতীয় খবরদারির জন্য অপেক্ষমান থাকে। ভারত বাঙ্গালি মুসলমানদের বর্তমানের তুলনায় অধিকতর সংকীর্ণ বৃত্তে ঠেলে দেবে। আর এসব কারণেই ভারত ছয় মাসের মধ্যে আহতের মতো দৌড়াবে না।

আজ থেকেই পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স আইসল্যান্ড সফর স্থগিত রাখেন। কোসিগিনও তার বিদেশ সফরে পরিবর্তন ঘটান। তিনি আজ কোপেনহেগেনে বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ থেকে দুই দেশকে বিরত রাখতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো ইন্দিরা ও ইয়াহিয়ার কাছে দুটো জরুরি তারবার্তা পাঠান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাডওয়ার্ড হিথ উভয় দেশের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন।

বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ কাশ্মির!

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন নথিপত্র অনুযায়ী এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সন্ধ্যা সোয়া ৬ টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জার একান্তে কথা বলেন। নিক্সনের আক্ষেপ গত নভেম্বরে ইন্দিরা যখন ওয়াশিংটনে এলেন, তখন তিনি কেন তার জন্য প্রস্তুত ব্রিফিংয়ের বাইরে কঠোর ভাষায় দুই কথা শুনিয়ে দেননি। ইন্দিরা যাতে তার সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো কিছু অজুহাত (অভ্যর্থনায় ত্রুটিজনিত) হিসেবে ব্যবহার করতে না পারেন, সেজন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছিল বাড়তি সতর্কতা। নিক্সনের মন্তব্য : এই মহিলা আমাদের শুষে নিয়েছে। কিন্তু তাকে এর মাশুল দিতে হবে। তিনি এর মাসুল দিতে যাচ্ছেন। আমি এখন এটা সাহায্য বন্ধের দিক থেকে বলছি। আমি কিন্তু এটা ।' এই পর্যায়ে নিক্সন ও কিসিঞ্জার উভয়ে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। নিক্সনের বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। কিসিঞ্জার মত দেন, ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের প্রচারণায় ভারতকে ইস্যু করবে। নিক্সন তারা সম্ভবত ভারতকে চিরকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হাতছাড়া হওয়ার জন্য আমাদের দুষবে। কিন্তু ভারতকে চিরকালের জন্য হারালে, কার কী তেমন এসে যাবে। কিসিঞ্জার নিক্সনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন, 'চুলোয় যাক'। আমরা যদি কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি, তাহলে ভারতকে এখন থেকে এক বা দুই বছর, যখনই হোক না কেন, পৃষ্ঠদেশ দেখানো যাবেই।

লক্ষণীয়, ইসলামাবাদে চীনা রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান হোসেন খানকে সামরিক হস্তক্ষেপে চীনের অপারগতা জানিয়ে দেওয়ার পটভূমিতে নিক্সন বলছেন, আমি নিশ্চিত যে, চীন যদি তার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে, ভারতীয়রা তাহলে দারুণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হবে। কিসিঞ্জার এক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বললে নিক্সন বলেন, কোরীয় যুদ্ধের সময় দারুণ শীতেও চীনা সৈন্যরা কিন্তু ইয়ালু নদী অতিক্রম করেছে। এদিন কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিসিঞ্জার বলেন, কারো কারো ধারণা ভারতীয়রা সংযম দেখিয়েছে। কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার যে, তারা তাদের সাধ্যমতো অগ্রসর হতে দেরি করেনি। বর্ষাকাল শেষ। চীন সীমান্তের গিরিপথ তুষারে ঢাকা। বাংলাদেশের গেরিলারা এখন প্রশিক্ষিত এবং ভারতীয়রা তাদের সৈন্য মোতায়েন নিশ্চিত করেছে। ইন্দিরার বিদেশ সফর শুরুর সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ নেয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রর্জাস, যার ভূমিকাকে নিক্সন ও কিসিঞ্জার 'ভারত ঘেঁষা' হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছেন, তিনি এদিনের বৈঠকে বলেন, এই সংঘাত কিছু সময় আগে নেওয়া ভারতীয়দের সুচিন্তিত পরিকল্পনার অনিবার্য ফল। এদিনের আলোচনায় দক্ষিণ এশীয় সংকটের ঐতিহাসিক ভ্রান্তি প্রাধান্য পায়। নিক্সন : ভারতকে আমরা ১০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছি। কিন্তু তাদের ওপর আমাদের কোনো প্রভাব নেই। বরং এটা বলা চলে যে, পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়ে আমরা ভারসাম্য বিনষ্ট করেছি, এভাবে ভারতকে হামলা চালাতে আমরাই উৎসাহিত করছি। এখন আমরা দেখছি পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভারতীয়দের আক্রমণ করছে। এখন এই পদক্ষেপের জন্য তাদের অভিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে রাশিয়া আক্রমণের জন্য ফিনল্যান্ড ক দোষী করা। উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্যাকার্ড এ সময় বলেন, আমরা যদি সামরিক ভারসাম্য রক্ষা করতাম, তাহলে শান্তির জন্য তা ভালো হতো। নিক্সন

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। আজ সকালে সিনেটর ম্যান্সফিল্ডকে আমি বলেছি, যুদ্ধের ফলাফলে যদি ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতি ব্যর্থ হবে।
কিসিঞ্জার এটা আসলে গত সাত বছরে আমাদের অনুসৃত নীতির ব্যর্থতার ফল।
নিক্সন : 'আইয়ুব খানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াদা বরখেলাপ থেকেই আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দূরত্বের সূত্রপাত। .... আইজেনহাওয়ারের আমলে ওয়াশিংটন-পিন্ডি ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু চীনাদের সঙ্গে তারা খেলতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়।

এদিন মার্কিন নীতিনির্ধারকরা আলোচনা করেন যে, হারানো পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারে কাশ্মির করতলগত করা হতে পারে তুরুপের তাস। নিক্সনের মন্তব্য, ভারত বহুকাল ধরে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করতে চেয়েছে। তবে তাদের স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে কাশ্মিরই অধিক সম্পৃক্ত। এদিন বেলা ৯টা ৩৭ থেকে ১০টা ৪০ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী লেয়ার্ডের সভাপতিত্বে সশস্ত্রবাহিনীর নীতি পর্ষদের বৈঠক হয়। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তানীরা মনে করেছে, ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তান হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাশ্মির করায়ত্ত করা যথেষ্ট বলেই গণ্য হবে। লক্ষণীয়, এ তথ্যটি তিনি প্রথমে যে সূত্রের বরাতে উল্লেখ করেন, তা গোপন রাখা হয়েছে। অ্যাডমিরাল জুমওয়াল্ট মত দেন, 'কাশ্মির মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর সে কারণেই কাশ্মির কেড়ে নেওয়া তাৎপর্য বহন করে। দেশভাগের সময় মহারাজা হিন্দু ছিলেন বলে এটি ভারতের ভাগে পড়ে।' জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিন্তু এটাই নির্দেশ করছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে চাপ কমাতেই পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বরে পশ্চিম ফ্রন্টে প্রি-এম্পটিভ হামলা করে। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোয়েন্দা রিপোর্টের বরাতে পাকিস্তানের কাশ্মির দখলের উদ্দেশ্যই সঠিক বলে মত দেন।

গত মে মাসে প্রকাশিত আরেকটি নথি হচ্ছে ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকের ১২ পৃষ্ঠার বিবরণী। এই বৈঠকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। যেমন কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন, ভারত কি বাংলাদেশকে একটি সেনাবাহিনী ও স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে অনুমতি দেবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা জোসেফ মিসকো বলেন, আমি এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেব না। ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি দীর্ঘ করতে পারে। ভ্যান হোলেন এ সময় মত দেন, দুই বা তিন সপ্তাহ পরই তারা একটি দখলদার হিন্দু সেনাবাহিনী হিসেবে চিত্রিত হতে পারে।

এ বৈঠক থেকেই সম্ভবত বহুল আলোচিত 'বটমলেস বাসকেট' কথাটির উৎপত্তি। বাংলাদেশে একটি দুর্ভিক্ষ আসন্ন কি না, এ প্রসঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অ্যালেক্স জনসন প্রথমে বলেন, তারা হবে একটি আন্তর্জাতিক বাস্কেট কেস। জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, কিন্তু তাই বলে নিশ্চয় আমাদের 'বাসকেট কেস' নয়। পরবর্তীকালে কিসিঞ্জারের এক প্রকাশ্য মন্তব্যের সূত্রে 'বাস্কেক কেস' কথাটি বিকৃতভাবে 'বটমলেস বাস্কেট' হয়ে পরিচিতি পায়।

চীনা হুমকি ছিল কল্পনা?

৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান এম খান ৫-৭ ডিসেম্বরের ঘটনাবলি সম্পর্কে তার ডায়েরিতে লিখেন,

পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে পরিচালিত হামলায় সুফল মেলেনি। চরমপন্থি নীতিনির্ধারকরা পড়েছেন মহা ফাঁপড়ে। তারা বিভ্রান্ত ও বিষণ্ন। প্রশ্ন তুলছেন, এখন কী হবে। এম এম আহমেদ, যিনি ইমার্জেন্সি কমিটির অন্যতম সদস্য, বললেন, জাতি সামর্থ্যের অভাব বুঝবে। কিন্তু তারা কখনোই উদ্যোগহীনতা ক্ষমা করবে না। এমন অনেকেরই মত, পরাজয় ও অন্যরূপ পরিণতি যা-ই ঘটুক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এর স্বপক্ষে একটি বৈঠকও হলো। প্রেসিডেন্ট বললেন, মাঠ পর্যায়ের সামরিক অধিনায়করাই উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত। এক অপারেশনে সবকিছু বাজি ধরার কথা যারা বলে, তারা মাথামোটা ও গর্দভ।

সুলতানের বর্ণনায় চীনা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার বক্তব্য অবাক করার মতো। তবে কিসিঞ্জার ইতিপূর্বে নিক্সনকে যে কথা লিখিতভাবে অবহিত করেছিলেন, তার সঙ্গে এ ভাষ্যের একটা মিল রয়েছে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, চীন বলেছে পাকিস্তানই মনে করে চীনা সাহায্যের দরকার নেই। সুলতান খানের গ্রন্থে (মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস, দি লন্ডন সেন্টার ফর পাকিস্তান স্টাডিজ পৃ. ৩৬৬-৩৬৭) লেখা আছে, ইয়াহিয়া বললেন, পাকিস্তান চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হোক তা তিনি চাননি। নিউজউইক-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর সব উপায়ে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে এবং তারা তা করছেও। চীনা অবস্থান সম্পর্কে ভারতও মোটামুটি নিশ্চিত ছিল।

এ দিনে প্রেরিত সিআইএ'র এক তারবার্তা অনুযায়ী, ইন্দিরা বলেন, পাকিস্তানের প্রতি চীনের পক্ষপাত সন্দেহাতীত থাকলেও তিনি আশা করেন যে, চীন কোনো সংঘাতে নিজেকে জড়াবে না। তবে সোভিয়েত ইন্দিরাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, চীন লাদাখ ও চুম্ব এলাকায় কার্যকর হস্তক্ষেপে সক্ষম। এবং তারা যদি তা করে, তাহলে রাশিয়ার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তারা উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নেবেই। লক্ষণীয়, ইন্দিরার এই মন্তব্য সিআইএ যে সূত্রে পেয়েছে, তা গত মে মাসেও যথারীতি গোপনই রাখা হয়েছে। ইন্দিরা সম্ভবত তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ব্রিফিং দিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই সিআইএ'র কাছে খবর আসে। ওই বার্তায় বলা হয়, ইন্দিরা বলেন, এ মুহূর্তে ভারতের তিনটি লক্ষ্য। যথাসম্ভব দ্রুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, শুধুই কৌশলগত কারণে পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মিরের দক্ষিণ অংশ সাময়িকভাবে ভারতভুক্তকরণ এবং চূড়ান্ত হচ্ছে পাকিস্তানী সামরিক শক্তি পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দেওয়া। ভবিষ্যতে তারা যাতে ভারতকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

সুলতান লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনাটা সত্যিই সামরিক দিক থেকে কতটা কার্যকর কিংবা, 'নুরা কুস্তি' (একটি ভুয়া যুদ্ধ) ছিল, তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে বিশিষ্ট ফরাসি সামরিক বিশ্লেষক জেনারেল বিআফরের মন্তব্যে। ন্যাটো বাহিনীর এই সাবেক ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই। ৭ ডিসেম্বরে তিনি পাকিস্তানে পৌঁছে লাহোর থেকে চুম্ব পরিদর্শন করেন। তিনি সৈন্যদের শৃঙ্খলায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মুশকিল হচ্ছে, তারা তো সবাই ব্রিটিশ ধাঁচে অন্ধ। এমনকি ব্রিটিশদের চেয়েও তারা বেশি ব্রিটিশ। তিনি বললেন, পাকিস্তানের মতো

উন্নয়নশীল দেশের মিলিশিয়া বাহিনী থাকার বিকল্প নেই। স্থায়ী সেনাবাহিনী থাকবে একটি নিউক্লিয়াস হিসেবে, কিন্তু শুধু তারাই দেশ রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তিনি সম্প্রতি রাশিয়া সফরকালে এ নিয়ে রুশ জেনারেলদের সঙ্গে কথা বলেছেন। 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে চীনের বৃহত্তম শক্তিসাম্য হচ্ছে তার পিপলস মিলিশিয়া। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের দমন করে তাদের ভূখণ্ড দখল করতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে বড় নজির।'

সুলতান লিখেছেন, প্রেসিডেন্টের আত্মবিশ্বাস আজও গগনচুম্বী। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হচ্ছিল। সংকট বহুদিন ধরে ঘনীভূত হলেও আমরা যুদ্ধের জন্য ছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ৫ ডিসেম্বর আবিষ্কৃত হয়, আমাদের তেলের মজুদ প্রায় নিঃশেষিত। করাচি বন্দর ভারতীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ। আমি যখন প্রেসিডেন্টকে বললাম, ভারতীয়রা যদি এখন করাচিতে ছত্রীসেনা নামায়, তাহলে আমাদের নৌবাহিনীর তেমন কিছু করার থাকবে কি? প্রেসিডেন্ট অসহায় ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত তুললেন, 'আমি কী করতে পারি? আমি প্রতিটি স্থান রক্ষায় অপারগ।' অবাক হলাম। দেশের বৃহত্তম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ক একি বলছেন। বিমান হামলা থেকে রক্ষা পেতে তড়িঘড়ি ইয়াহিয়া তার বাগানেই একটি বাঙ্কার তৈরি করেন। তার বালির বস্তার ছাদের নিচে আমি দুবার তার সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ দিনে ইয়াহিয়া নিক্সনের কাছে বার্তা প্রেরণের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন সুলতানের সঙ্গে। এই বার্তায় ফুটে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের পতন দরজায়। মার্কিন দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বার্তায় ইয়াহিয়া নিক্সনকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ার অর্থ হচ্ছে আসাম, বার্মা, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া অঞ্চল সোভিয়েত কর্তৃত্বে চলে যাওয়া। সুতরাং ভারতকে ঠেকান।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স আজ ভারতে তাদের দূতাবাসকে গতকাল ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝায়ের সঙ্গে তার আলোচনার বিবরণ অবহিত করেন। এতে বলা হয়, মুজিব বা তার মনোনীত কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা ঝা নাকচ করেননি। বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ভারতের সাড়া নেতিবাচক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে হবেন সেই প্রতিনিধি এবং তা গ্রহণযোগ্যই বা হবে কতটুকু।

নিক্সন-কিসিঞ্জারের 'ড্রেস-রিহার্সাল'

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থা ঢাকার তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের কথায়, দড়ির ফাঁস ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। নিক্সন-কিসিঞ্জার নিশ্চিত হন যে, আইন অনুযায়ী পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহের পথ বন্ধ। তারা জানলেন, মিত্র পাকিস্তানের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো আইনগত রক্ষাকবচ নেই। প্রায় ডজন খানেক চুক্তি, সমঝোতা, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া গেল বটে। কিন্তু সেখানে কোনো গোপন চুক্তির ইঙ্গিত নেই। সকাল ১১টা ১৩ মিনিট থেকে ১২ টা ২ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। সিদ্ধান্ত হলো,

সিআইএ পরিস্থিতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য মূল্যায়ন করবে। প্রতিরক্ষা দপ্তর কাশ্মিরে প্যাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্য যাচাই করবে। পররাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানকে সামরিক সরবরাহের বিকল্পগুলো খতিয়ে দেখবে।

জর্ডানের বাদশা হোসেনের কাছে ইয়াহিয়া অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। হোসেন অনুমতি চান যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু মার্কিন আইন অনুযায়ী এই বিধানই বলবৎ ছিল, যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যে দেশকে অস্ত্র দিতে অপারগ, সে দেশে তার অস্ত্র তৃতীয় দেশের মাধ্যমেও প্রেরণের সুযোগ রুদ্ধ। সে কারণেই বাদশা হোসেনকে যুক্তরাষ্ট্র অনুমতি দিতে পারেনি। ইরানের শাহের কাছ থেকেও সুখবর পায়নি ওয়াশিংটন। তেহরানে একজন উর্ধ্বতন মার্কিন কূটনীতিককে শাহ জানিয়ে দেন, ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিকে তিনি ভয় পাচ্ছেন। এ কারণেই পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে তিনি সোভিয়েতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ। তবে শাহ এক বিকল্প প্রস্তাবে বলেন, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানকে তাদের এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান পাঠাতে বলতে পারে। তখন শাহ দুই স্কোয়াড্রন ইরানি বিমান জর্ডানকে দেবে। জর্ডানের যুদ্ধবিমানগুলো আবার সম্ভাব্য ইসরায়েলি হুমকি মোকাবিলায় ছিল ভারসাম্যসূচক। জর্ডান তার যুদ্ধবিমান পাকিস্তানকে দিলে ইসরায়েল সুযোগ নিতে পারে। নিক্সন বললেন, আমরা সম্ভাবত ইসরায়েলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটা অঙ্গীকার আদায় করতে পারি। কিসিঞ্জার একমত হন। ইসারায়েলী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলারও পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, হেনরি, আপনি তাকে (গোল্ডামায়ার) বলবেন– এটা রুশ চক্রান্ত, তাহলেই কাজে দেবে! কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইনে এই বিকল্পও সমর্থন করেনি। নিক্সন ও কিসিঞ্জার এ নিয়ে আজ কথাও বলেন এটর্নি জেনারেল মিশেলের সঙ্গে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জনমত বাংলাদেশের যথেষ্ট অনুকূলে থাকায় তারা জাতিসংঘ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদকে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারেও অক্ষম থাকেন।

বিভিন্ন নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই দুই নেতাই জানতেন, তাদের পক্ষে পকিস্তানের জন্য 'মুখের কথা' (লিপসার্ভিস) ছাড়া সামরিকভাবে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সরল সত্য তারা ইয়াহিয়াকে কখনো অবহিত করেছেন বলে জানা যায় না। এমনকি এই সীমাবদ্ধতার কথা তারা নিজেদের একান্ত সংলাপেও কদাচিত উল্লেখ করেন।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার আজ দিনভর আলোচনা করেন, রুশ-ভারতকে দমাতে আর কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। কিসিঞ্জার আক্ষেপ করেন, গোড়াতেই ভারতকে দারুণভাবে ভয় দেখানো উচিত ছিল। ওই সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কিছুটা নির্ভরশীল হতে উৎসাহী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুই দেশের শীর্ষ বৈঠকের একটি দিনক্ষণও ছিল আসন্ন। কিসিঞ্জার চাইলেন এ দুটো ইস্যুতে সোভিয়েতকে চাপে রাখতে। আজ নিক্সনের এটি জিজ্ঞাসা— এখন তাহলে আমরা কী করব? কিসিঞ্জারের উত্তর– আমাদের দুটো বিকল্প। যতদূর সম্ভব পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা থেকে ভারতকে বিরত রাখতে তাকে ভয় দেখানো। আর দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া। তবে সামরিকভাবে আমাদের এখনো একটা আশা। ভারতকে এটা বোঝানো যে, পরিস্থিতি কিন্তু খারাপের দিকে যাচ্ছে। আর রাশানদের বলা, তোমাদের কিন্তু চড়া

মূল্য দিতে হবে। এই বাক্য শেষে কিসিঞ্জারই আবার বলেন, কিন্তু মি. প্রেসিডেন্ট, এতে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ছয় বছর ধরে সামরিক ভারসাম্যহীনতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গড়িয়েছে। এটা রাতারাতি পূরণ করার নয়। প্রেসিডেন্ট জনসন এ জন্য প্রধানত দায়ী। তাছাড়া আমলাতন্ত্রও কম দায়ী নয়। আমরা তো জানতাম না '৭১-এ যুদ্ধ হবে। কিন্তু দেখুন তো, ইয়াহিয়াকে দেওয়া আপনার অস্ত্র সহায়তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার বছর পার হলো।

দুই নেতার এদিনের সংলাপে পরিষ্কার যে, তারা রাশিয়া ও ভারতকে স্রেফ ভয় দেখানো এবং চীন, জর্ডান ও ইরানকে উৎসাহিত করতেই বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিসিঞ্জার স্বীকার করেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার কার্যকর হাতিয়ার নেই। নিক্সন বলেন, আমরা তো চীনা সাহায্য ছাড়া এমন কিছু করতে পারি না। এরপর দুজনেই বুদ্ধি আঁটেন চীনাদের কাছে বার্তা পাঠাতে। চীন যেন সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি করে ভারতকে ভয় দেখাতে সচেষ্ট হয়। তারা দু'জনেই বলেন, আমরা যদি ঝুঁকি নিয়ে জর্ডানকে যুদ্ধবিমান পাঠাতে বলি, তাহলে আমরা চীনাদের খরবটা দিতে পারি। এবং বলতে পারি, তোমরা যদি সত্যিই পাকিস্তানের জন্য কিছু একটা করতে চাও, তাহলে এখনই উপযুক্ত সময়।

নিক্সন একমত হন : আমরা এটাই করব। কথা শেষ না হতেই কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার অবশ্য আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত যে, আমাদের এই ধাপ্পা যদি ধরা পড়ে, তাহলে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ব।'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার উভয়ে জর্ডানের যুদ্ধবিমান প্রেরণ, চীনের সেনা মোতায়েন ও বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর সম্ভাব্য উদ্যোগকে 'ড্রেস রিহার্সেল' বা যুদ্ধ নাটকের মহড়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী, এ রকমের প্রতারণাপূর্ণ সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরে নৌবহর প্রেরণের ধারণাটি প্রথম এবং আজই কিসিঞ্জারের জবানীতে এসেছে।

পাক অখণ্ডতা রক্ষায় রাশিয়ার ৪ শর্ত

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ নীরবে আত্মসমর্পণের সানাই বেজে ওঠে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আজ গভর্নর মালিকের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠান যে, আপনাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিলাম। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবেন তাতেই আমার সম্মতি থাকবে। জেনারেল নিয়াজিকেও আমি সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানিয়ে দেন, ভারতীয়রা এখন ঢাকা থেকে মাত্র ২২ মাইল দূরে। তাদের শুধু একটি বড় নদী পার হতে হবে।

ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণে মনস্থির করার পাশাপাশি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে তার সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তিনি এটা বলেছেন, তার সৈন্যরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবে। স্বপক্ষত্যাগের কিছু ঘটনা ঘটেছে তবে তা ব্যাপকভিত্তিক নয়। সেনাশৃঙ্খলাও ভেঙ্গে পড়েনি। দিল্লি সফররত মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'ব্যক্তিগতভাবে' এই সুপারিশ রাখেন যে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যসহ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সে

জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আজ নিক্সনকে দেওয়া কিসিঞ্জারের স্মারকে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঢাকা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট উভয় পক্ষের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছেন। বিদেশীদের সরিয়ে নিতে ২৪ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন তিনি। ভারত সাড়া দেয়নি। তারা বলেছে, এর আগে একই উদ্দেশ্যে দুটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভেস্তে যায়। ঢাকায় দুটি 'নিরাপদ নিরপেক্ষ এলাকা' সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিল জাতিসংঘ ও রেডক্রস। এই নিরপেক্ষ এলাকায় মার্কিন কূটনীতিকরাও ঠাঁই পাবেন। কারণ বাংলাদেশ দায়িত্বভার গ্রহণের পর তারা কূটনৈতিক অধিকার হারাবেন। উপরন্তু গেরিলাদের কাছ থেকে তারা বৈরী আচরণের আশঙ্কা করছেন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে এই তথ্যও দেন যে, যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি অন্যদের, বিশেষ করে ভুট্টোর কাঁধে চাপানোর জন্য ইয়াহিয়া বাঙালি নূরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী ও ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী করে বেসামরিক সরকার গঠন করেছেন।

আজ সকাল ১০টা ৯ মিনিট থেকে ১১ টা পর্যন্ত চলে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠক। এতে সিদ্ধান্ত হয়, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে আনতে জরুরিভিত্তিতে একটি কেরিয়ার টাস্কফোর্স (সপ্তম নৌবহর) মোতায়েনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। দুপুরের মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে তাদের মত দেবে। কিসিঞ্জার এই বৈঠকের শুরুতেই মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট ভারতের ব্যাখ্যায় আমেরিকান কর্মকর্তাদের দৃশ্যত সম্মতি দেখে অবাক হয়েছেন। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, ভারত তো শুধু দেশের ৬০ শতাংশ বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু সে ভূখণ্ড তারা করতলগতও করেনি। এতেই বুঝা যায়, ভারতের পাশে মার্কিন কর্মকর্তারা কীভাবে ঝুঁকে আছেন। কিসিঞ্জার স্পষ্ট করেন, ভারত যা বলেছে তা আমাদের অবস্থান নয়। প্রেসিডেন্ট চাইছেন এ প্রসঙ্গে ভারতের মনে কোনো ভুল ধারণা তৈরি না হোক। প্রেসিডেন্ট এটা আজকের মধ্যে শুধরে নিতে বলেছেন। অ্যাডমিরাল মুরার বৈঠকে উল্লেখ করেন, ভারতীয়রা এখন তাদের ডিভিশনগুলো পশ্চিম ফ্রন্টে নিয়ে আসবে। সম্ভবত ছয় ডিভিশনের মধ্যে চারটিই এখন পূর্ব পাকিস্তানে। তাদের পশ্চিম ফ্রন্টে আনতে এক থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। অবশ্য এটা নির্ভর করছে আকাশপথে তারা কতটা সৈন্য আনে তার ওপর। যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ফলাফল কিন্তু পাকিস্তানের জন্য অবশ্যম্ভাবী। এরপর কিসিঞ্জার বলেন, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণ আমাদের প্রতিহত করতে হবে। যদিও পরিণতি হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের মতোই ঘটবে। আর ভারতীয়রা তখন খণ্ডিত পাকিস্তানকে পূর্বে ভুটান ও পশ্চিমে নেপালের মতো নিয়ন্ত্রণ করবে।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার এদিন দুপুর ১২টা ৪৪ মিনিটে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আরেক দফা বৈঠকে বসেন। পাকিস্তান বিভক্তির আশু ফলাফল কী হতে পারে, কিসিঞ্জার তা ব্যাখ্যা করেন প্রেসিডেন্টের কাছে। বলেন, আমাদের এক মিত্রের এই দশা মধ্যপ্রাচ্য, ইরান ও ইন্দোনেশিয়াকে দারুণভাবে বিচলিত করবে। কিন্তু এই পর্যায়ে আমাদের পক্ষে তো আর কোনো ভালো সমঝোতার উপায় নেই। রাশিয়া যদি নিষ্ঠুর উপসংহার টানতে চায়, তাহলে আমরা হেরে যাব। কিসিঞ্জার অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ব্রেজনেভ তার চিঠিতে

যা উল্লেখ করেছেন, তা মেনে নিলে একটা আপস হয়তো এখনো সম্ভব। সোভিয়েত শর্ত চারটি : মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুর নিষ্পত্তি, একটি ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও মস্কো-ওয়াশিংটন একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠান। কিসিঞ্জার একইসঙ্গে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে একটি অভিন্ন অবস্থানে ঠেলে দেওয়ার বিপদ সম্পর্কেও রাশিয়া সচেতন। সুতরাং 'আমরা একেবারেই সম্পদ শূন্য নই'।

দুই নেতাই বঙ্গোপাসগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের নানামুখী সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মতবিনিময় করেন। পাকিস্তানকে আগ্রাসন থেকে রক্ষায় ওয়াশিংটন-পিণ্ডির কোনো গোপন চুক্তি নেই জেনেও কিসিঞ্জার নিক্সনকে পরামর্শ দেন, আমরা এ মুহূর্তে দুটো কাজ করতে পারি। প্রথমত, সংবাদপত্র বা অন্য কোনো উপায়ে রুশদের কাছে এটা ফাঁস করে দেব যে, ভারতের আগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে রক্ষায় কেনেডির সঙ্গে আইয়ুব খানের গোপন চুক্তি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বঙ্গোপসাগরে আমরা নৌবহর নিয়ে যাব। অজুহাত দেখাব, ঢাকার মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ। নিক্সন বলেন, চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নৌবহর মোতায়েনের পক্ষে। কিন্তু জনমতের কী হবে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বিষয়টিকে কীভাবে নেবে। আচ্ছা, শুধু আমাদের নাগরিকদের আনতেই কি নৌবহর সেখানে যেতে পারে না? কিসিঞ্জারের স্বগতোক্তি; কিন্তু যুদ্ধবিমানগুলো আমরা কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব? আমরা কি নিজেরাই নিজেদের পথ রুদ্ধ করছি? নিক্সন বলেন, তাহলে ওখানে নৌবহর নিয়ে লাভটা কী হবে? কিসিঞ্জারের জবাব, এটা হবে একটা প্রতীকী পদক্ষেপ। লোকে ভাববে এরপর আরো কিছু নিশ্চয় আসবে।

ব্রেজনেভের চিঠিতে অখণ্ড পাকিস্তানের ইঙ্গিত

১৯৭১, ১০ ডিসেম্বর। একাত্তরের এদিন সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন মার্কিন নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, বৃহৎ শক্তি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এ পর্যায়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানের হাল ছেড়ে দেয় পুরোপুরি। সপ্তম নৌবহর প্রেরণসহ অন্যান্য তৎপরতা দৃশ্যত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতীয়মান হলেও এসবের চরম লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা। কিন্তু তাও পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার কোনো পবিত্র উদ্দেশ্যে নয়। বিষয়টি ছিল কৌশলগত। সপ্তম নৌবহর যখন বঙ্গোপাসাগরে রওনা দেয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণের তোড়জোর শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘে জেনারেল রাও ফরমান আলীর আত্মসমর্পণের বার্তাও পৌঁছে গেছে। সে কারণে এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের মিত্র মুসলিম ও আরব দেশগুলোও ১০ ডিসেম্বর এসে অস্ত্র পাঠাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে মূলত পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায়। নিক্সন ও কিসিঞ্জার ডিসেম্বরের এই লগ্নে বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকাশ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বপক্ষে কথা বলেন। এটা ছিল কৌশলগত।

তারা সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ব্রেজনেভের সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ভাবেন, যদি তার মনের নাগাল মেলে। 'পশ্চিম পাকিস্তানকে ভারত দখল করে নেবে না'– দিল্লির এই আশ্বাস সম্পর্কে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ভরসা পাচ্ছিল না।

আজ নিউইয়র্কে কিসিঞ্জার জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টার এক বৈঠকে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। কিসিঞ্জার তাকে জানান, ৬ ডিসেম্বরে লেখা কিসিঞ্জারের চিঠির জবাব গতকাল সকালেই পাওয়া গেল। 'একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সংলাপ শুরু হওয়া দরকার।' ব্রেজনেভের এ কথার অর্থ পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সাপেক্ষে কি না তা নিয়ে কিসিঞ্জার-হুয়াং হোয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ব্রেজনেভ লিখেছেন, 'সঙ্গতকারণেই এই সমঝোতা শুরু হওয়া উচিত যেখানে তা ভেঙ্গে যায়।' কিসিঞ্জার ব্যাখ্যা দেন, তার মানে হচ্ছে সংলাপের ভিত্তি হবে অবিভক্ত পাকিস্তান। দোভাষী তাং এ সময় একাধিকবার কিসিঞ্জারের কাছ থেকে বিষয়টি বুঝে নেন। কিসিঞ্জার এই চিঠি লাভ করেন ওয়াশিংটনে সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি ভরোনথসোভের কাছ থেকে। কিসিঞ্জার বলেন, আমি তাকে বললাম, ২৫ মার্চে পাকিস্তান তো অবিভক্ত ছিল। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন। গতকাল আমরা জানলাম, সোভিয়েত কৃষিমন্ত্রী মাৎসকেভিচ ওয়াশিংটনে আসছেন। তিনি ব্রেজনেভের বন্ধু। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিসিঞ্জার বলেন, ভরোনথসোভের সঙ্গে ১৫ মিনিটের আলোচনায় আমি প্রেসিডেন্টের একটি বিবৃতি পড়ে শোনাই। এতে প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালানো হলে রুশ-মার্কিন বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। আজ ব্রেজনেভের কাছে প্রেরিত জবাবে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তানের পাক সামরিক অধিনায়ক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন। এখন যদি পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হয়, তাহলে আমরা ধরে নেব, ভারতীয় আগ্রাসন এখন সমগ্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। এবং তা এমন এক দেশের বিরুদ্ধে, যাদের নিরাপত্তা দিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।'

নিক্সনের এই চিঠি বিশ্লেষণে এমন ইঙ্গিত মেলে যে, পূর্ব পাকিস্তান নয়, এখন ভারত পশ্চিমের দিকে হাত বাড়ানোর ফলে তারা বেশি শঙ্কিত। লক্ষণীয়, এর আগে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিগত কোনো বাধ্যবাধকতার কথা এভাবে রুশ নেতাদের কাছে উল্লেখ করেননি।

আমরা জর্ডান, ইরান, সৌদি আরব ও তুরস্ককে বলেছি, ভিন্ন চ্যানেলে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে। তাদের বলেছি, তোমরা অস্ত্র দিলে আমাদের কিন্তু প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু এটা হবে লোক দেখানো। আমরা কিন্তু উঁচু গলায় সোচ্চার হব না। আজ জর্ডানের চারটি বিমান রওনা দেবে। সপ্তাহান্তে আরো ২২টি যাবে। অদূরভবিষ্যতে তুরস্ক দেবে ছয়টি বিমান। উপরন্তু আমাদের বেশকিছু রণতরী পশ্চিম প্যাসিফিক থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা শুরু করছে। চারটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি ট্যাঙ্কারসহ একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এবং একটি হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার ও দুটো ডেস্ট্রয়ার। মার্কিন নৌ সমরসজ্জার কাছে সোভিয়েত শক্তি যে কত নগণ্য তাও কিসিঞ্জার পুনঃপুন উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক শক্তি ধুলিসাৎ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বড়জোর দুই সপ্তাহের জ্বালানি রয়েছে বলে কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন।

কিসিঞ্জার চীনা প্রতিনিধিদের এ সময় ম্যাপ দিয়ে দেখিয়ে অধিকতর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন। তবে চীনা রাষ্ট্রদূত কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেননি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান ভারত দখল করে নিলেও তারা সামরিকভাবে আদৌ জড়াবে কি না সে ব্যাপারে

কোনো আভাস দেননি। তবে পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আগ্রাসনকে তিনি চীনকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে 'মাঞ্চুকো'র সঙ্গে তুলনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড মাঞ্চুকো জাপানি সহায়তায় নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে। এটি টিকে থাকে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

মার্কিন নথি অনুযায়ী একটি গোপন সূত্রমতে (নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে অনুমান করা চলে) ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ কোনো সূত্রে সিআইএ ইন্দিরার কিচেন কেবিনেটের খবর পেত, চীন ঢাকার পতনের আগমুহূর্তে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে-এ ধরনের একটি উক্তি করেছেন ইন্দিরা। এদিকে ইয়াহিয়া আজ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ধরাগলায় বলছেন, 'দেখুন, ভারত যা চাইছে, ঠিক তাই পূরণ করছে রাশিয়া। কিন্তু ফারল্যান্ড তাকে নতুন কিছুই জানাতে পারেননি।' জাতিসংঘে পাক স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখন্দ লিখেছেন, আমি আজ কেনেডি এয়ারপোর্টে জানলাম, 'জেনারেল রাও ফরমান আলীর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পেয়েছে জাতিসংঘ। এই বার্তার মূল কথা, তারা আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। একটু আগে নিউইয়র্ক পৌঁছে ভুট্টো এ কথা জেনে রীতিমতো হতবাক।' হামদুর রহমানের রিপোর্ট মতে, এই বার্তায় আত্মসমর্পণ না বলে 'যুদ্ধবিরতি' এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়। এতে বলা হয়, বাঙালি তাদের ভূখণ্ডে আর এক মুহূর্তের জন্যও ভারতীয় সৈন্য দেখতে চায় না।

মার্কিন ও সোভিয়েত নৌবহরের সমরসজ্জা

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। কিসিঞ্জার আজ নিক্সনকে এক স্মারকে জানিয়েছেন, অসমর্থিত সূত্রে এমন খবরও পাওয়া গেছে যে, সোভিয়েতের ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহরকে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এটা সত্য যে, আফ্রিকার উপকূল থেকে এই নৌবহরের যাত্রার জন্য কিছুটা সময় লেগে যাবে। ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত সোভিয়েত রণতরী ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত স্কোয়াড্রনকেও যুক্ত করতে পারে। একটি গাইডেড-মিসাইল, লাইট ক্রুজার, একটি ডিজেলচালিত ক্রুজ মিসাইল সাবমেরিন ও একটি তেলবাহী জাহাজ গতকাল সুসিমা প্রণালী দিয়ে জাপান সাগর ত্যাগ করেছে। এর গন্তব্য সম্ভবত ভারত মহাসাগর। ক্রুজার ও সাবমেরিন যৌথভাবে বিশটি এসএস-এনএস ক্রুজ মিসাইল বহন করছে। এ ছাড়া তিনটি স্পেস সাপোর্ট জাহাজসহ ষোলটি সোভিয়েত নৌ-ইউনিট বর্তমানে ভারত মহাসাগর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে। যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যের ইঙ্গিত হচ্ছে, বেশিরভাগ সোভিয়েত জাহাজ শ্রীলঙ্কা ও সোকোত্রার কাছাকাছি। যদিও আরব সাগরে একটি 'স্পেস-রিলেটেড ইউনিট' হয়তো ব্রিটিশ নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তবে এটা লক্ষণীয় যে, ষোলটি জাহাজের মধ্যে অর্ধেকেরও কম সমরসজ্জায় সজ্জিত। নিক্সন নিজ হাতে এই দলিলে নোট লিখেছেন, 'কে (কিসিঞ্জার), এসব কি পাল্টাব্যবস্থার লক্ষণ?'

নিক্সন ও কিসিঞ্জার নিজেদের সামরিক ক্ষমতা অনুশীলনের চিন্তা বাদ দিয়ে আজ চীনের আশায় প্রহর গোনেন। আজ বেলা ৩টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জারের আলোচনায় এই

বাস্তবতাই ফুটে ওঠে। কিন্তু আজই তারা জানতে পারেন চীন তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে।

কিসিঞ্জার : আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, চীনারা কিছু একটা করতে যাচ্ছে এবং আমরা শিগগিরই তা দেখব। আমার ভুলও হতে পারে। কারণ এ বিষয়ে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো গোয়েন্দা তথ্য নেই। নিক্সন : কিন্তু তারা যে কিছু একটা করছে তার তো কোনো আলামাত দেখছি না। কিসিঞ্জার : তারা তাদের মাউন্টেন ডিভিশনকে নির্দেশ দিয়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডে অবস্থানরত নিক্সনের সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে পুনরায় কথা বলেন কিসিঞ্জার। তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান, রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো সাড়া নেই। ভূট্টো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। কিন্তু আমি তা নাকচ করে দিয়েছি। চীনারা তাকে বলেছে, তারা কিছু করতে চায় বটে, কিন্তু আমাদের নিয়ে তাদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে, কারণ আমরা বলতে শুরু করেছিলাম এটা এক আগ্রাসন। কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করেছি। তার পরে বলেছি 'এটা যথার্থ ছিল না।' কিন্তু পরে সে অবস্থান থেকেও সরে এসে ঘোষণা দিয়েছি 'কঠোর নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার। এখন রুশরা যদি চীনাদের চাপ দেয়, তাহলে আমরা কী করব, সে বিষয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইছে। কিসিঞ্জার এ পর্যায়ে বলেন, আপনি বুঝতেই পারেন, আমি ভুট্টোকে সাহায্য করতে পারিনি। ভুট্টোর মতে, চীনারা বলেছে রুশরা বিশ্বের বৃহত্তম কাপুরুষ।

এদিন সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি ভরোনৎসোভ টেলিফোনে কথা বলেন কিসিঞ্জারের সঙ্গে। কিসিঞ্জার জানতে পারেন যে, সোভিয়েত উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাসিলি কুজনেৎসোভ এক মিশনে দিল্লি যাচ্ছেন। দুজনের কয়েক মিনিটের আলোচনার ট্রান্সক্রিপশন থেকে দেখা যাচ্ছে, কিসিঞ্জারের সঙ্গে ভরোনৎসোভের এদিনের আলোচনা ছিল হেঁয়ালিপূর্ণ। তিনি কুজনেৎসোভের ভারত সফর সম্পর্কে বলেন, 'আমার এটা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, আমরা যা নিয়ে আলোচনা (যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমঝোতা) করেছি নিশ্চয় এই মিশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু সরকারিভাবে আমি আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।' গত মে মাসে মার্কিন গোপন দলিল প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক প্যানেল ফুটনোটে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, আজ রাত পৌনে ৯টায় কিসিঞ্জার নিক্সনকে ওই সোভিয়েত উদ্যোগের কথা উৎসাহের সঙ্গে জানান। কিন্তু নিক্সন ছিলেন সংশয়গ্রস্ত।

নিউইয়র্কে অবস্থানরত ভুট্টোর সঙ্গে কিসিঞ্জার ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে কথা বলেন। কিসিঞ্জার শুরুতেই অভিমানের সুরে বলন, মি. ভুট্টো, আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান হচ্ছে : প্রথমত, আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, তার আলোকে এটা নিরঙ্কুশভাবে আবশ্যক যে, আমরা যে পর্যাপ্ত কিছু করিনি তা আমরা চীনা অভিযোগের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে চাই না। কারণ অভিযোগের ধরণ যদি এই হয়, তাহলে কেন আমরা কিছু করতে যাব। আমি বলতে চাইছি, আমরা আমাদের জনমতের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আমাদের সমগ্র আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। ভুট্টো এ সময় বলেন, আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি। কিন্তু তাকে

থামিয়ে দিয়ে কিসিঞ্জার তাকে বলতে থাকেন, আগামীকাল সকালের মধ্যে সোভিয়েতের কাছ থেকে আমরা যদি কিছু শুনতে না পাই তাহলে কঠোর বিবৃতি দিয়ে আমরা নিরাপত্তা পরিষদে যাব। বলব, এখন যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অর্থ হচ্ছে এটা আগ্রাসনের এক নগ্ন দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া আমরা 'পাবলিক স্টেটমেন্ট'ও দেব। আর সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান নিয়ে আর সন্দেহ থাকবে না।

সম্ভবত পূর্বাংশের স্বাধীনতার অনিবার্যতার দিকে ইঙ্গিত করে কিসিঞ্জার বলেন, যা ঘটেছে তাতে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে আপনাদের অস্তিত্ব টেকানো। কিসিঞ্জারের এই বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, এই সময়ে বাংলাদেশের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা আসলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তান/পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কিসিঞ্জার ভুট্টোকে বারবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীনা অবিশ্বাস নিয়ে খোঁটা দিলে ভুট্টো বলেন, আশা করি আপনি ভুল বুঝবেন না। আমরা চীনাদের বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট। কিসিঞ্জার তাকে বলেন, যা হোক চীনাদের এখন এটা বোঝান যে, আমাদের সঙ্গে শক্তিশালী সমর্থক রয়েছে। আগামীকাল রাতের মধ্যে সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করবে।

বাংলাদেশ জবরদখলে চীনকে অনুরোধ

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১। জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখন্দ লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের অবস্থার ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবনতি ঘটছিল। আজ সন্ধ্যায় ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরেন। তার দুই ঘণ্টার বক্তব্যে সতর্কতার সঙ্গে সামরিক শাসকদের অবস্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। পাকিস্তান মিশনের একজন কর্মকর্তা ভারতীয় কূটনীতিকের একটি মন্তব্য শুনে ফেলেন। এ কূটনীতিক রুশ কমকর্তাকে বলছিলেন, মঙ্গল বা বুধবার পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা ঝুলিয়ে রাখতে। কারণ এর মধ্যেই ঢাকা ভারতের করায়ত্ত হবে। সোভিয়েতরা কালক্ষেপণের কৌশল নিয়েছিলেন। জেকব মালিক রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিকে 'আমাদের চোখের আপেল লেনিনের স্বপ্ন' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেন।

গত মে মাসে প্রকাশিত মার্কিন গোপন নথি পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী কুজনেৎসোভের দিল্লি মিশন ছিল ওই চুক্তির আওতায়, কিসিঞ্জারকে যা বুঝতে দেননি সোভিয়েত মিনিস্টার কাউন্সিলর ইউরি ভরোনৎসোভ। দেখা যাচ্ছে চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে ওয়াশিংটন ও পিন্ডিতে এক ধরনের ধূম্রজাল তৈরি হয়। পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান এম খান (মেমোরিজ এ্যান্ড রিফ্লেকশনস, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯) লিখেছেন, এদিনে আমি চীনা রাষ্ট্রদূতকে ডেকে আনলাম। আগের দিন তার সঙ্গে প্রেডিসেন্টের আলোচনার সূত্রে জানতে চাইলাম, বেইজিংয়ের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন কি না? সুলতানের বর্ণনায়, ইয়াহিয়া কার্যত এটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রাশিয়ার পরিবর্তে চীন নিয়ে নিলেই তিনি খুশি। আমি চীনা রাষ্ট্রদূতকে বললাম– মার্কিন উদ্যোগে ভরসা নেই। আপনারা কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ না করলে পূর্ব পাকিস্তানকে আর

রক্ষা করা সম্বব হবে না। 'আমি যদিও জানতাম, চীনা হস্তক্ষেপের আশা বাস্তবসম্মত নয়, তার পরও রাষ্ট্রদূত দিনের শেষভাগে আমার কাছে ফের এলেন। বললেন, চীন পাকিস্তানকে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে। কিন্তু সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তার সাধ্য সীমিত। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ এখন জরুরি। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জটিল। গিরিপথ তুষার-আবৃত। সে কারণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে চীনাদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। দয়া করে আমাদের ওপর বেশি আশা করবেন না। সপ্তম নৌবহর আসছে, এতে নিশ্চয় কাজ হবে।'

চীনা রাষ্ট্রদূত যখন এসব কথাবার্তা বলছেন, তখন ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া তার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, ইসলামাবাদে চীনা রাষ্ট্রদূত তাকে এ মর্মে আশ্বস্ত করেছেন যে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে চীনা সেনাবাহিনী নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করছে। কিসিঞ্জার অবশ্য সিআইএ ও ডিআইএর বরাতে তথ্য দেন, তিব্বতে চীনাদের কোনো অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর তারা পাননি।

এদিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত পক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর আলোচনা চলে। আজই প্রথম হটলাইনে দুই পক্ষের মধ্যে ঘড়ি ধরে মতবিনিময় চলে। রাশিয়ার কাছ থেকে নিক্সন-কিসিঞ্জারের শুধু যেন একটি বিষয়ই নিশ্চিত হওয়ার ছিল। এ দুজন দিনভর বলা চলে টান টান উত্তেজনায় ছিলেন। কিসিঞ্জার রাশিয়াকে ভয় দেখাতে কেনেডি সম্পাদিত 'গোপন চুক্তির' কপি ভরোনৎসোভকে দেখান। এবং জানিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে চীনের সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেবে। ভরোনৎসোভ অবশ্য কিসিঞ্জারকে দিনের শুরুতেই জানিয়ে দেন, মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে তারা আশ্বাস পেয়েছেন যে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালাবে না। কিন্তু এটা ছিল তাদের 'অন্তর্বর্তীকালীন' জবাব। তাই এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না নিক্সন-কিসিঞ্জার। তারা চেয়েছিলেন পাকা কথা। কিসিঞ্জার মনে করেছেন, সোভিয়েতরা এই ইস্যুতে আর যাই হোক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে না। তবে কিসিঞ্জারের ভয় ছিল অন্যত্র। তার ভাষায় 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার ভুল হতে পারে কিন্তু কমিউনিস্টরা সাধারণত সমঝোতার প্রক্রিয়াকে সুরাহার কাজে নয়, প্যাঁচ লাগাতেই ব্যবহার করে।'

সকাল ১০টা ৪৫। ভরোনৎসোভ জেনারেল হেগের কাছে ইংরেজিতে হাতে লেখা একটি নোট নিয়ে এসেছেন। তার অনুরোধ এটা নিক্সনকে পৌঁছে দিতে হবে। এর ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ব্রেজনেভের সঙ্গে নিক্সনের হটলাইন স্থাপন হওয়ায় অনুমিত হয় বার্তাটি এসেছে ব্রেজনেভের কাছ থেকে। এতে বলা হয়েছে, নিক্সন তার চিঠিতে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ প্রথমবারের মতো ভারত সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছেন। এতে নিশ্চিত জবাব মিলেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলায় ভারতের কোনো লক্ষ্য নেই। এতেও যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি কাটেনি। এর কারণ হতে পারে এই যে, নিউইয়র্কে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার তিন সহকর্মী কাউল, ঝা ও সেনের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত বুশকে (সিনিয়র) বলেছেন, বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের অর্থ হচ্ছে ভারতের যে কোনো ভূখণ্ডগত উদ্দেশ্য

নেই তা স্পষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, ভারত বিশ্বাস করে যে, সেখানে বহু ধরনের বিরোধপূর্ণ শক্তির খেলা শুরু হয়েছে। ক্ষমতার শূন্যতা যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য উদার, নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক গ্রুপকে তারা সমর্থন দিয়েছে। বুশের বর্ণনায়, মুক্তিবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে তাদের দাবি।

বুশ এক তারবার্তায় স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান, 'পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের ভূখণ্ডগত কোনো টার্গেট নেই।' তবে এই প্রতিশ্রুতি ভারত রক্ষা করতে অপারগ থাকবে, যদি পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। যদি তারা পূর্ব পাকিস্তান হারানোর ক্ষতিপূরণ উসুল করতে চায়। আমাদের প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় প্রতিনিধি দল কিন্তু আজাদ কাশ্মির প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ৯ ডিসেম্বর ঝা বলেছেন, ভারত মনে করে কাশ্মির ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভারত যখন তার ভূখণ্ডগত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে, তখন তা কিন্তু আজাদ কাশ্মিরকে স্পর্শ করে না। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরউইন অবশ্য এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ঝা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কাশ্মিরে সীমান্ত রেখা পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা ওয়াশিংটন বরদাসত করবে না।

সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট। জেনারেল হেগের সঙ্গে ভরোনৎসোভের টেলিসংলাপ। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের কাছ থেকে তার প্রস্তাবের অনুকূল সাড়া পেতে অধিকতর আগ্রহী। আর সে কারণেই সপ্তম নৌবহরের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তত ২৪ ঘণ্টার জন্য। ভরোনৎসোভ এটা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, ধন্যবাদ জেনারেল। আমরা এ সময়ে সুফল পেতে পারি।

এদিন বেলা সোয়া ১১টায় ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে অ্যাডমিরাল মুরার তথ্য দেন, সপ্তম নৌবহরকে মালাক্কা প্রণালী (মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া যেখানে পৃথক হয়েছে) দিয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সপ্তম নৌবহরে অবস্থানরত সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে ১৬ ডিসেম্বর সকালে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিন বেলা পৌনে ১২টায় ও সাড়ে ১২টায় কিসিঞ্জার ও ভরোনৎসোভের মধ্যে দুই দফা টেলিসংলাপ চলে। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্টের মনোভাব হচ্ছে আমরা এমনভাবে এই সংকট মোকাবিলা করব, যাতে কারো জয় বা পরাজয় না ঘটে। এবং আমরা প্রকাশ্যে কারো মার্যাদাহানি করা থেকেও বিরত থাকব।

মস্কোর জবাবের অপেক্ষায় ওয়াশিংটন

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। স্নায়ুযুদ্ধ-যুগের দুই পরাশক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রশ্নে এক বিরল গোপন আলোচনায় যোগ দিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে। ওয়াশিংটন নিশ্চিত হতে চাইছে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়তো অবশ্যম্ভাবী। তারা এটুকু মানতে রাজি কিন্তু ভারতকে কোনো অবস্থাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা চালাতে দেওয়া যাবে না। আজাদ কাশ্মির দখলের কোনো আশা থাকলে তা তাদের ত্যাগ করতে হবে। ভারত যদিও বলেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কোনো ভূখণ্ডগত উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তাতে ভরসা পাননি নিক্সন ও কিসিঞ্জার। আর সে কারণে মস্কোর সঙ্গে মধ্য ডিসেম্বরের এই দিনগুলোয় ওয়াশিংটনের হটলাইন সক্রিয়। ওয়াশিংটনের কাছে গোপন সূত্রে এমন একটি খবর ছিল, যাতে ভারতের

একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিক বলেছেন, কাশ্মির করায়ত্তের এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে, মস্কোর সঙ্গে হটলাইন স্থাপনের কারণেই সপ্তম নৌবহরের অগ্রযাত্রা শ্লথ করা হয়। দুই পরাশক্তিই ভিন্ন স্বার্থ খুঁজে পায়, তারা পাক-ভারত ইস্যুতে আর যা-ই হোক, যুদ্ধে জড়াবে না।

প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার আজ প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপসহকারী জেনারেল হেগের কাছে এজোর্স দ্বীপ থেকে প্রেরিত এক তারবার্তায় পাক-ভারত সংকট সম্পর্কে তার সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। তিনি আজ স্পষ্টই জানিয়ে দেন– যা কিছুই ঘটুক না কেন, সপ্তম নৌবহরকে অবশ্যই ভারত মহাসাগরে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নেওয়ার দরকার নেই। কিসিঞ্জার প্রশ্ন রাখেন– সপ্তম নৌবহরকে আমরা একদিনের জন্য কি সিঙ্গাপুরে রাখতে পারি? তিনি বিষয়টি নিয়ে নিক্সন, রজার্স ও কোনালির সঙ্গে আলোচনার পরামর্শ দেন। কিসিঞ্জার আরো উল্লেখ করেন যে, আমার সুপারিশ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদে যদি অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে অথবা সোভিয়েতেরা আবারও ভেটো দেয়, তাহলেও আমাদের উচিত হবে যুদ্ধবিরতি ও পরে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সমর্থন করা। এমনকি সোভিয়েতের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেলেও এটাই হবে আমাদের অবস্থান। পাক পররাষ্ট্রসচিব সুলতান লিখেছেন, 'আজ যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে বৈরিতা বন্ধ এবং ভারত ও পাকিস্তানী সৈন্যদের পরস্পরের ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়া সংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবে জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালার আওতায় উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছাপ্রত্যাবাসন্-সংক্রান্ত শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়।' আসলে উভয় পক্ষই এভাবে চাইছিলেন কালক্ষেপণ।

নিক্সন প্রশাসন আজও সোভিয়েতের কাছ থেকে প্রত্যাশিত জবাব পায়নি। তবে মস্কো থেকে নিক্সনের কাছে এই বার্তা পৌঁছায় যে, 'আমাদের মধ্যে যে গোপন মতবিনিময় চলছে, তার ভিত্তিতে আমরা আপনাকে এটা জানাচ্ছি যে, ভারতের সঙ্গে পুরো বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলাফল কোনো বিলম্ব ছাড়াই আপনাকে অবহিত করব।' এই বার্তার সঙ্গে যুক্ত থাকা একটি হাতে লেখা নোট থেকে ইঙ্গিত মিলছে যে, বার্তাটি এদিন ভোর ৫টায় ওয়াশিংটনে পৌঁছায়। হটলাইনে আসা এই বার্তাটি কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো হয় ৭টা ৩৭ মিনিটে। এ সম্পর্কে হেগের মন্তব্য : 'সন্দেহ নেই আমরা এখনো পর্যন্ত না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায়।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব জাতিসংঘের মাধ্যমে কীভাবে কার্যকর হবে তা নিয়ে ইয়াহিয়া ও নিক্সনের নীতিনির্ধারকরা ব্যস্ত ছিলেন। বিকেল ৪টা ৭ মিনিটে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে হেগ এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় জানান, 'সোভিয়েতের সঙ্গে একটা আপস ফর্মুলায় পৌঁছাতে ভুট্টো নিউইয়র্কে রাষ্ট্রদূত বুশের সঙ্গে কথা বলেছেন। এতে আমাদের আনীত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের প্রতি একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সমঝোতায় অবিভক্ত পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার আশু স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।'

জেনারেল হেগ ১৩ ডিসেম্বর এসে ভুট্টোর অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রস্তাবের নাজুক দিক সম্পর্কে ফারল্যান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হেগ লিখেছেন, 'এই পর্যায়ে এমন প্রস্তাব উত্থাপন আমাদের অবস্থানকে দ্রুত জলাঞ্জলি দিতে পারে। সোভিয়েতরা অবিভক্ত পাকিস্তান কথাটিতে ভেটো দেবে এবং তার পরিণতিতে সৃষ্টি হবে অচলাবস্থা। রাজনৈতিক প্রশ্নে বিতর্ক শুরু করলে তা অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে পৌঁছে দেবে শূন্যের কোঠায়।' হেগ ফারল্যান্ডকে দ্রুত জানাতে বলেন যে, ভুট্টোর এই প্রস্তাবে ইসলামাবাদের নীতি প্রতিফলিত হয়েছে কি না? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে তার ভিত্তি কী? যোশেফ ফারল্যান্ড বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন পাক পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের সঙ্গে। তিনি তাকে নিশ্চিত করেন যে, ভুট্টোর ওই উদ্যোগে ইয়াহিয়ার অনুমোদন রয়েছে।

ওদিকে জাতিসংঘের কাছে জেনারেল রাও ফরমান আলীর ইতিপূর্বের 'আত্মসমর্পণ' বার্তা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত উদ্যোগ নেন। সুলতান খান তার 'মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশন্সে' লিখেছেন, যুদ্ধবিরতির জন্য রাও ফরমান আলীর প্রস্তাবে সরকারের সায় রয়েছে কি না– সোভিয়েত দূতের এই প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, জেনারেল ফরমান আলী তার অধিকারের সীমা অতিক্রম করেছেন। ঢাকায় জাতিসংঘ প্রতিনিধি ও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে তার এই বার্তা পাঠানো ঠিক হয়নি।

এদিকে কিসিঞ্জার নিক্সনকে দেওয়া এক স্মারকে আজ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড জানিয়েছেন যে, ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপদ এলাকায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর ও জাতিসংঘের দুটি বিমান ভারতীয় হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান দুটি পাকিস্তানী বিমান থেকে পৃথক এলাকায় রাখা ছিল। আমাদের প্রতিরক্ষা প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত যে, ভারত দুটি বিমানই পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে। এ ঘটনার পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা-কে তলব করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো জবাব দেয়নি। ঝা যুক্তি দিয়েছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে নিরপেক্ষ কোনো দেশের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা শনাক্তকরণ সমস্যার কারণে দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে বলে ঝা উল্লেখ করেন। রজার্স অবশ্য ঝাকে বলেছেন, জাতিসংঘের বিমানটির রঙ ছিল সাদা। সুতরাং ভুলবশত এটা ঘটেছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, আমি এ ব্যাপারে আর কোনো পদক্ষেপ না নিতে বলেছি।

'বাংলাদেশ' এড়াতে কিসিঞ্জারের কৌশল

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সোভিয়েত পক্ষ থেকে আজ নিক্সনের কাছে চূড়ান্ত বার্তা এল। নিশ্চয়তা দেওয়া হলো, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, সৈন্য প্রত্যাহার ও উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করলে ভারত যুদ্ধবিরতি ও তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানে তার কোনো অভিসন্ধি নেই।

বার্তায় বলা হলো, মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা আমাদের গোপন চ্যানেলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখব। জেনারেল হেগ এজোর্সে অবস্থানরত কিসিঞ্জারের কাছে বার্তা পাঠালেন,

ঢাকার কনসাল জেনারেল স্পিভাক আজ এক টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, গর্ভনর মালিক ও জেনারেল ফরমান আলী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আর আশাবাদের কিছু নেই। এখন পাইকারি হত্যা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। স্পিভাক মত দিলেন, 'যা করার দ্রুত করতে হবে, নইলে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।' স্পিভাক আরো জানালেন, ফারল্যান্ড ইসলামাবাদে চূড়ান্ত আপস প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। যদিও তিনি ওয়াশিংটনকে এখনো কিছু জানান নি। হেগ উল্লেখ করেন, সোভিয়েতরা তাদের চূড়ান্ত জবাব দিতে লম্বা সময় নেয়, পূর্ব পাকিস্তানে পাক সৈন্যদের ভেঙ্গে পড়া প্রত্যক্ষ করতে। যদিও তারা তাদের বার্তায় বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা কথাটি উল্লেখ করেনি কিন্তু তারা যেসব শর্ত বেঁধে দিয়েছে, তার অর্থ প্রকারান্তরে তাই দাঁড়ায়। ইউরি ভরোনৎসোভ আপনার সঙ্গে আলোচনায় 'ওয়ান-পাকিস্তান ' প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছিলেন, তার কিন্তু কোনো উল্লেখ তাদের এই আনুষ্ঠানিক জবাবে নেই। আমরা এখন যা মোটামুটি নিশ্চিত ধরে নিতে পারি তা হলো, আমরা এমন ব্যবস্থা নিতে পারি, যা পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। কিন্তু এটা প্রশ্নাতীত যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে পাকিস্তান ও চীনের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের বিষয়টি কিন্তু অনিশ্চিত থাকছে। এদিনই আরেক তারবার্তায় হেগ কিসিঞ্জারের কাছে সপ্তম নৌবহরকে ফিরিয়ে আনতে পরামর্শ চান। গতকাল এজোর্সে কিসিঞ্জার এক টেলিগ্রামে পাকিস্তানী দূত রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি বার্তার বিষয়বস্তু জানতে পারে। এতে বলা হয়, সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে (ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণ থেকে) পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে। ইয়াহিয়া আজ এক চিঠিতে নিক্সনকে বলেন, সপ্তম নৌবহরকে আমাদের উপকূলে (করাচিতে) শুধু পৌঁছালেই হবে না, ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচাতেও এখন একে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। এ থেকেও একটা ধারণা মেলে যে, সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইয়াহিয়া ১৪ ডিসেম্বর এসেও হাল ছাড়েননি। 'আবেগের সঙ্গে তিনি নিক্সনকে লিখেছেন, এখন তো সবটাই স্পষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক বিজয়ের জন্যই রাশানরা কালক্ষেপণ করেছিল। আর এখন তাদের সমঝোতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ দখলের পরে পশ্চিম পাকিস্তান জবরদখলে তারা তাদের পেশিশক্তি ব্যবহার করবে। রাশিয়ার ভূমিকা উন্মোচিত এবং ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আপনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় উচিত পদক্ষেপ নিলে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তা গ্রহণ করবে। নিয়াজিকে হাল ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে এই চিঠিতে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে প্রাধান্য দেন। ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় জানান, আজ দুপুরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইয়াহিয়া আমাকে টেলিফোন করেন, বলেন, যেকোনোভাবেই হোক অনতিবিলম্বে আমাকে কুড়িটি বি-৫৭ বিমান দিন।

এদিকে ঢাকার কনসাল জেনারেল আজ এক টেলিগ্রামে জানান, জেনারেল নিয়াজি আজ বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে জরুরিভিত্তিতে তার দপ্তরে দেখা করতে বললেন। আমি গিয়ে দেখলাম নিয়াজি ও ফরমান আলী বসে আছেন। নিয়াজি বললেন, আমরা অযথা রক্তপাত বন্ধ করতে চাই। যদিও আমার সৈন্যরা এখনো ভালো অবস্থায় আছে। এ মুহূর্তে

তারা বিপদাপন্ন নয়। সামান্য আলোচনার পরে দুজনে সই করে আমাকে একটি চিঠি দিলেন। এতে শর্তসাপেক্ষে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নিয়াজি ও ফরমান আলী 'আত্মসমর্পণ' কথাটি এড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। লক্ষণীয়, নিয়াজির এই চিঠিতে যুদ্ধবিরতির শর্তে '৭১-এর মার্চ থেকে প্রশাসনকে সহযোগিতাকারী অর্থাৎ রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না গ্রহণের কথা বলা হয়।

নিয়াজি দাবি করেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। স্পিভাক লিখেছেন, যখন আমি তাকে নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করলাম, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বা ইসলামাবাদে অন্য কারো কাছ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন আছে কি না তখন তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন, না। ফারল্যান্ড এদিনই পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, নিয়াজির ওইরূপ ক্ষমতা অনুশীলনে ইয়াহিয়ার সায় রয়েছে। ইয়াহিয়া এই প্রস্তাব দিল্লি ও ভুট্টোর কাছে পৌঁছাতেও অনুমতি দিয়েছেন। ভুট্টো অথবা জাতিসংঘ মহাসচিবকে দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংকে অবহিত করতে বলা হয়। কিন্তু ভুট্টো তাতে রাজি হননি। ইয়াহিয়া ভারতকে প্রস্তাবটি জানাতে চাইছেন– যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পুনর্নিশ্চিত হয়ে জাতিসংঘে তাদের মিশনকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেয়, ভারতকে এটা বলতে হবে যে, এই বার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ। তার কোনো ভূমিকা নেই।

গভর্নর মালিক গতকাল ইয়াহিয়ার কাছে এক বার্তায় উল্লেখ করেন, তার কাছে খবর রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক নির্বিশেষে সব পশ্চিম পাকিস্তানীকে ভারতীয় সেনাবাহিনী হত্যা করবে। ফারল্যান্ড আজ এক টেলিগ্রামে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে এ তথ্য দিয়ে বলেন, মালিক ও তার মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধে যেকোনো শর্তে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কবুল করে নিতে।

কিসিঞ্জার হেগের ওই টেলিগ্রামের জবাবে জানান, আমাদের উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা। সবচেয়ে ভালো হয় ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলে। মনে রাখতে হবে প্রস্তাব এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে 'বাংলাদেশ' কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ ছাড়াই একটা কৃত্রিম রাজনৈতিক ফর্মুলার কথা বলা থাকে। স্পিভাকও যেন 'বাংলাদেশ' থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলেকজান্ডার হেগ (জুনিয়র) আজ দুপুরে ১২টা ২২ মিনিটে সোভিয়েত মিনিস্টার ভরোনৎসোভকে তলব করেন। হেগ বলেন, আপনাদের বার্তা পরীক্ষা করে আমরা দেখলাম, এটা অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এমনকি সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিম পাকিস্তানী ভূখণ্ড দখলে ভারতের পরিকল্পনা নেই— একথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর মোতায়েনে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকোর সঙ্গে দেখা করে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সন্ধ্যা ৬টা কিসিঞ্জার, ভরোনৎসোভ ও হেগ ওয়াশিংটনে বৈঠকে মিলিত হন। কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জানে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ধরনের একটি পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্র কবুল করতে পারে না। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু জিইয়ে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন

বাংলাদেশের মতো ইস্যুতে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে যাবে। এদিকে রজার্স ফারল্যান্ডকে এক টেলিগ্রামে জানান, বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা দখল করে নিলে আপনি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে বিরত থাকবেন।

পশতুন সীমান্তেও আক্রমণ

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১। জেনারেল মানেকশ দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংয়ের মাধ্যমে নিয়াজির কাছে পৌঁছে দিলেন 'আত্মসমর্পণের' ৬ শর্ত। এটা মানা না হলে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সকাল ৯টায় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে কোনো বিকল্প থাকবে না। এই বার্তায় দুপক্ষের মধ্যে সরাসরি সংলাপের জন্য আজই রেডিও লিংক চালু করার কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যখন আত্মসমর্পণের এ প্রক্রিয়া চলছে, ওয়াশিংটনে তখন নিক্সন ও কিসিঞ্জার উদ্বেগের সঙ্গে সর্বশেষ পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন। ওভাল অফিসে নিক্সন কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করেন। 'সোভিয়েতরা নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর হামলা হবে না।' নিক্সন প্রশ্ন রাখেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের এই প্রকাশ্য সমঝোতায় চীনের প্রতিক্রিয়া কি? জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায়, তাহলে চীনারা তো আহ্লাদে আটখানা হবে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে এটাও জানান যে, আমি ভরোনৎসোভকে বলেছি, দেখ আমার সঙ্গে আইনী প্যাঁচ খেলবে না। নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, কোনো বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড অর্থাৎ আজাদ কাশ্মির গ্রাস করা যাবে না। আগের সীমান্ত রেখাই অপরিবর্তিত রাখতে হবে। ভরোনৎসোভ নিশ্চয়তা দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারই রক্ষাকবচ দিচ্ছি।

দুই নেতার সংলাপ বৃত্তান্তে এটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, এদিন তারা পূর্ব পাকিস্তান হারানো নিয়ে কোনো বেদনা নয়; বরং আজাদ কাশ্মিরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারায় নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। কিসিঞ্জার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট, এটা একটা নিরঙ্কুশ অলৌকিক ঘটনা। আমি এ পর্যন্ত যত গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়েছি, তাতে সন্দেহাতীতভাবে এই উপসংহারই টানা হয় যে, ভারতের কৌশল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করা। কিসিঞ্জার আজ নিক্সনকে দেওয়া এক স্মারকে গোপন সূত্রের বরাতে উল্লেখ করেন, কাশ্মিরে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। অন্যদিকে ঢাকার কয়েক মাইলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা পৌঁছে গেছে। লক্ষণীয়, এদিন এক গোপন সূত্রের (ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) বরাতে কিসিঞ্জার জানাচ্ছেন, চীন পশ্চিম পাকিস্তানকে সম্ভবত কিছু মিগ-১৯ দিচ্ছে। জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি বলেছেন, '১৫ ডিসেম্বর চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদক্ষেপ নেবে' কিন্তু আমাদের সূত্র বলেছে, 'মধ্যপ্রাচ্য কিংবা কোনো মুসলিম দেশ থেকেই পাকিস্তান সামরিক সাহায্য পায়নি।'

নভেম্বরের শেষাশেষি থেকে বহু রিপোর্ট মিলেছে যে, এসব দেশ পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, জর্ডান, সৌদি আরব, লিবিয়া ও মিসর। কিন্তু কোনো রিপোর্ট থেকেই এটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে, খুচরা যন্ত্রাংশ বলুন কিংবা যুদ্ধ বিমান– কেউ কিছু আদৌ দিয়েছে। আমাদের সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করছে এবং তা ১৫ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি পৌঁছবে।

গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। কিটিং জানিয়েছেন, এসব খবরে ভারতে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন স্থাপনা ও নাগরিক 'নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।' কিসিঞ্জারের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রিটেনও ওই এলাকায় কিছু রণতরী মোতায়েনে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের একটি কমান্ডো ক্যারিয়ার ও একটি ফ্রিগেট শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলে রয়েছে। সোভিয়েত টাস্ক ফোর্স (একটি গাইডেড মিসাইল ক্রুজার, একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ও একটি ডিজেল চালিত সাবমেরিন সমন্বয়ে গঠিত) দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে ক্রমেই ভারত মহাসাগারের দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে ওই এলাকায় তারা তিনদিনের মধ্যে পৌঁছবে। অবশ্য ভারত মহাসাগরে আগে থেকেই ১২টি সোভিয়েত জাহাজ রয়েছে। তবে তাদের কোনোটিই পাক-ভারত সংঘাতে নিজেদের জড়াতে কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

কিসিঞ্জার আজ ওয়াশিংটনে বেলা সাড়ে ১১টায় কোসিগিনকে লেখা যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি খসড়া চিঠি ভরোনৎসোভকে হস্তান্তর করেন। কিসিঞ্জার এ সময় যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘে ব্রিটিশ প্রস্তাব সমর্থনে আগ্রহ ব্যক্ত করলে ভরোনৎসোভ বলেন, না, আমরা কিন্তু পোলিশ প্রস্তাবের পক্ষে। অন্যান্য দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান জাতিসংঘে প্রস্তাবের সম্ভাব্য বাক্য গঠন নিয়ে যথেষ্ট সংবেদনশীলতা দেখায়। তাদের ভীতি ছিল একটাই– এ ধরনের প্রস্তাব থেকে কোনোভাবে যেন আজাদ কাশ্মিরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিষয়ে কোনো গলদ সৃষ্টি না হয়। ভরোনৎসোভ তাই এদিন মরিয়া হয়ে বলেন, 'তারা কাশ্মিরসহ পশ্চিম পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কিন্তু, প্রকাশ্যে তারা এটা বলছেন না এই বিবেচনায় যে, ভারত বিব্রত হবে। ভরোনৎসোভের কথায় ভারত তো আমাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র নয়।' নিক্সন কোসিগিনকে লেখা চিঠির শুরুতেই বলেন, পূর্ব পাকিস্তান এক পরিণতি পাচ্ছে। এখন আমাদের পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ থামাতে হবে। কেউ যাতে কারো ভূখণ্ড দখল করতে না পারে, পরাশক্তি হিসেবে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

ফারল্যান্ড এক ব্যাক চ্যানেল বার্তায় কিসিঞ্জারকে জানান, পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান আজ আমাকে ডেকে বললেন, পাকিস্তানী গোয়েন্দারা খবর দিয়েছেন যে, ভারতীয়রা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আফগান সীমান্ত (সম্ভবত পশতুন সীমান্ত এলাকা) থেকে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে উসকানি দিচ্ছে। এখন পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি জাতি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হলে অবিলম্বে অতিরিক্ত যুদ্ধবিমান দিতে হবে। বর্তমানে আমাদের যে মিগ-১৯ ও এফ-১০৪ রয়েছে, তা দিয়ে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা প্রতিরোধ করা যাবে না। নিক্সনকে লেখা ইন্দিরা গান্ধীর একটি চিঠি রাষ্ট্রদূত ঝা আজ স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে দেন। আবেগ দিয়ে লেখা এ চিঠিতে ইন্দিরা প্রশ্ন রাখেন, মি. প্রেসিডেন্ট, আমি আমার সর্বতো বিশ্বস্ততা দিয়ে এই প্রশ্ন রাখছি যে, একমাত্র ব্যক্তি শেখ মুজিবের মুক্তি অথবা তার সঙ্গে গোপন সমঝোতা নিশ্চিত করা কি একটি যুদ্ধ পরিচালনার চেয়ে অধিকতর বিপর্যয়কর বলে গণ্য হতো? ....

"২৪ বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে পরিচালিত পাকিস্তানের সর্বাত্মক 'হেট ক্যাম্পেন' থেকে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত হতে হবে। আমার পিতা এবং আমি ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে আগ্রাসন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই তারা নাকচ করে দিয়েছে।"

আজ বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মধ্যে শেষ দফা (প্রাপ্ত দলিল অনুযায়ী) টেলিসংলাপ চলে। এবং বিস্ময়কর হলো, এতো কিছুর পরও তাদের মন থেকে এই দ্বন্দ্ব ঘোচেনি যে, রুশ-ভারত অক্ষ শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতকে বিশ্বাস করা যায় না। তারা এখন চাইছে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলা জাতিসংঘকে দিয়ে অনুমোদন করতে। এর অর্থ হচ্ছে, আগ্রাসনে জাতিসংঘকে পার্টি করা। সোভিয়েতরা একটু আগে বলেছে, তারা ব্রিটিশ প্রস্তাবে ভেটো দেবে। লক্ষণীয়, ব্রিটেন বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও শেষ পর্যায়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের মন রক্ষার একটা চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানের জাতিসংঘ স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখন্দ লিখেছেন, ১৫ ডিসেম্বর পোলিশ প্রস্তাব যখন টেবিলে এল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিরাপত্তা পরিষদের লাউঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি দলের চার্লি নাস আমাকে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষাই এখন সমস্যা।

পাক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খান লিখেছেন, ১৫ ডিসেম্বর মধ্যরাতে দুবার ফারল্যান্ড আমার সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রথমবার তিনি নিয়াজি ও ফরমান আলীর স্বাক্ষরিত চিঠির সত্যতা যাচাই এবং পরে নিয়াজিকে লেখা ভারতীয় সেনাপ্রধানের বার্তা নিয়ে হাজির হন। এ বার্তায় তিনি বাংলাদেশে আমার কাছে আত্মসমর্পণকারীদের, নিরাপত্তাদানে অঙ্গীকার করেন। সুলতানের মতে, নিয়াজি আসলে একটি যুদ্ধবিরতি ও তার সৈন্যদের 'রিগ্রুপিং'-এর প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাপ্রধান একে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণে পরিণত করেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত শুধু সামরিক বিজয় অর্জন করেনি, ব্রিটিশদের ভারতে পৌঁছার আগে যে মুসলমানরা শত শত বছর ধরে উপমহাদেশ শাসন করেছে, সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ভারত নিশ্চিত করতে পারল এক মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। তার কথায়, 'পাকিস্তানের জন্য এই বৃহত্তম ট্র্যাজেডি নিশ্চিত হয় পূর্ব পাকিস্তানকে ২৪ বছর ধরে বঞ্চনা ও দুঃশাসনের ধারাবাহিকতায়। মনে রাখতে হবে, ভারতের তৎপরতা ছিল এক নগ্ন আগ্রাসন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাজি না থাকলে এটা করার সাহস তারা পেত না।' ভারত আজ রাত ৮টায় পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়।

সোভিয়েতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, 'চীনের জন্য অবিশ্বাস্য বিপর্যয়', হিসেবে বর্ণনা করেন। '৭১-এর এ দিনে ওয়াশিংটন সময় সকাল সাড়ে ৯টায় নিক্সন ও কিসিঞ্জারের টেলি-সংলাপের ট্রান্সক্রিপশন থেকে দেখা যাচ্ছে, যখন ঢাকায় আত্মসমর্পণের তোড়জোড় চলছে, তখনো তারা পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। নিক্সন বলেছেন, ভারত যদি তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে, তাহলে আমরা এমনকি দিল্লির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের সিদ্ধান্ত নেব। আপনি কি একমত নন হেনরি? 'আমি একমত। ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী বিজয় বিবৃতি ঘোষিত হয়েছে। এবং তা চীনাদের জন্য এক অবিশ্বাস্য অভিঘাত। এর কোনোটিতেই অবশ্য আমাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই তাদের অপদস্থ করেছে।' কিসিঞ্জার এই প্রথম নিক্সনকে জানালেন, জর্ডান ১৭টি প্লেন পাঠিয়েছে। দুই নেতাই পশ্চিম পাকিস্তান

প্রশ্নে রাশিয়ার মনোভাবে সংশয়গ্রস্থ থেকেই খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান প্রশ্নে কোনো হুমকি দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য কী ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিয়ে তারা মতবিনিময় করেন। নিক্সনের মন্তব্য : 'মধ্যপ্রাচ্যের আলোচনা বন্ধ করে দিন, ইসরায়েলকে তুলে দিন অস্ত্র। ভেঙ্গে দিন সল্ট আলোচনা। এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ প্রকাশ্যে এর ভয়ঙ্কর দিক সম্পর্কে বিবৃতি দিক। আমি প্রয়োজনে আরো বহুদূর যাব। বাণিজ্যসংক্রান্ত আলোচনা আমরা বন্ধ করে দেব। এবং আনাতলি দোবরিনিনের সঙ্গেও যেকোনো পরিস্থিতিতে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হবে।' পশ্চিম পাকিস্তানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কার্যকর না হলে নিক্সন নির্দেশ দেন বাজেট থেকে প্রদেয় ভারতের কাছ থেকে সব সাহায্য কেড়ে নিতে। নিক্সন ১ ঘণ্টার মধ্যে ভারতকে কী কী উপায়ে শায়েস্তা করা যায় তা জানাতে নির্দেশ দেন। কিসিঞ্জারের সঙ্গে এই সংলাপ শেষের অল্প পরেই ১০টা ৪০ মিনিটে কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, ভারত একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে পশ্চিম ফ্রন্টে। কিসিঞ্জার ভারতের ওপর এ লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আজ নিক্সনকে দেওয়া কিসিঞ্জারের এক স্মারকে তথ্য দেন, গত ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের পাক ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে সোভিয়েতরা দৃশ্যত উৎসাহিত যেমন করেনি, তেমনি গুরুত্বের সঙ্গে নিরুৎসাহিতও করেনি। এক আলোচনায় (সূত্র ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পেগভ কথিতমতে বলেছেন, পাকিস্তানের যুদ্ধযন্ত্র ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় হামলার দরকার ছিল না। কিন্তু তারপরও রুশ পরামর্শ উপেক্ষা করে ভারত যদি পাক অধিকৃত কাশ্মির দখল করে নিতে চায়, তাহলে এটা যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে সোভিয়েতরা 'হস্তক্ষেপ করবে না'। পেগভ এবং অন্য আরেক রুশ কূটনীতিক একই দিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে কথা বলেছেন। পেগভ বলেছেন, সোভিয়েত নৌবহরও ভারত মহাসাগরে রয়েছে। এবং তারা সপ্তম নৌবহরকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। চীনারা যদি লাদাখে আক্রমণ করে, তাহলে 'সোভিয়েতরা চীনা প্রদেশ সিনকিয়াংয়ে পাল্টা হামলা চালাবে। এই দলিল থেকে আরেকটি ইঙ্গিত মিলছে যে, সোভিয়েতরা ভারতের স্বপক্ষে সর্বাত্মক অবস্থান গ্রহণ করলেও তারা পাকিস্তানের সঙ্গে অবশিষ্ট সম্পর্ক নস্যাৎ করতে চায়নি। সোভিয়েত উপ-প্রধানমন্ত্রী কুজনেৎসোভ আলোচনাকালে (কার সঙ্গে তা ডিক্লাসিফাই করা হয়নি) বলেছেন, অন্তত ঢাকার পতন এবং পাক সেনাবাহিনীর কবল থেকে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইসলামাবাদের সঙ্গে তাদের যতটুকু সখ্য রয়েছে, তা তারা বজায় রাখতে চায়। এ কারণেই ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সইয়ে রাজি হয়নি। এই দলিলে আরো তথ্য দেওয়া হয়েছে, সিকিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের অনুপ্রবেশের (শত্রুপক্ষের অবস্থান জানতে) প্রতিবাদে চীন শক্তিশালী প্রতিবাদ জানিয়েছে। চীন এই তৎপরতাকে 'ভয়ঙ্কর অনুপ্রবেশ' এবং তা 'অবিলম্বে বন্ধের' দাবি জানায়। কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, এটা সম্ভবত একটা অজুহাত। এর মাধ্যমে চীন ভারত সীমান্তে সীমিত সামরিক অভিযান বজায় রাখবে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের

ফ্রন্ট থেকে ভারতের মনোযোগ সরিয়ে রাখা। কিসিঞ্জার জানান, আমাদের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের কাছে শ্রীলঙ্কার পূর্বে অবস্থান করছে। এদিন নয়াদিল্লিতে স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ঘোষণা করেন, জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় ১ ঘণ্টা আগে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। ভারত পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। এবং ভারতের কোনো ভূখণ্ডগত অভিসন্ধি নেই। কিন্তু মার্কিন নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, পাক রাষ্ট্রদূত এক ব্যাকচ্যানেল বার্তায় কিসিঞ্জারকে জানান, ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমি এই মাত্র খবর পেয়েছি, ভারত তাদের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্যকর রাখবে। আমি আরো জানতে পেরেছি, সোভিয়েতেরা নিরাপত্তা পরিষদে এমন এক প্রস্তাব আনতে যাচ্ছে যা বাড়তি বিতর্কের জন্ম দেবে। সুতরাং ইয়াহিয়ার উচিত হবে কালবিলম্ব না করে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়া। সে ক্ষেত্রে পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করতে পারবে না। এদিক ভরোনৎসোভ সোভিয়েতের খসড়া প্রস্তাব কিসিঞ্জারকে পড়ে শোনান। নিক্সন একমত হন এ প্রস্তাব আগের চেয়ে উন্নত। কিন্তু এখনো সমর্থনযোগ্য নয়।

জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখন্দ লিখেছেন, অবজারভার পত্রিকার ১৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় গেভিন ইয়ং লিখেছেন, ইয়াহিয়া নিয়াজিকে আশ্বস্ত করেছিলেন, আমেরিকান ও চীনা হস্তক্ষেপ আসন্ন।

হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে আপস ও প্রকৃত আত্মসমর্পণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতীয় দল আত্মসমর্পণের জন্য যে দলিলটি নিয়ে এলেন তাতে বলা হলো ভারতীয় ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কেউ কেউ আপত্তি তুললেন। বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণের কথাটিতে বাদ সাধলেন। কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া হলো এই আত্মসমর্পণ আসলে ভারতের কাছে। বাংলাদেশের উল্লেখ শুধুই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। নিয়াজি ও তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকি আপত্তি করেননি। বরং এটাই স্পষ্ট প্রতীমান হয় যে, তারা একটি যুক্তি দেখাতে চেয়েছেন। আর তা হলো, তারা এই ভেবে শঙ্কিত ছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী ও তাদের অনুগতদের যদি মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে রক্তপাত অনিবার্য হতে পারে। কমিশন বলেছে, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এই ভীতি যথার্থ ছিল না। কমিশনের বর্ণনায় একজন প্রত্যক্ষদর্শীও কথিত ভীতির সত্যতা কবুল করেননি। জেনারেল জেকব পাইপ টানতে টানতে বলেছেন, এই খসড়া দিল্লি থেকে এসেছে। কোনো সংশোধন ছাড়াই এটি সই করতে হবে। কমিশন পক্ষপাত দেখিয়েছে এই অভিযোগের প্রতি : 'নিয়াজি ও বকরের সঙ্গে ভারতীয়দের গোপন সমঝোতা হয়। তাদের পরে বিশেষ আতিথ্য দিতে দেখা গেছে। আরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে নিয়াজির এয়ারপোর্টে গমন ছিল বাহুল্য।'

রিচার্ড সিশন ও লিওই রোজ মন্তব্য করেছেন, আত্মসমর্পণের শর্তাবলি প্রণয়নের উদ্যোক্তা ছিলেন জেনারেল মানেকশ। ১৬ ডিসেম্বর এই দলিলটি জেনারেল জেকব হস্তান্তর করেন নিয়াজির কাছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কেনেডীকে লেখা সিনেটর এডওয়ার্ড-এর চিঠি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী মার্কিন সিনেট সদস্য মি. এডওয়ার্ড কেনেডীর নিকট এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল শরণার্থী ভারতে গিয়েছেন তাদের ফিরে আসতে বাধা না দেয় তাহলে সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। শরণার্থীদের ফিরে আসা ও পুনর্বাসনের জন্য পাকিস্তান যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সৈন্যবাহিনী পূর্ববঙ্গে যে আন্দোলন দমন করেছে তা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলন নয়। যে সব নেতা নির্বাচকমণ্ডলির রায় অতিক্রম করে অতিরিক্ত দাবিদাওয়া করেছিলেন তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের দল বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। যারা দেশে রয়ে গিয়েছেন কেবল তারাই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কাঠামো গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। পাকিস্তান যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রসংঘের সনদ বিরোধী হবে।"

ঘানা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মি. টমাস ওডুরো কোয়ার্টেন বলেছিলেন–

"বিদেশের রাষ্ট্রগুলোর একটা ভুল ধারণা আছে যে, আজ বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যে বাংলাদেশের নেতাদের বিদেশে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচারকার্য চালাতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বর্বরতা তুলে ধরতে হবে। বিদেশের রাষ্ট্রগুলির নিকট এ কথাটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, বাংলাদেশের আজকের ঘটনার সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের অতীত তিক্ততার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের আজকের ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানের কৃতকর্মের ফল। এটা কিছুতেই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা ফরাসি দার্শনিক-লেখক আঁদ্রে মালরো'র অংশবিশেষ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ লে ফিগারোতে প্রকাশিত

যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী অর্থাৎ আপনার সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের নগ্নপদ যোদ্ধাদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো, আপনি কেমন করে বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতার

জন্য উদ্বেল একটি দেশ এক হাজার ২০০ মাইল দূর থেকে এসে ইসলামাবাদ পুনরুদ্ধার করতে পারবে?

বঙ্গোপসাগরে উড়োজাহাজবাহী রণতরী পাঠানো– যখন পৃথিবীর নিয়তি অনিশ্চিত- এটা কোনো নীতি হতে পারে না। হতে পারে কেবলই অতীতের ধ্বংসস্তূপ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী

হিজ এক্সিলেন্সি, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আপনি ৪ ডিসেম্বর যে বার্তাটি পাঠিয়েছেন, তা আমাকে এবং ভারত সরকারকে আমার সহকর্মীদের বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। বার্তাটি পাওয়ার পর আপনারা যেভাবে আত্মনিবেদিত হয়ে বাংলাদেশকে পরিচালনা করছেন, সেই দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি ভারত সরকার পুনরায় বিবেচনা করে। আমি হৃষ্টচিত্তে আপনাকে জানাতে চাই, বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তার আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'আজ সকালে এ বিষয়ে আমি আমাদের সংসদে একটি বিবৃতি দিয়েছি। বিবৃতির অনুলিপি সংযুক্ত করছি।

বাংলাদেশের মানুষকে অনেক ভুগতে হয়েছে। আপনার তরুণ ছেলেরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আত্মবলিদানের সংগ্রামে লিপ্ত। ভারতের জনগণও একই আদর্শের প্রতি- রক্ষায় লড়ে যাচ্ছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এই শ্রেষ্ঠতম উদ্যোগ এবং আত্মদান ভালো কাজের জন্য আমাদের আত্মনিবেদনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে। যা হোক, পথ যত দীর্ঘই হোক, আত্মদান যত বেশিই হোক, আমাদের দুই দেশের মানুষের ভবিষ্যতে ডাক পড়বে, আমি নিশ্চিত আমরা বিজয়ীই হব।

ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে, আপনার সহকর্মীদের এবং বাংলাদেশর বীর জনতাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ নিচ্ছি।

আপনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সিলেন্সি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আমার সর্বোচ্চ সম্মানের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করবেন।

হিজ এক্সিলেন্সি মিস্টার তাজউদ্দিন আহমদ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
মুজিবনগর

আপনার একান্ত
(স্বাক্ষরিত)
ইন্দিরা গান্ধী
৬/১২/১৯৭১

১২ আগস্ট, ১৯৭১। অক্সফাম আমেরিকার নির্বাহী পরিচালক থিওডোরা ফস্টার শরণার্থী সহায়তার জন্য যে চিঠি লেখেন, তা মানবিক সহায়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই চিঠিই প্রচারপত্র হিসেবে বিলি করা হয়।

থিওডোরা ফস্টারের খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধু,

ধরুন, আপনাকে এবং সঙ্গে আরও ৭০ লাখ আমেরিকানকে (নিউইয়র্ক সিটির প্রায় সবাই) হঠাৎ পালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকো চলে যেতে হলো। সঙ্গে আর কিছু নেই, পিঠের ওপর কেবল কিছু কাপড়। আপনি কি সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবেন? আর আপনি কি আশা করেন যে, মেক্সিকো আপনার এবং আর সবার দায়িত্ব নিতে পারবে?

ভারতে পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের মধ্যে এখন ঠিক এ রকম একটি অবস্থা বিরাজ করছে। মরিয়া হয়ে ওঠা এই শরণার্থীদের খাবার, আশ্রয় ও জরুরি চিকিৎসা প্রদানের যে বোঝা ভারত সরকারের ওপর চেপেছে, তা তারা সাধ্যমতো বহন করে চলেছে; কিন্তু ভারত তো একা এ কাজ সামলাতে পারবে না।

আমরা যারা ধনবান দেশে বাস করি, ক্ষুধা ও অসুখের কারণে মৃত্যুর হাত থেকে শত-সহস্র নিরপরাধ শিশু ও বয়স্ক মানুষকে বাঁচাতে আমরাই একমাত্র ভরসা। অনেক আমেরিকান, কানাডিয়ান ও ব্রিটিশ অক্সফামের মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য পাঠাতে ছুটে এসেছেন। অক্সফামে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ১৯৪২ সাল থেকে দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সহায়তা করে আসছে। অক্সফাম লক্ষ রাখবে, যাতে আপনার ডলারটি এই সংকটে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে।

আপনার চেক অনুগ্রহ করে অক্সফাম আমেরিকা, স্যুট ৫০৯, ১০২৮, কানেক্টিকাট এভিনিউ, এন ডব্লিউ ওয়াশিংটন ডিসি- ২০০৩৬ ঠিকানায় পাঠান। আপনার দান কর রেয়াতযোগ্য।

আক্ষরিকভাবেই আজ জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা আপনার হাতে। আপনার কলম হাতে নিন এবং জীবনের পক্ষে একটি ভোট দিন।

আপনার একান্ত
থিওডোরা সি ফস্টার
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
অক্সফাম, আমেরিকা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির চিঠি,

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট,

ঢাকায় আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার খবর এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক প্রশাসনের চরম ব্যবস্থা গ্রহণ ও সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, ভোগান্তি ও দুস্থাবস্থায় সোভিয়েত জনগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। এম রহমান ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ, যাঁরা সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সমর্থনে বিজয়ী হয়ে এসেছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েত জনগণ সব

সময়ই পাকিস্তানের জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করেছে এবং যেসব জটিল সমস্যা দেশ মোকাবিলা করেছে, গণতান্ত্রিকভাবে এর সমাধানে যখনই এসেছে, সোভিয়েত জনগণ আনন্দ প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানী জনগণের এই সংকটের দিনে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে কিছু কথা না বলে পারছি না। আমরা বিশ্বাস করি, পাকিস্তানে শেষ দিকে যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, কোনো ধরনের বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করা সম্ভব এবং তাই করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার, অবদমন ও রক্তপাত অব্যাহত রেখে সমাধানকে আরও কঠিন করে তোলা হবে এবং তা পাকিস্তানের সব মানুষের মৌল স্বার্থের প্রচণ্ড ক্ষতি করে ছাড়বে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েত প্রেসিডিয়ামের পক্ষে আপনাকে জানানো আমাদের কর্তব্য যে অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নিপীড়ন কমিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখুন। আমরা মনে করি, কেবল তাতেই জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এবং আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত জনগণ শান্তিপূর্ণ সমাধান সানন্দে গ্রহণ করবে।

বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার মানবিক নীতিমালা অনুসরণ করে আমরা এই আপিল জানাচ্ছি, আমরা পাকিস্তানের বন্ধুপ্রতিম জনগণের সম্মতিতে তাদের সবার জন্য এই আপিল পেশ করছি।

প্রেসিডেন্ট সাহেব, আমরা আশা করব, এ চিঠির প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে আপনি সক্ষম হবেন। আমাদের একান্ত প্রত্যাশা, অবিলম্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।

নিকোলাই পদগর্নি
প্রেসিডেন্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন
মস্কো, ক্রেমলিন, ২/৪/১৯৭১

জন স্টোনহাউস ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই চিঠি দ্য লন্ডন টাইমস-এর সম্পাদককে লেখা, ৮ জুন, ১৯৭১-এ প্রকাশিত।

মর্মন্তুদ অপরাধ

পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে মানবতার বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ অপরাধ করে যাচ্ছে, তার সাক্ষ্য মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বাস্তবিকই দেশ ছেড়ে পালানো বাস্তুত্যাগীদের যে স্রোতধারা, তা-ই প্রমাণ করে তাদের অপরাধকর্ম এখনো চলছে।

এ জনস্রোত সামলে নেওয়ার যে অতিকায় সমস্যা, তা লাঘব করতে ভারত সরকারকে সাহায্য করতে হবে। এটা ঠিক। কিন্তু ৪০ লাখ শরণার্থী হচ্ছে দুর্যোগের লক্ষণ, দুর্যোগের কারণ নয়। দৃঢ়ভাবে গণহত্যা বন্ধের উদ্যোগ না নিয়ে ক্ষতস্থানে কেবল মলমের ছোঁয়া লাগিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় বিবেককে আর কত কাল ঘুম পাড়িয়ে রাখবে? পাকিস্তানের জন্য প্রদেয় সাহায্য কেটে শরণার্থীদের জন্য দিয়ে দেওয়ার আলোচনা প্রশংসনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়।

জন স্টোন হাউস এমপি।

হাডসন, ওয়াহিও
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

সিনেটর স্যাক্সবিকে জন রোহ্ড

মাননীয় উইলিয়াম বি স্যাক্সবি
নিউ সিনেট অফিস বিল্ডিং
ওয়াশিংটন ডিসি।

প্রিয় সিনেটর স্যাক্সবি,

দু'দিন আগে আমার স্ত্রী ও আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। ইউএসএআইডির ডাক্তার হিসেবে আমি গত তিন বছর সেখানে কর্মরত ছিলাম। ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলি আপনার জানা আছে, এটা আমি নিশ্চিত। কিন্তু পুরোপুরি সেন্সরশিপ আরোপ, সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা, পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর প্রচারণা এবং দাবিয়ে রাখা– সব মিলিয়ে সে দিনের পর পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে, সে খবর জানা খুবই কষ্টকর। সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকেই আমেরিকার কনসাল জেনারেল এবং তাঁর অধীন, কর্মচারীরা সব ঘটনার বাস্তব বিবরণ ফার্স হ্যান্ড রিপোর্ট পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন। এসব প্রতিবেদন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ করা হতো, পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানোর আগে যাচাই করা হতো। পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশ্যে বলছে, তাদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। কিন্তু প্রতিদিন আমি তথ্যবহুল প্রতিবেদন ঢাকা থেকে পাঠাতে দেখেছি। করাচিতে কর্মরত আমেরিকান কনসাল আমাকে বলেছেন, অতি সম্প্রতি তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের এসব বিবরণ পেতে শুরু করেছেন, অথচ ঢাকা কনস্যুলেট একেবারে শুরু থেকে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছে।

যদিও কনসাল ব্লাডের (আর্চার ব্লাড) প্রতিবেদনে বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে বিবৃত, আমি কতগুলো পর্যবেক্ষণের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২৫ মার্চ রাতে আমি ও আমার স্ত্রী ছাদের ওপর থেকে আর্টিলারি ও মর্টারের গোলার আগুনের লাল শিখা দেখেছি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক বের হয়ে আসছে। গোলা বর্ষিত হচ্ছে জনাকীর্ণ বস্তি ও বজারের ওপর। দুদিনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দের মধ্যে যখন কারফিউ ভাঙ্গল, আমরা শহরের ভেতর গাড়ি চালিয়ে এগোতে থাকলাম। যারা শহর ছাড়ছে, তাদের ভিড় ঠেলে গুলশান থেকে মহাখালী আসার পথে দেখলাম, রেললাইনের ধারের ঝুপড়িগুলো আগুনে পোড়া। কাছাকাছি বসবাস করা আমার এক বাঙালি বন্ধু দেখেছেন, সেনাসদস্যরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আর যখন একটি পরিবার ছুটে বের হয়ে আসছে, তখন তাদের কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে। আমরা যখন তাকেসহ ১২ জনের পরিবারটিকে আমাদের বাসায় আশ্রয় দিতে চাইলাম, তিনি রাজি হলেন।

পুরোনো শহরে আমরা নয়াবাজারে ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। এখানে হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরেরা কাজ করত, এখন সেখানে কিছু লোহার পাত ও ধিকিধিকি জ্বলা ধ্বংসাবশেষ। শাঁখারি বাজারের হিন্দু দোকানদার ও কারিগর যারা তখনো বোমার

ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে জীবিত, মরিয়া হয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইল– অভিযানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেনাবাহিনী এলাকার সবাইকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ চালায়। একজনের পেটে গুলি লাগে। আমরা পৌঁছার মাত্র আধঘণ্টা আগে মারা যায়। অন্যরা রাস্তায় পড়ে আছে, পঁচছে। যেদিন আমাদের ঢাকা ছাড়তে হলো, তার আগের দিন শাঁখারি বাজার গিয়ে দেখলাম, হিন্দুদের বাড়ির ওপর উর্দু হরফে মুসলমানদের নাম লেখা। ২৯ মার্চ আমরা রমনা কালিবাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। ঢাকার কেন্দ্রে রমনা রেসকোর্সের ভেতর এ পুরোনো গ্রামটিতে প্রায় আড়াই শ' মানুষ বাস করত। দেখলাম, মেশিনগানের গুলিতে ও আগুনে পোড়া পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের স্তূপ। সেদিনই অতিভোরে তাদের হত্যা করা হয়েছে, আমি ঘটনার ক' ঘণ্টা পর এ দৃশ্যের ছবি তুললাম।

সদরঘাট, শাঁখারিপট্টি, রায়েরবাজার, নয়াবাজার, ও ঠাঁটারি বাজারে হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর, ভিটি পর্যন্ত পোড়া।

২৯ তারিখে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের আবাসন জনগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলাম। সেনাবাহিনীর ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। জগন্নাথ হলের নিবাসী সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। যেদিক দিয়ে ট্যাংক গিয়েছে, ভাঙ্গা দেয়াল চোখে পড়ল। হলের সামনে ট্যাংক চলাচলের চিহ্ন এবং গণকবর। একজনের সঙ্গে কথা হলো– তাকে মৃতদেহ টেনে বের করতে বাধ্য করা হয়েছে, তিনি এক কবরে ১০৩ জনের লাশ গুনেছেন। বাইরে ডর্মেটরির দেয়ালে বড় বড় ছিদ্র, ভেতরে রুমে রুমে তখনো ধোঁয়া আর মেঝে রক্তাক্ত। আমরা ইকবাল হলেও ট্যাংক আক্রমণের চিহ্ন দেখলাম, সেখানে মৃতদেহগুলো পড়ে আছে, তখনো কবর দেওয়া হয়নি।

পরের দুই সপ্তাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকসহ পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিধন করা হলো। তাদের মধ্যে রয়েছে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জি সি দেব, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. নাকভি, ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. আলী।

অধ্যাপকদের পরিবারের অনেক সদস্য গুলিবিদ্ধ হন। এসবের পুরো দলিলীকরণ খুব কঠিন কাজ, ঢাকা ছাড়ার সময় সেনাবাহিনী তন্নতন্ন করে তল্লাসি করে। তিনটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা.অফিস দ্য পিপল, ইত্তেফাক ও সংবাদ কার্যালয় পুড়িয়ে ফেলার পর সংবাদ পরিবেশনের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়।

প্রথম দু'দিনের আক্রমণের পরও সামরিক বাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত থাকে। পয়লা এপ্রিল খুব ভোরে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় আর্টিলারি গোলা বর্ষণ চলে। সন্ত্রস্ত ঢাকা শহর থেকে পলায়নপর প্রায় এক লাখ মানুষ তখন জিঞ্জিরায়। রেডিও পাকিস্তান ক্রমাগত বলতে থাকে, ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। কিন্তু আমরা দেখলাম, প্রায় জনশূন্য একটি শহর।

ঢাকার উপশহর গুলশান, যেখানে আমরা থাকতাম। দেখলাম, শিশু পার্কের সামনে থেকে দায়িত্বরত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সদস্যদের নিরস্ত্র করা হয়; কাছের একটি বাজারে সেনারা খাবারের দোকানে লুটপাট চালায়। ইপিআর সদস্যদের নিয়ে যাওয়ার জন্য

বলপূর্বক একটি ট্রাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়– এর চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। হাজার হাজার বাঙালি পুলিশ ও ইপিআর সদস্যের গণহত্যার চিত্র ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে দেখলাম, গুলশান লেকে কম বয়সী ছেলেরা সাঁতার কাটছিল, সেনাসদস্যরা সেখানে তিনবার গুলি করে। প্রায় প্রতি রাতে আমার বাসার আশেপাশে গোলাগুলির শব্দ শুনি। আমার বাসায় আশ্রয় নেওয়া মোট ২৬ জন মানুষের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দেয়।

অনেক সুনির্দিষ্ট নৃশংসতার বিবরণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব; কিন্তু আমরা পেছনে যেসব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের রেখে এসেছি এতে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এটা এখন স্পষ্ট, পূর্ব পাকিস্তানে জংলি আইনের রাজত্ব চলছে– নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা, বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত বিনাশ এবং হিন্দুদের নিঃশেষ করে দেওয়ার কাজ বেশ এগোচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনতার ওপর যে অনৈতিক আঘাত করে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোনো ধরনের বিবৃতি না দেওয়াতে মনে হচ্ছে বরং তাদের সমর্থনই করছে। আমাদের পাকিস্তানী বাণিজ্যিক উড়োজাহাজে উঠিয়ে আনা হয়েছে। এ উড়োজাহাজ বোঝাই পাকিস্তানী সেনা ও সামরিক রসদ নামানোর পর আমাদের উঠানো হয়। আমেরিকার সাহায্য নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানে কাজে লাগছে। তেহরানে পাকিস্তানের স্থানীয় সহায়তা না পাওয়ায় আমি বার্তাটি পাঠাতে পারিনি।

এই সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা কিংবা বাঙালিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করার সামর্থ্য আমাদের সরকারের নেই– এটা পুরোপুরি মেনে নিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে অমানবিক আচরণ পাচ্ছে, অন্তত তার নিন্দা জানানোর জন্য আপনি কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্টের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবেন, এ আমার আরজি।

কোনো রাজনৈতিক বিবেচনাই মানবিক ভূমিকাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না– ব্যক্তির জীবনের মূল্য সরকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আমেরিকান বিশ্বাস পুনরুক্তি করতে হচ্ছে।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যার পেছনে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ শতাংশ মানুষের সমর্থন—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন; যে দেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বড়াই করে, এ ঘটনায় সে দেশের জেগে ওঠার কথা।

আমাদের নিবেদন, পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের এ ট্র্যাজিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে আপনি সক্রিয়ভাবে মুখ খুলুন।

আপনার একান্ত

জন ই রোহ্ড, এমডি

ইউ এস এ আই ডি'র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অংশে কর্মরত।

এ মর্মন্তুদ চিঠিটি সিনেটে উপস্থাপিত হয় ১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল।

সিনেটর স্যাক্সবিকে লেখা তাঁর চিঠিটি যুক্তরাষ্ট্র কাঁপিয়ে দিয়েছে। সমর্থন জুগিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশকে। চিঠিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।



বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে মুজিবনগর থেকে পোস্টারটি প্রকাশ করেছিলেন নূরুল ইসলাম। ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের মাধ্যমে পোস্টারটি পৃথিবীর বহু দেশে পাঠানো হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এবং বিদেশে পোস্টারটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ছবি : সংগ্রহ



মানবতার চরম লাঞ্ছনার একটি নিদর্শন : ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্যরা এভাবে কাপড় খুলে দেখত কে মুসলমান আর কে অমুসলমান। ছবি : সংগ্রহ



ই-পি-আর-এর গুলিতে আহত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ ১৯-১-৬৯। ছবি : সংগ্রহ



আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজীকে নিয়ে চলেছেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দার। ছবি : কিশোর পারেখ



তৃষ্ণার্ত মিছিলকারীদের পানি খাওয়াচ্ছেন ইডেন কলেজ হোস্টেলের ছাত্রীরা।

ছবি : সংগ্রহ



পুলিশের উপর ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। ছবি : সংগ্রহ



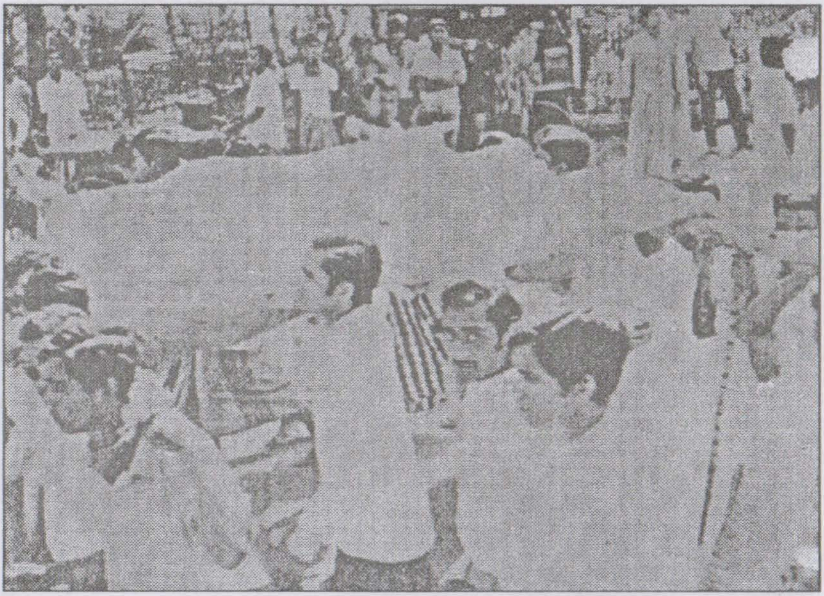
শান্তি কমিটি গঠনের সূত্রপাত। টিক্কাখানের সঙ্গে বৈঠকরত ১২ জন রাজনৈতিক নেতার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের নেতা নুরুল আমিন ও গোলাম আযম। ছবি : দৈনিক পূর্বদেশ ৬-৪-৭১



একদিন পোস্তগোলায় মুক্তিযুদ্ধের সহযাত্রী মনে করে একজন বাঙালী ড্রাইভারকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। ছবি : সংগ্রহ



৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের টোকাই-এর ছবি। ছবি : সংগ্রহ



একজন শহীদের মরদেহ ২৪-১-৬৯। ছবি : সংগ্রহ



'৭২-এ ঢাকার নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে দু'জন নির্যাতিতা নারী। ছবি : সংগ্রহ



শহীদ রুস্তম ২৪.০১.৬৯। ছবি : সংগ্রহ



১৯৭১-এ লাখ লাখ শরণার্থীর কয়েকজন। ছবি : রোমানা ক্যানিওনির



জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সভা শেষে মিছিল। ছবি : রশীদ তালুকদার



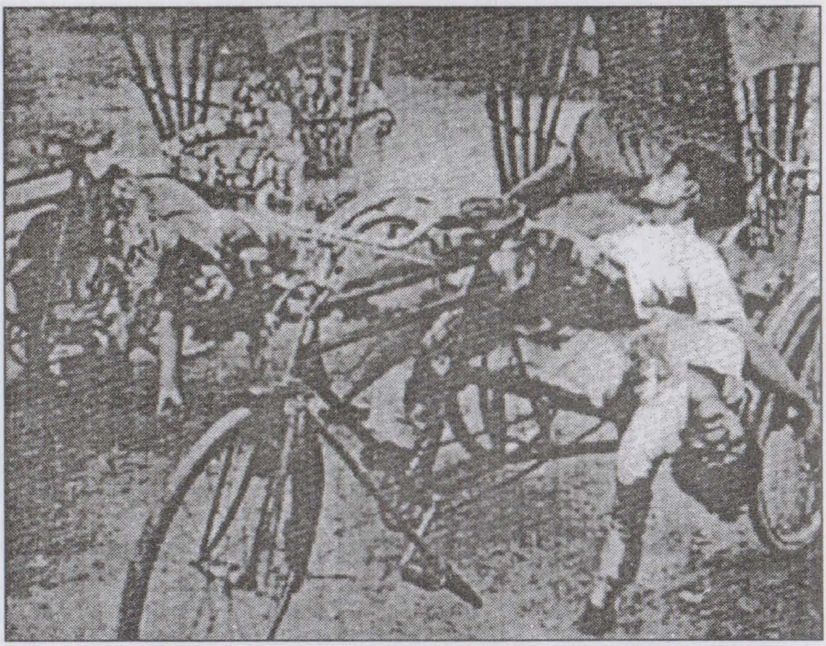
মাওলানা ভাসানী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নামায পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পাশে তাঁর দু'জন সহকর্মী আরিফ ইফতেখার ও আবদুল আজীজ আমান। ছবি : সংগ্রহ



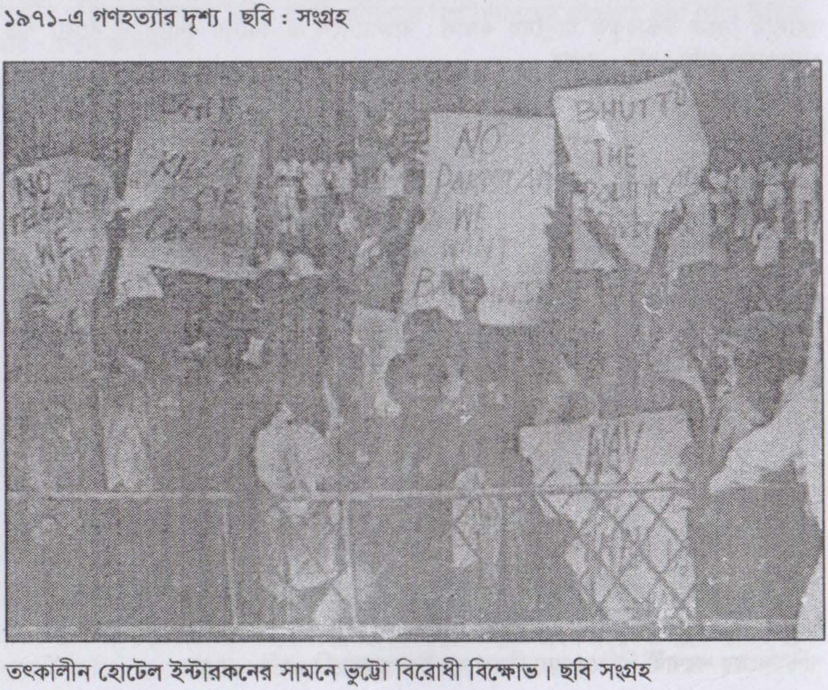
বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত মানুষের কঙ্কাল। বাংলাদেশে এ ধরনের বধ্যভূমির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। ছবি : সংগ্রহ



পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে সদ্য বিধবা যুবতীর আহাজারি। ছবি : সংগ্রহ



১৯৭১-এ গণহত্যার দৃশ্য। ছবি : সংগ্রহ



তৎকালীন হোটেল ইন্টারকনের সামনে ভুট্টো বিরোধী বিক্ষোভ। ছবি সংগ্রহ



১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলা। ছবি : সংগ্রহ



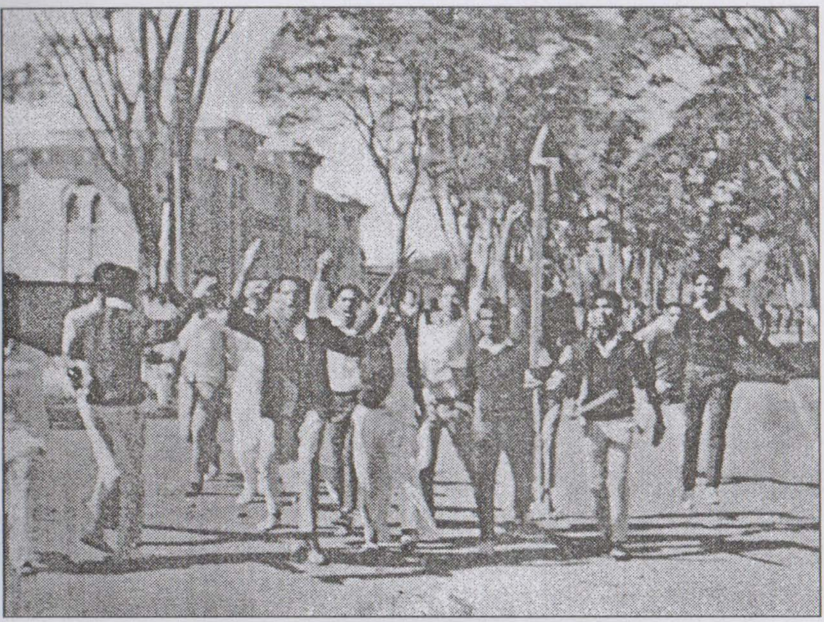
রাইফেল কাঁধে মেয়েদের দীপ্ত পদক্ষেপে রাজপথ প্রদক্ষিণ। ছবি : সংগ্রহ



গুলিবিদ্ধ ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ছবি : সংগ্রহ



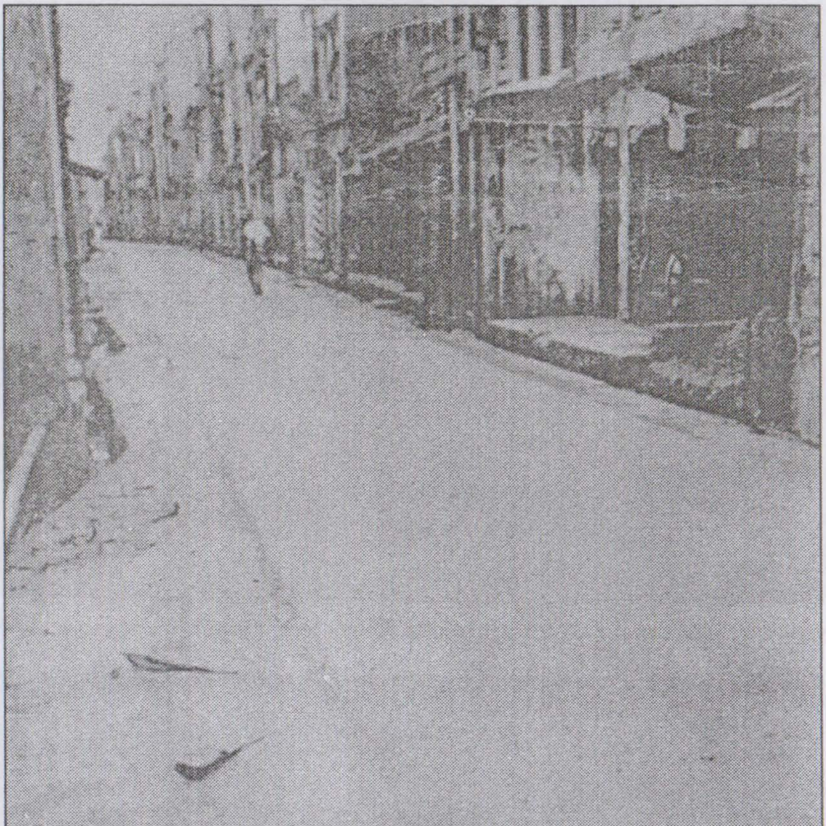
১৯৭১-এ আহত এক নারীকে তাঁর স্বামী কোলে করে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ছবি : সংগ্রহ



শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে ক্রুদ্ধ ছাত্রদের মিছিল। ছবি : সংগ্রহ



ঢাকার রায়ের বাজারে বুদ্ধিজীবীদের লাশ। পরাজয় অনিবার্য জেনে পাকিস্তানীরা তাদের এদেশীয় দোসর জামাতে ইসলামীর ঘাতক বাহিনী আলবদরের সহযোগিতায় '৭১-এর ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তালিকা প্রস্তুত করে হত্যা করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের। ছবি : সংগ্রহ



নয় মাস ধরে চলছে হত্যা, নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ। ছবি : সংগ্রহ



পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে সন্তানহারা এক দম্পতি। ছবি : সংগ্রহ



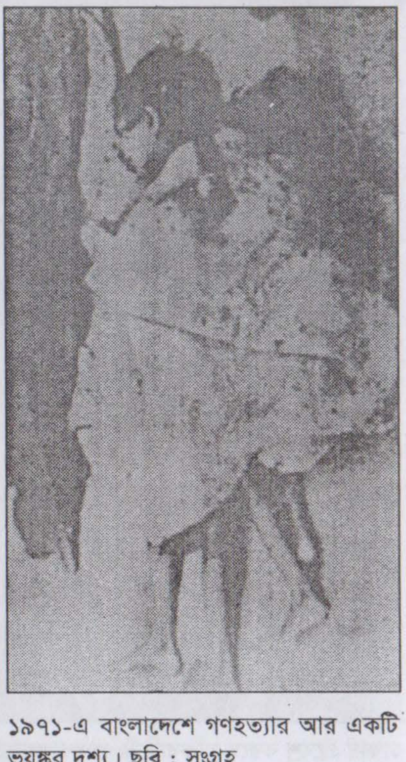
ঢাকায় প্রবেশ করছে মুক্তিবাহিনী, স্বাগত জানাচ্ছে জনতা। ছবি : রশীদ তালুকদার



ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু। পাশে আবদুস সামাদ আজাদ। ছবি : সংগ্রহ



পাকিস্তানের জনক কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার বোন মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নাহ। ছবি : সংগ্রহ



১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যার আর একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ছবি : সংগ্রহ



'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অ্যালবামের প্রচ্ছদ। ছবি : সংগ্রহ



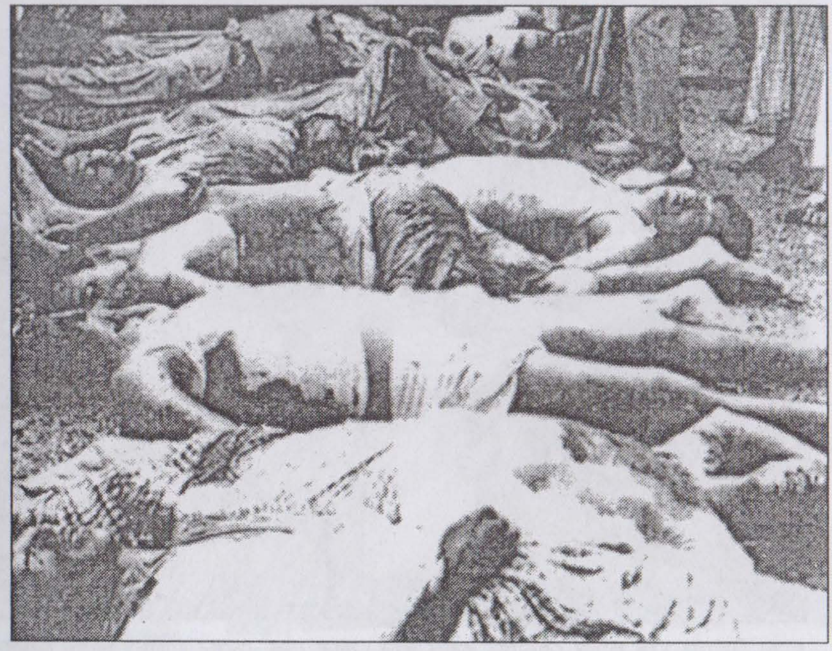
আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি, পাশে যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। ছবি : সংগ্রহ



২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত ঢাকা মহানগরী। ছবি : সংগ্রহ



যশোরের রাস্তায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত অসহায় বাঙালিদের লাশ। ছবি : সংগ্রহ



২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে নিহত ছাত্রদের লাশ। ছবি : সংগ্রহ



পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন : কুষ্টিয়ার একটি জনপদ। ছবি : সংগ্রহ



চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে জড়িত বেদনাময় একটি স্মৃতি। জানা গেল, দেশের ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে আলবদর বাহিনী। ঢাকায় রায়ের বাজারে বুদ্ধিজীবীদের লাশ। ছবি : সংগ্রহ



আইয়ুব খানের কুশ পুত্তলিকা দাহ ৭.১২.১৯৬৮। ছবি : সংগ্রহ



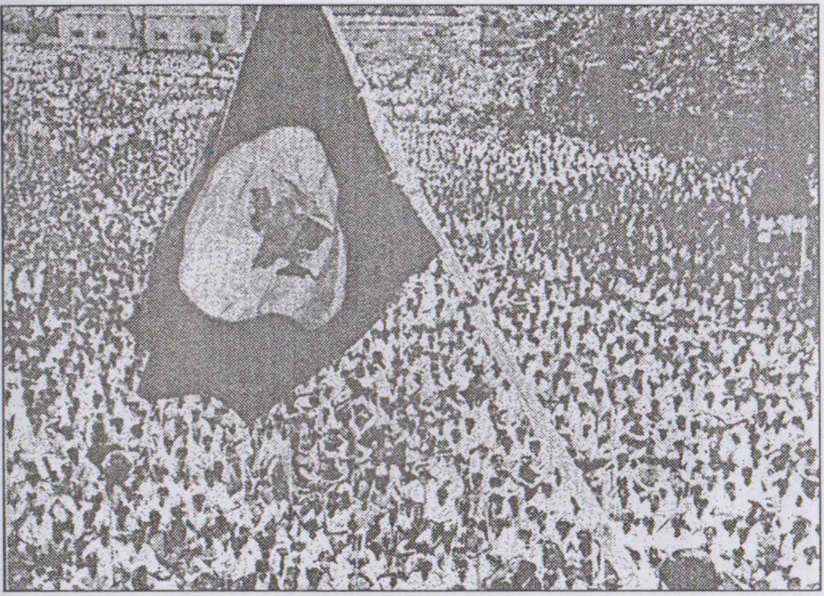
শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে সভা ২০.১০.৬৮। ছবি : সংগ্রহ



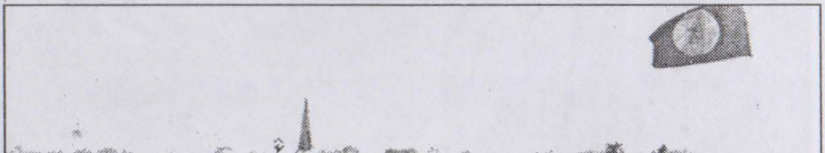
হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন। ছবি : সংগ্রহ



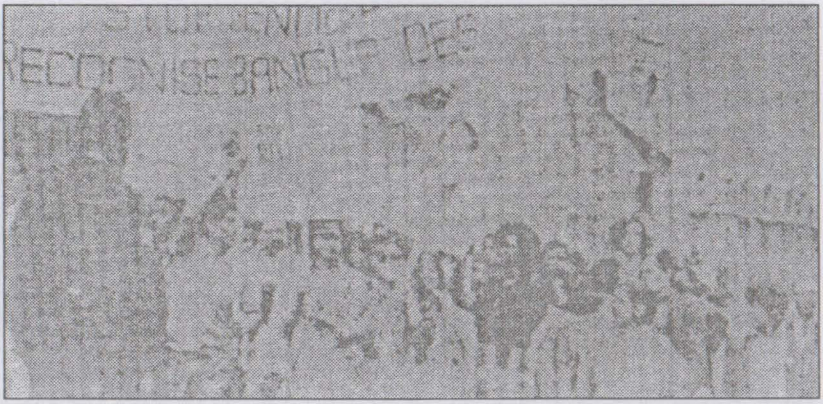
একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান। অন্যদিকে বাঙালি নিধন। বুড়িগঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে বাঙালির লাশ। ছবি : সংগ্রহ



কলাভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ছবি : সংগ্রহ



'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা। ছবি : সংগ্রহ



১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য লন্ডনে এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছবি : সংগ্রহ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের আগে আলোচনা করছেন। ছবি : সংগ্রহ



মহারাষ্ট্রে বাংলাদেশ এইড কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি চীফ প্যাট্রন ও মহারাষ্ট্রের গভর্নর নবাব আলী ইয়ার জং-কে বাংলাদেশের পতাকা দেখাচ্ছেন। ছবি : সংগ্রহ



পাকিস্তানীদের বোমা হামলায় ভস্মিভূত হয়েছে শত শত জনপদ। অর্ধদগ্ধ একটি বালকের শুশ্রুষার চেষ্টা। ছবি : সংগ্রহ



বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময়টা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর বঙ্গবন্ধু করাচী থেকে লন্ডনে যেয়ে সেখান থেকে ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে ঢাকা ফেরার পথে নয়া দিল্লী গেলে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছবি : সংগ্রহ









DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION.
DI-2

DIA SPOT REPORT

WHITE HOUSE SITUATION ROOM '71 MAR 26 PM 3:55

DATE: 2_ March 1971
TIME: 1430 EST

SUBJECT: Civil War in Pakistan

REFERENCE:

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent People's Republic of Bangla Desh." Fighting is reported heavy in Dacca and other eastern cities where the 10,000 man paramilitary East Pakistan Rifles has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringent martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results.

2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fever of Bengali nationalism spills across the border.

3. Sheikh Mujibur Rahman is little interested in foreign affairs and would cooperate with the United States if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the beginning and both sides will find the United States a convenient scapegoat.

DISTRIBUTION:

White House Sit Room (LDX)
Dept of State RCI (LDX)
Dir of CIA Ops Cen (LDX)
Sec Def
Dep Sec Def
Asst Sec Def, ISA
Asst Sec Def, PA
Asst Sec Def, ADMIN
Chairman, JCS (CAPT TRAIN)
Chairman, JCS (Mr. KEARNEY)
Asst to Chairman, JCS
Dir, Joint Staff
Dir, J-3
Dir, J-5
JCS (ACSAN) Rm 1083

RELEASED BY: JOHN J. FAVELLE, JR.
Captain, USN
DI-4/71544

PREPARED BY: JOHN B. HUNT
Major, USA
DI-4A3/25009

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sect. 3.6
By ___ NARA, Date 7-19-__

CONFIDENTIAL—NO FOREIGN DISSEM

রাজধানী ✤ রাজনীতি / রণজিৎ রায়

ইয়াহিয়া এখন হন্যে হয়ে তাঁবেদার খুঁজছেন

বাং[illegible]

[illegible]

যে কোন রকমের সাহায্য নিয়েই তা [illegible] করাতে হবে, তবু বাংলা দেশের [illegible] দীর্ঘস্থায়ী হবে না। [illegible] ইয়াহিয়া [illegible] কাজেই [illegible]। [illegible] ইয়াহিয়া [illegible] তিনি [illegible] চান।

বাংলা দেশের [illegible] কথা [illegible] [illegible] ইসলামাবাদের [illegible] তা এর থেকেই বোঝা যাবে। [illegible] নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য [illegible] বাংলাদেশের [illegible] ভারত [illegible] নিরাপত্তা পরিষদকে [illegible] করে তোলার চেষ্টা করবে।

※

জেনারেল ইয়াহিয়া বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করছে তিনি [illegible] থেকে সাহায্য পাচ্ছেন কিনা তার উপর। চীন তাকে উল্লেখযোগ্য [illegible] দিতে পারবে না। তবে [illegible] ইসলামাবাদকে সাহায্যের ব্যাপারে একেবারে [illegible] নয়। [illegible] পাকিস্তানের সামরিক [illegible] কোটি কোটি টাকা [illegible]। পাকিস্তানে [illegible]

[illegible] না।

[illegible] ইয়াহিয়া [illegible] তিনি যেন-তেন একটা [illegible] বাংলা দেশে খাড়া করতে [illegible] থেকে সাহায্য পাওয়ার [illegible] হয়ে যাবে। সেজন্যই তিনি এখন [illegible] বাংলা দেশে [illegible] খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

তবে [illegible] রাজনৈতিক সমাধান বলতে যে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে তা স্পষ্ট নয়। [illegible]

[illegible]

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

বাংলার উপকূল অঞ্চলে মহাপ্রলয়

ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য প্রাণহানিঃ আট শতাধিক মৃতদেহ উদ্ধার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ



বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা

বিদেশ হইতে আমদানী করা 'ইজম' বা 'সিস্টেম' নহে, দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব

বাকশাল কোন সাধারণ

ফোন : ২৪-২৭৯০

বাংলা দেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি

৩৪, ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সভাপতি :
শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
কার্যকরী সভাপতি :
শ্রীবিজয় সিংহ নাহার
উপ-মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
কোষাধ্যক্ষ :
শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ
মুখ্য সচেতক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংযোজক সম্পাদক :
শ্রীত্রিদিব মিত্র
অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত
অধ্যাপক নির্মল বসু
শ্রীঅরুণ কুমার মৈত্র
ডঃ জয়নাল আবেদিন
আইন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

Care Taker, M.L.A. Hostel

৫নং মেজর নুরুল আবেদিন ১০ Bag 1/3 Room এ আছে — তিনি Training এ গেছেন। Duplicate চাবি দিয়ে খুলে উঁর Bag টি দেবেন। Room এ Shri Khalil Sayed আছেন — উনি ফেরত আসবেন ২৫শে নং।

Arunmaitra
6/4



মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের ফুটবল টিম বোম্বেতে ম্যাচ খেলতে গেলে মহারাষ্ট্রের গভর্নর নবাব আলী ইয়ার জং তাদের স্বাগত জানান।



সকল রনাঙ্গনেই মুক্তিবাহিনীর সাফল্য



সংবাদ

SANGBAD

No. DA, 166, Po. Box No. 1218 Gram: SANGBAD

Tuesday, November 19, 1968



১৯শে নভেম্বর, ১৯৬৮ প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের নীতির প্রতিবাদে ঢাকায় আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিলের

১৯৭১ সালে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী [illegible]

ইন্দিরা-টিটো যুক্ত ইশতেহারের তাৎপর্য

জনগণের 'ব্যক্ত' ইচ্ছার নিরিখেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করতে হবে

[illegible]

ইত্তেফাক

Sunday, January 10, 1971

শেখ মুজিবের প্রাণনাশের চেষ্টা

দেশবাসী উৎকণ্ঠিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

[illegible]

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৭৭

ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতাল বাঁচিয়া থাকিবে

শেখ মুজিব

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতাল-এর গভর্নিং বডির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান-এর সহিত ৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করিয়া হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করান, এবং হাসপাতালের উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁহার সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য কামনা করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান এই হাসপাতালের সহিত তাঁহার বহুদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, [illegible] [illegible]

দৈনিক পাকিস্তান

ঃ রোববার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ ১৪ই মার্চ, ১৯৭১



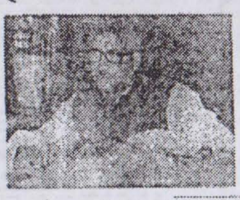
ঢাকার দিলকুশা ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা সুলতানা শাহরিয়া কবির (কালো চাদর গায়ে লাঠি হাতে) ৭ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বিশাল জনসভা থেকে অনেক মহিলাকর্মীসহ দক্ষিণ কমলাপুরের বাড়িতে ফিরছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

এদেশের মানুষের জন্য আওয়ামীলীগ কি চায়—

রেডিও টেলিভিশনে শেখ মুজিব কর্তৃক জাতির উদ্দেশে নিজ দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা



অভূতপূর্ব প্রাণবন্যা।

এ অবস্থার কৈফিয়ত কি।

দুই শত ২৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

শেষের পাতা

দৈনিক পাকিস্তান

Thursday, January 7, 1971

একদিন জাহাজের নীচে পানি শুকিয়ে গেল বালির ওপর দাঁড়িয়ে রইল জাহাজ

সাবাস মুক্তিফৌজ!

মুক্তিযুদ্ধ

বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বিমুখী চক্রান্ত

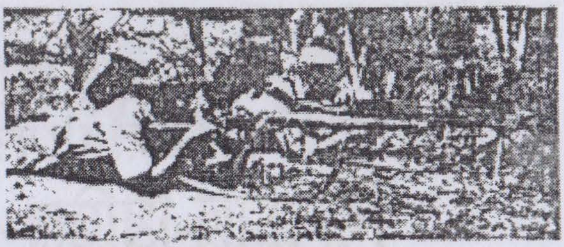
একদিকে জল্লাদ ইয়াহিয়াচক্রকে অস্ত্র সরবরাহ অন্যদিকে রাজনৈতিক মীমাংসার টোপ

মুক্তিযুদ্ধ

পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র

মুক্তিফৌজের আঘাতে আঘাতে ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী নাজেহাল

বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিজয় সুনিশ্চিত



ইয়াহিয়ার প্রতি সর্বমহলের ধিক্কার

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব

[illegible]

পঃ পাকিস্তানে নির্যাতন-গ্রেফতারের প্রতিবাদে

ঢাকায় আইনজীবীদের

বিক্ষোভ-মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র [illegible] নির্যাতন ও ব্যাপক ধরপাকড়ের প্রতিবাদে ঢাকার আইনজীবীরা গতকল্য (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করেন। [illegible] হাইকোর্ট [illegible] আইনজীবীরা [illegible]

[illegible] আন্দোলনের প্রতি [illegible] করেন।

[illegible] বেলা [illegible] প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে।

মিছিলটি [illegible] হাইকোর্ট [illegible] করে। সেখানে হাইকোর্ট [illegible] আইনজীবীরা [illegible]

পরে মিছিলটি হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে [illegible] হয়।

মিছিলটি [illegible] প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলকারী আইনজীবীগণ [illegible]

[illegible]

দৈনিক পয়গাম

Sunday, January [illegible], 1971

অপরাধীর কঠোর শাস্তি দাবী

মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে দেশব্যাপী নিন্দার ঝড়

[illegible]

জয়বাংলা

[illegible]

সম্পাদকীয় :

[illegible]

আত্মসমর্পণের দলিল

পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশি যৌথ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানের সব সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হলো। পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীসহ সব আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আত্মসমর্পণ প্রযোজ্য হবে। এই বাহিনীগুলো যে যেখানে আছে, সেখান থেকে সবচেয়ে নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীন হবে। নির্দেশ না মানলে তা আত্মসমর্পণের শর্তের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলির অর্থ অথবা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো সংশয় দেখা দিলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশনের বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার পবিত্র প্রত্যয় ঘোষণা করছেন এবং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুবিধার অঙ্গীকার করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন বাহিনীগুলোর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়া হবে।

স্বাক্ষর

(জগজিৎ সিং অরোরা)
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ
পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বাক্ষর

আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জোন-বি
এবং অধিনায়ক পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

INSTRUMENT OF SURRENDER

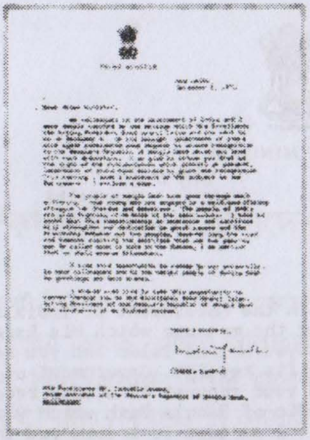
The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Conventions and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.



নয়াদিল্লি
ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,
৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আপনি যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমি ও ভারত সরকারের আমার সহকর্মীবৃন্দ গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। বার্তাটি পেয়ে ভারত সরকার আপনার নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য আপনার অনুরোধ পুনর্বিবেচনা করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ সকালে এ বিষয়ে পার্লামেন্টে আমি একটি বিবৃতি প্রদান করেছি।

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

বাংলাদেশের জনগণকে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আপনাদের যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য এক আত্মোৎসর্গীকৃত সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। ভারতের জনসাধারণও অভিন্ন মূল্যবোধের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সহমর্মিতা প্রচেষ্টা ও ত্যাগ দুই দেশের মৈত্রীকে আরও সুদৃঢ় করবে। পথ যতই দীর্ঘ হোক না কেন এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের জনগণকে যত বড় ত্যাগ স্বীকারই করতে বলা হোক না কেন আমি নিশ্চিত যে জয় আমাদের হবেই।

এই সুযোগে আপনাকে, আপনার সহকর্মীগণকে এবং বাংলাদেশের বীর জনগণকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভকামনা জ্ঞাপন করছি।

আমি এই সুযোগে আপনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতি আমার সর্বোত্তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আপনার একান্ত
(ইন্দিরা গান্ধী)

জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

ভারতের পার্লামেন্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর
প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি
সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র

PRIME MINISTER

New Delhi,
December 6, 1971

Dear Prime Minister,

My colleagues in the Government of India and I were deeply touched by the message which His Excellency the Acting President Syed Nazrul Islam and you sent to me on December 4. On its receipt, Government of India once again considered your request to accord recognition to the People's Republic of Bangla Desh which you lead with such dedication. I am glad to inform you that in the light of the circumstances which prevail at present, Government of India have decided to grant the recognition. This morning I made a statement on the subject in our Parliament. I enclose a copy.

The people of Bangla Desh have gone through much suffering. Your young men are engaged in a self-sacrificing struggle for freedom and democracy. The people of India are also fighting in defence of the same values. I have no doubt that this companionship in endeavour and sacrifice will strengthen our dedication to great causes and the friendship between our two peoples. However long the road and however exacting the sacrifice that our two peoples may be called upon to make in the future, I am certain that we shall emerge triumphant.

I take this opportunity to convey to you personally, to your colleagues and to the heroic people of Bangla Desh my greetings and best wishes.

I should also like to take this opportunity to convey through you to His Excellency Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangla Desh the assurances of my highest esteem.

Yours sincerely,

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

His Excellency Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister of the People's Republic of Bangla Desh,
Mujibnagar.

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন

ষষ্ঠ অধ্যায়

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এক অবিস্মরণীয় সঙ্গীতসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। বব ডিলান, ওস্তাদ আল্লারাখা, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খান, রিঙ্গো স্টার, বিলি প্রেস্টাল, লিওন রাসেল, এরিখ্ ক্লাপ্টন এবং জর্জ হ্যারিসনসহ ৭৫ জন বিদেশি শিল্পীর সমন্বয়ে "দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" নামক এই অনুষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তারা ২৪, ৩৪, ১৮৫ মার্কিন ডলার অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের তহবিলে দান করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন জর্জ হ্যারিসন।

'বিটলস' বিশ্ববিখ্যাত একটি সংগীত ব্যান্ডদলের নাম। আমেরিকা তথা বিশ্বের মানুষ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের চিন্তার জগতে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল এই দলের সদস্যরা; ষাটের দশকে। সেই দলের অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসন ১৯৭১ সালের দুঃসময়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে। বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ বেদনা, দুর্ভোগ-দুর্দশা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্যতম অংশীদার তিনি। ১৯৭১ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে ব্যতিক্রমী কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল, তার নাম ছিল– কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। এই কনসার্টের অন্যতম আয়োজক ছিলেন জর্জ হ্যারিসন। সেই কনসার্টে, বিশেষ করে 'বাংলাদেশ' শিরোনামের গানটি আমেরিকা তথা বিশ্বের অপরাপর এলাকার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ব্যাপকভাবে সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীরাও সেই গানে খুঁজে পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা।

সেই 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু এই কনসার্টকে সফল করার জন্য জর্জ হ্যারিসন কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এর প্রস্তুতিপর্বটা কেমন ছিল, তা আমরা অনেকেই জানি না। জর্জ হ্যারিসনের আত্মজীব-নীমূলক বই I ME MINE (আই মি মাইন)-এ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "গীতিকার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, আমি মূলত গান লিখেছি মন থেকে কিছু বের করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ..... আমি মনে করি এমন এক ধরনের লেখক আছেন, যাঁদের কাছে তাঁদের অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতার বর্ণনাটা যথেষ্ট নয়, তাঁদের কাছে এটা একটা শৈলী।

যেসব ভারতীয় সংগীত এখন আমরা শুনছি তা সরাসরি সংগীতজ্ঞের আবেগ বহন করে। তাই গান লেখাটা আমার কাছে সেই আবেগকে ছাপিয়ে ওঠার একটি মাধ্যম, ওই মুহূর্তের, ওই সময়ের।

তেমনি একটি গান 'বাংলাদেশ' যা ওই সময়ের, দুঃসময়ের, দুঃখভারাক্রান্ত সত্তরের।

সেটা ছিল ১৯৭১ সাল, যখন আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে রাগা ছবির শব্দ সংযোজন করছিলাম। রবি (বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় সেতারবাদক রবিশঙ্কর) বলছিলেন, তিনি একটা কনসার্ট করতে চান। তিনি সাধারণত যে ধরনের কনসার্ট করেন, এটা হতে হবে তারচেয়ে বড়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুৎপীড়িত মানুষের জন্য হাজার পঁচিশেক ডলার সংগ্রহ করা যাবে। তিনি জানতে চাইলেন এর জন্য আমি কোনো উপায় বের করতে পারি কি না, আমি এসে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারি কি না, পিটার সেলার্সকে নিয়ে আসতে পারি কি না, কিংবা অন্য যেকোনোভাবে সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি কি না। তারপর তিনি আমাকে খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনে যুদ্ধ ও দারিদ্র্য সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ (Cuttings) দেওয়া শুরু করলেন। আমিও এ ব্যাপারে অবহিত হতে থাকলাম এবং পরে ভাবলাম– হ্যাঁ, তাঁকে সাহায্য করার জন্য অবশ্যই আমার কিছু করা উচিত।

শুরু থেকেই বিটলসের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন ছিল যে, যদি কিছু করতে হয় তবে তা বড় করেই করা উচিত এবং সেটা মিলিয়ন ডলারেরই হবে না কেন।

এভাবেই আমি জড়িয়ে গেলাম এবং পরবর্তী তিন মাস ধরে টেলিফোনে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেছিলাম, যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশকে সফল করে তুলেছিল। লোকজনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাকে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে, এরিকসহ অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে, যাঁরা পরে কনসার্টে অংশ নিয়েছেন।

আমরা খুব সামান্য মহড়া করতে পেরেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সবাইকে নিয়ে কোনো মহড়াই হয়নি। আমরা অনেক কষ্টে এখানে সেখানে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

তারিখ ঠিক করেছিলাম আমরা একটি বিশেষ সময়সীমার মধ্যে। ভারতীয় একজন জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন, 'এটা একটা ভালো সময়' এবং সেটা আগস্টের প্রথম দিকের কথা। তারপর আগস্টের যথাযথ দিনটি আমরা পেয়ে গেলাম এবং ওই দিনে ম্যাডিসন স্কয়ার ছিল ফাঁকা। আমরা তা ভাড়া নিলাম এবং শো করলাম। দুটি শো করেছিলাম। কারণ, প্রথমটার সব টিকেট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ভাগ্য এতটাই ভালো ছিল যে, প্রায় সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে গিয়েছিল, ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের ওই অনুষ্ঠানটি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল।

আমাদের ব্যান্ডের লোকেরাই শব্দ গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ (Sound Mix) করেছিলেন, আলোকসজ্জায় ছিলেন চিপ মঙ্ক (Chip Monck) এবং অনুষ্ঠানটি সেলুলয়েডে ধারণ করেছিলেন অ্যালেন ক্লেইনের (Allen Klein) লোকজন। তবে ধারণের কাজটি ভালো হয়নি।

তীব্র আলোকসজ্জার মধ্যে কাজ করার ফলে আমরা প্রায় ভাজা ভাজা (Fried) হয়ে গিয়েছিলাম।

... বেশ কয়েকটি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি ভালোভাবে ধারণ করা যায়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিটি ক্যামেরায়ই কোনো না কোনো সমস্যা ছিল বা সমস্যায় পড়েছিল। ....

এখন যে ফিল্মটি আপনারা দেখতে পান তা অনেক ভোজবাজির কৌশলে তৈরি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার প্রথম গান 'ওয়াহ ওয়াহ। (WAH WAH)-তে ১২টি 'কর্তন' (Cuts) এবং ১২টি সংযোজন রয়েছে। এসবের তিনটি আসল আর অন্য নয়টি কৃত্রিম। আমাদের বিভিন্ন ধারণকৃত অংশ (Shots) বিভিন্ন জায়গা থেকে কেটে এনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু অংশ ব্লো-আপ করতে হয়েছে। ফলে সেগুলো খুব ঝাপসা ও বাজে হয়েছে। এসব ছাড়া আরও নেতিবাচক ব্যাপার রয়েছে সেখানে।

কিন্তু শিল্পীরা খুব ভালো ছিলেন। সবাই আন্তরিকভাবে এতে অংশ নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলাম যে, তাঁরা যদি এতে কাজ করতে পছন্দ না করেন তাহলে চলে যেতে পারেন। ....

...... এটা ছিল একটা বিরাট দায়িত্ব এবং তা ভালোভাবেই সম্পাদিত হয়েছিল।

যাহোক চূড়ান্ত ফলাফল হলো, আমরা বাংলাদেশের জন্য এর মাধ্যমে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, কারণ আমরা যখন কনসার্টটি করেছিলাম, তখন মার্কিন সরকার পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছিল কিন্তু খবরের কাগজগুলোতে লেখা হচ্ছিল সামান্যই। ... আমাদের অনুষ্ঠানের ফলে বাংলাদেশ অনেক প্রচার পেয়েছিল এবং ঘটনাপ্রবাহ ভিন্নদিকে বইতে শুরু করেছিল।

আজও কোনো বাঙালি রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ওয়েটাররা আমাকে বলে, "ওহ আপনিই হ্যারিসন, যখন জঙ্গলে যুদ্ধ করছিলাম, তখন আমরা জানতাম এখানেও আমাদের জন্য একজন ভাবছে।'

প্রায় সর্বত্রই কনসার্টটির শুভ প্রভাব পড়েছিল। এটা বাঙালিদের প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং এর দ্বারা পাকিস্তানী হিটলারদের কার্যক্রম বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ছিল। ......"

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বললেন, কনসার্ট ফর বাংলাদেশের কথা

আমি তখন নিউইয়র্কে যাচ্ছি। তখনই শুনলাম গণহত্যার খবর। এর কয়েক মাস পর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে দেখা। জর্জ পশ্চিমা সংগীতের বিখ্যাত মানুষ, গীতিকার এবং সাবেক 'বিটল'। মানসিকভাবে আমি তখন ভীষণ অস্থির। জর্জ আমার সমস্যাটা জানতে চাইল। তাকে বাংলাদেশের নারকীয় অবস্থার কথা বয়ান করলাম। সব শুনে জর্জ খুব কষ্ট পেল। জানতে চাইল, এ ব্যাপারে তার করার কিছু আছে কি না। ভাবলাম, রিলিফ ফান্ড বা অন্য কোথাও কিছু টাকাকড়ি তো আমরা পাঠাতেই পারি। ধরা যাক, অন্তত ২৫ কি ৩০ হাজার ডলার পাঠানো তো যায়ই। কিন্তু আমি চাইছিলাম অন্য কিছু করতে, আরও অর্থপূর্ণ কিছু। যদি বড় মাপের একটা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহলে

হয়তো আরও বড় দর্শক শ্রোতার কাছে যাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে সচেতনতা।

বড় মনোকষ্টে ছিলাম। ওই অবস্থাতেই কম্পোজ করলাম দুটি গান, একটি 'জয় বাংলা, জয় বাংলা', অন্যটি 'ও ভগবান, খোদাতালা'। দুটি গানই পরে রেকর্ড করা হয়েছিল। যা কিছু করছিলাম, সবই কিন্তু তাৎক্ষণিক আবেগের বশে। ঠিক করলাম, মঞ্চে একটা মিউজিক্যাল কনসার্ট করব। ব্যাপারটার জন্য জর্জ যেন তৈরি হয়েই ছিল। বললো, তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু সে করবে। ঠিক হলো, অনুষ্ঠান করব সবসুদ্ধ দুটো। একটা হবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের, অন্যটি পশ্চিমা সংগীতের। পশ্চিমা জনপ্রিয় তারকারা সেখানে গান করবেন। এদিকে হাতে সময় খুবই কম। ঠিক করলাম, এই অল্প সময়ের নোটিশে যাঁরা ম্যানেজ করে আসতে পারবেন, তাঁরাই অংশ নেবেন অনুষ্ঠানে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, পারফরমাররা অনুষ্ঠানের জন্য কোনো টাকা-পয়সাও নেবেন না।

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জর্জ তার গায়ক বন্ধুবান্ধবদের ফোন করতে শুরু করল। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁরা প্রথিতযশা ছিলেন, যেমন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন তাঁদের সঙ্গে জর্জের যোগাযোগ হলো। মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে কনসার্টের ব্যবস্থা হলো। সেখানেই টানা দুই-এক সপ্তাহ কনসার্টের পরিকল্পনা নিলাম। এ উপলক্ষে জর্জ নিজে তো একটা গানই লিখে ফেলল; 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। আলী আকবর ভাই ও আল্লারাখা ভাইকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে বাজাতে। এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা।

কী বিশাল সাফল্য। প্রতিদিন টানা দু'-দুটো শো হতো আমাদের– একটি ম্যাটিনি, অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়। প্রতিটি শোতেই হাজার বিশেকেরও বেশি দর্শকের সমাগম হতো। কনসার্টের ওপর তৈরি ছবি, ডিস্ক ও ক্যাসেট বিক্রির বদৌলতে সন্তোষজনক পরিমাণ অর্থ সংগৃহিত হলো। টাকাকড়ি লেনদেনে সরাসরি আমাদের কোনো হাত ছিল না। খরচাপাতি বাদ দিয়ে পুরো টাকাটাই ইউনিসেফ পরিচালিত বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্য তহবিলে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, 'বাংলাদেশ' নামটি রাতারাতি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। আর জর্জ হ্যারিসনের সেই গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' তো তক্ষুণি হিট।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, এই সামান্য কাজটুকু তো অন্তত করতে পেরেছি। শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭১-এর ১ আগস্ট, নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে। যেসব শিল্পী সেখানে অংশ নিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন :

পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ওস্তাদ আল্লারাখা খান, কমলা চক্রবর্তী, জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্ল্যাপটন, বব ডিলান, বিলি প্রেসটন, লিওন রাসেল, রিংগো স্টার, ক্লাউস ভুরম্যান, ব্যাড ফিঙ্গার, পিট হ্যাম, টম ইভান, জোয়ি মোলান্ড, মাইক গিবনস, এলান বাটলার, জেসি এড ডেভিস, চাক ফিন্ডলে, মার্লিন গ্রিন, ইয়ানি গ্রিন, জো গ্রিন, ডলোরেস হল, জিমহর্ণ, জ্যাকি ক্যালসো, জিম কেল্টনার, ক্লডিয়া লিনিয়ার, লু ম্যাক-ক্রিরি, ওলি মিশেল, ডন নিক্স, ডন প্রেস্টন, কার্ল র‍্যাডলে।

বাংলাদেশ
জর্জ হ্যারিসন

এল একদিন বন্ধু আমার
চোখভরা তার ধু ধু হাহাকার
বলে গেল, চাই শুধু সহায়তা
দেশ তার আজ ধুঁকে ধুঁকে মরে
বেশি কিছু আমি জানতে চাই না
শুধু বুঝি কিছু করে যেতে হবে
মিনতি জানাই সকলের কাছে;
এসো না বাঁচাই কয়েকটি প্রাণ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
কত শত কত সহস্র লোক
মরে নিরন্ন
সকলই ধ্বস্ত, সবই ধুলিকণা
কখনো দেখিনি এতো যন্ত্রণা
হাতে বাঁধো হাত প্রতি জনে জনে
আর রাখো মনে
বাংলাদেশের ওই মুখগুলো
বাংলাদেশ বাংলাদেশ

কেন অকারণ
এতো দুর্যোগ
সকলই ধ্বস্ত, সবই ধুলিকণা
দেখিনি, কখনো এমন যাতনা .....

আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল
সিডনি শ্যানবার্গ ১৯৭১-এ নিউইয়র্ক টাইমস-এর দিল্লি সংবাদদাতা

[২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাতের বেলা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের অগ্রগতি জানতে অনেক বিদেশি সাংবাদিক তখন ঢাকায়। সামরিক প্রশাসন চায়নি তাদের অভিযান বিশ্ববাসী জানুক। বিদ্রোহী বাঙালিদের পাশাপাশি বিদেশি সাংবাদিকদেরও তারা মনে করল শত্রু। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বন্দী করে ফেলল তাদের। ২৭ মার্চ ৩৫ জন সাংবাদিককে 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে বহিষ্কৃত করল। জোর করে জাহাজে তোলার আগে কেড়ে নিল তাদের ফিল্ম ও নোট বই। বহিষ্কৃত নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা সিডনি শ্যানবার্গ বোম্বে (মুম্বাই) থেকে এই প্রতিবেদনটি পাঠান। প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ, ১৯৭১। এই প্রতিবেদন এখন ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার অংশ– অনুবাদক।]

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গুঁড়িয়ে দিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রদেশের নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর কামান ও ভারী মেশিনগান চালাল।

কোনো ধরনের সতর্কবাণী না দিয়েই বৃহস্পতিবার রাতে আক্রমণ শুরু করল। সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রক পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা প্রদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নামল। উদ্দেশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটিগুলো যেমন– বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ।

কজন মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা জখম হয়েছে, জানার কোনো উপায় নেই। যদিও ঢাকায় আঘাত হানার আগে থেকেই দেশের অভ্যন্তরে বেসামরিক জনতা ও পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর আসছিল– আসলে প্রদেশের অন্যত্র কী ঘটছে তারও কোনো সুনির্দিষ্ট খবর নেই।

ঢাকা শহরের উত্তরাংশে অবস্থিত হোটেল থেকে শহরের বিভিন্ন অংশে ভয়াবহ আগুনের শিখা চোখে পড়ছিল– বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

প্যারা-মিলিটারি ফোর্স পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে এখনো আগুন জ্বলছে, বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি এখনো থামেনি। এদিকে ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আজ ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে একজন পাকিস্তানী ছাত্র বলছে, হায় আল্লাহ, হায় আল্লাহ! ওরা তাদের মেরে ফেলছে, ওরা হত্যা করছে। সামরিক ট্রাকবহরের পাহারায় এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে সাংবাদিকেরা দেখেছে রাস্তার দু'পাশের বস্তিতে এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সমর্থকদের বাড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আগুন দিচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাতে যখন সেনা অভিযান শুরু হয়, সেনারা বিজয়ধ্বনি দিয়ে শহরের বিভিন্ন অংশে অটোমেটিক রাইফেল, মেশিনগান ও রিকয়েললেস রাইফেলের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের পর ঢাকা শহরের বিশাল এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত বিদেশি সংবাদদাতারা যখন বাইরে কী ঘটছে দেখতে যেতে চান, আরও জোরদার সজ্জিত সেনাবাহিনী তাঁদের বাধা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং জানায়— বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে গুলি করা হবে।

হোটেলের চারপাশে গোলাগুলির শব্দ বাড়তে থাকে এবং দুপুর একটা নাগাদ সারা শহরেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

একটা ২৫ মিনিটে বাইরের মিলিটারি গার্ডের আদেশে হোটেলের সব ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফ অফিসের টাওয়ারের বাতি তখনই নিভে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং অন্যান্য শহরে ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়।

সোয়া দুইটার দিকে হোটেলের সামনে দিয়ে মেশিনগানবাহী একটি জিপ ময়মনসিংহ রোডের দিকে এগিয়ে একটি বাজারের সামনে থামে। মেশিনগান দোতলার জানালা বরাবর তাক করা। এক ডজন সেনা পায়ে হেঁটে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একদল বহন করছে রকেট-জাতীয় অস্ত্র।

হঠাৎ দোতলা থেকে চিৎকার ধ্বনি শোনা গেল- বাঙালি 'এক হও'। আর তখনই সেনারা শুরু করল ভবনটির ওপর অবিরাম নির্বিচার গুলি বর্ষণ। সেনারা তখন পাশের গলি দিয়ে গুলি করতে করতে এগিয়ে গেল। রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া গাড়ি উল্টে দিল;

সেনাদের গুলির ঝলক সাংবাদিকেরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দশতলা থেকে দেখছেন– এ এক অবিশ্বাস্য নাটক।

গলিপথে সেনারা যখন গুলি করতে করতে এগোচ্ছে, তখন ১৫ থেকে ২০ জন বাঙালি যুবক তাদের দিকে এগোয়– সেনাদের কাছ থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে। তারা চিৎকার করে সেনাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু তারা মনে হলো নিরস্ত্র এবং হাতও খালি।

জিপের ওপরের মেশিনগান তাদের দিকে ঘুরিয়ে গুলি চালানো হলো। অটোমেটিক রাইফেলসহ সেনারা তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যুবকরা রাস্তার দু'পাশের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়ল। হোটেল থেকে বলা মুশকিল কজন নিহত বা আহত হয়েছে।

সেনারা আবার নজর দিল গলির দিকে। তারা একটি স্পেয়ার পার্টসের দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এগোল। তাদের আসল লক্ষ্য দ্য পিপল পত্রিকার অফিস ও প্রেসের দিকে। এই ইংরেজি দৈনিকটি শেখ মুজিবকে সমর্থন এবং সেনাবাহিনীকে বিদ্রুপ করে যাচ্ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা উর্দুতে চিৎকার করে সেনারা বললো, ভেতরে কেউ থাকলে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা গুলি চালানো হবে। কোনো উত্তর এল না, কেউ বের হলো না। সেনারা তখন ভবনের ওপর রকেট সেল নিক্ষেপ করল। সঙ্গে মেশিনগান ও ছোট অস্ত্রের গুলি। তারপর তারা ভবনে আগুন লাগিয়ে দিল এবং ছাপাখানা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভাঙতে শুরু করল। আরও এগিয়ে তারা বাজারের পেছন দিকের সব দোকান ও বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিল– কতক্ষণের মধ্যেই আগুনের শিখা দোতলার ওপর দিয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল।

ভোর চারটার পর চিৎকার কমে এল। গোলন্দাজ বাহিনীর মেশিনগানের শব্দ থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে ছোড়া গুলি হোটেলকেও আঘাত করছে।

ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস সদর দপ্তরের দিকে ভয়াবহ অগ্নিশিখা দেখা গেল। পৌনে ছয়টার দিকে আবছা আলোয় দেখা গেল চাইনিজ টি-৫১ হালকা ট্যাংকে চড়ে সেনারা শহরের প্রধান সড়কে টহল দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে বিরাম দেওয়া গোলাগুলি, কামানের গোলা– গতকাল সারাদিন ও আজ সাংবাদিকেরা বহিষ্কার হওয়া পর্যন্ত একইভাবে চলছিল।

গতকাল ভোর থেকে হেলিকপ্টার মাথার ওপর ঘুরছে, মূলত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর জরিপ চালাচ্ছে। গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পর ত্রাণ-সহায়তার জন্য সৌদি আরব পাকিস্তানকে চারটি হেলিকপ্টার দিয়েছিল, আর এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, এই হেলিকপ্টার পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঢাকা রেডিও স্টেশন সেনাবাহিনী দখলে নিয়েছে, ভোর সাতটায় জানাল, প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছেছেন এবং রাত আটটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

সকাল আটটার পর ১৯৫৯ মডেলের কালো শেভ্রোলেট হোটেলের সামনের জিপ ও ট্রাক থেকে নেওয়া সেনাদের কড়া পাহারায় হোটেল ছাড়ল। এই বহরে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তার দলকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়ার কথা। পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্য রাজনৈতিক নেতা ভুট্টো শেখ মুজিবের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবির বিরোধিতা করে আসছিলেন।

সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয় যে সেনাবাহিনী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর বিরোধিতাকে সমর্থন জানায়– সেখান থেকেই পাকিস্তানকে সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ভুট্টো জানেন, বাঙালিরা এই সংকটের জন্য তাকেই দায়ী মনে করেন। সঙ্গী কজন ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রবাহী সেনা বডিগার্ড পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি যখন হোটেল লবিতে এলেন, তখন তাকে সন্ত্রস্ত দেখাল এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'আমার কোনো মন্তব্য নেই।'

সকাল ১০টায় রেডিও থেকে নতুন সামরিক আদেশের ঘোষণা দেওয়া হলো। সাংবাদিকেরা যতবারই হোটেলে সেনা অফিসারদের জিজ্ঞেস করছেন কী খবর, তারা পাল্টা ধমক শোনাচ্ছেন। কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একদল সাংবাদিক সামনের দরজা ঠেলে যখন একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে এগোয়, ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ভবনের ভেতরে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেয় এবং চিৎকার করে বলে, 'তোমাদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে আমি জানি। আমি যদি নিজেদের লোক মারতে পারি, তাহলে তোমাদেরও মারতে পারব।'

কিছুক্ষণ পর সামরিক সরকার হোটেলে খবর পাঠায়, বিদেশি সাংবাদিকদের সোয়া ছয়টার মধ্যে হোটেল ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সাংবাদিকেরা হোটেলের বিল মিটিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। কিন্তু কেবল আটটা ২০ মিনিটে প্রেসিডেন্টের ভাষণ শেষ হওয়ার পর পাঁচ ট্রাক সেনার একটি বহরের পাহারায় সাংবাদিকদের নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

বের হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে একজন সাংবাদিক লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, বিদেশি সংবাদদাতাদের কেন চলে যেতে হচ্ছে? তাঁর জবাব, 'আমরা চাই সাংবাদিকেরা চলে যাক। থাকাটা তাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। সামনের ব্যাপারটা হবে ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত।

হোটেল কর্মচারী ও হোটেলে অবস্থানরত অন্য বিদেশিদের বিশ্বাস, বিদেশি সংবাদিকেরা চলে গেলেই শুরু হবে হত্যাযজ্ঞ।

হোটেলের একজন কর্মকর্তা বললেন, 'এটা আর তখন হোটেল থাকবে না, এটা হয়ে যাবে রক্তাক্ত হাসপাতাল।'

এয়ারপোর্টে সাংবাদিকেরা পৌঁছেছে, দূরে গোলাগুলি চলছে। সাংবাদিকদের লাগেজ কড়াভাবে তল্লাসি করা হচ্ছে– টেলিভিশন ফিল্ম, বিশেষ করে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

একাত্তর আমার জীবনটা বদলে দিয়েছে

জুলিয়ান ফ্রান্সিস

আবার এসেছে মার্চ মাস। মাসটি আমার কাছে ফিরিয়ে আনে সেই সব জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যার অংশীদার আরও অনেকেই।

১৯৭১ সালের মার্চ। আমি তখন ভারতের বিহারে অক্সফাম-ইউকের সহায়তাপুষ্ট গান্ধীবাদী আদর্শের গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত। মার্চের শুরুর দিকে বিবিসি ও ভারতীয় পত্র পত্রিকার কিছু ভাসাভাসা প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঢাকার অস্থিরতার খবর জানতে পারি। কিন্তু ক্রমশ যা উন্মোচিত হলো, তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। ২৫ মার্চ রাতের পর থেকেই ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকেও রাঁচিতে অক্সফাম কার্যালয়ে টেলিগ্রামে খবর

আসতে শুরু করল যে প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। সীমান্ত এলাকাগুলোতে কর্মরত কয়েকটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অক্সফাম এ খবর পায়। ভারতের পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব পাকিস্তানে অক্সফামের কার্যক্রম পরিচালিত হতো রাঁচির কার্যালয় থেকেই। তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কয়েকজন কর্মী সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনের পর অক্সফাম সদর দপ্তরে পাঠানো প্রতিবেদন এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে সেখানকার কয়েকজন কর্মকর্তা প্রতিবেদন বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানালেন। একজন তো মন্তব্য করে বসলেন যে, 'জুলিয়ান তরুণ আর অনভিজ্ঞ। মনে হচ্ছে ভারতের তীব্র গরম ভালোই প্রভাব ফেলেছে তার ওপর।'

ভারতের পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব পাকিস্তানে অক্সফামের নবনিযুক্ত মাঠ পরিচালক ফরাসি-কানাডিয়ান রেমন্ড কুরনোইয়ার ১৯৫৮-১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করেছেন। শরণার্থীর ঢল নামার শুরুর দিকেই তিনি বলেন, প্রায় এক কোটি পর্যন্ত উদ্বাস্তু ভারতে আসতে পারে। কিন্তু সংখ্যাটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অক্সফোর্ডে অক্সফাম সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের। রেমন্ড আমাদের কয়েকজনকে কলকাতায় গিয়ে এই পরিস্থিতিতে অক্সফাম কী করতে পারে, সেটা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন আমাদের। অধিকাংশ দাতব্য সংস্থাই দলে দলে বিদেশি সাহায্যকর্মী নিয়ে এলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সংকটে ভারতীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে। শিগগিরই আমাদের ওই সিদ্ধান্ত বিচক্ষণ বলে প্রমাণিত হলো। কারণ নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে সীমান্ত এলাকায় বিদেশিদের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ভারত সরকার।

ভারত সরকারের ওই সিদ্ধান্তের কারণে প্রথমে মাদার তেরেসার চিকিৎসাসেবায় প্রশিক্ষণ পাওয়া সিস্টারদের কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করে অক্সফাম। ওই সিস্টাররা প্রতিদিন কলকাতার আশেপাশের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে যেতেন। প্রথম দুই থেকে তিন সপ্তাহ প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে মাদার তেরেসা স্বয়ং আমাকে ফোন করে বাজারের একটি তালিকা দিতেন। সিস্টারদের কী কী জিনিসপত্র আর কয়টা ট্যাক্সির প্রয়োজন, তিনি আমাকে সেটা জানাতেন। প্রতিদিন সকালে ফোন করে তিনি 'গুড মর্নিং' না বলে বলতেন 'গড ব্লেস ইউ'। এরপর আমাকে বাজারের তালিকা দিতেন।

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে অক্সফামের পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের সহকারী মাঠ পরিচালক অ্যালান লিদার আর আমার সঙ্গে যোগ দিলেন উন্নয়নকর্মী বিকাশ ভাই।

আমাদের কাছে এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে অধিকাংশ বিদেশি সাহায্য সংস্থাই সল্টলেকের মতো কলকাতার আশপাশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে কাজ করছে। সল্টলেকের শরণার্থী শিবিরে ছিল প্রায় আড়াই লাখ লোক। তাই শহর থেকে দূরের শরণার্থীশিবিরগুলোতে কাজ করার জন্য অক্সফামকে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। শিবিরগুলোতে ওই সময় কলেরার ভয়াবহ হুমকি ছিল। ভারতের চিকিৎসা দলগুলোকে সংগঠিত করা এসং সেই সঙ্গে যথাযথ চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হয়েছে আমাদের। একদিন বিকাশ ভাই আমাদের জানালেন, গান্ধীবাদী নেতা নারায়ণ দেশাইয়ের মেয়ে সংঘমিত্রা দেশাই (উমা) কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের (এন আর এস) শেষ বর্ষের ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন সন্ধ্যায় আমরা মেডিকেল কলেজে গেলাম। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে; শিক্ষার্থীদের ক্যানটিনে চা খেতে খেতে কথা বলেছিলাম আমরা।

এনআরএস মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা দলের সদস্য হিসেবে শরণার্থীশিবিরগুলোতে যেতে পারে, উমা ও তাঁর সহপাঠীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই অনুমতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। শরণার্থী শিবিরে তাঁদের কার্যক্রমকে এমবিবিএস কোর্সের সামাজিক ও প্রতিষেধক চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবহারিক ক্লাসের অংশ হিসেবেও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁরা। উমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলকাতার অন্য মেডিকেল কলেজগুলোও চিকিৎসা দল পাঠাতে শুরু করে। ক্রমে কলকাতার কলেজগুলোর সফলতার গল্প শুনে অন্য মেডিকেল কলেজগুলোও এগিয়ে আসে। বোম্বে মেডিকেল কলেজ ও কটক মেডিকেল কলেজ থেকে মাসিক ভিত্তিতে চি-কিৎসা দল আসতে থাকে আমাদের কাছে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মেডিকেল কলেজ ও ভারতীয় রেডক্রসের গুজরাট শাখা থেকেও চিকিৎসা দল পাঠানো হয়। জুনের শেষ নাগাদ ত্রিপুরা পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তের সর্বত্র সক্রিয় ছিল অক্সফাম।

শরণার্থীদের চিকিৎসা সহায়তার বাইরের অন্য চাহিদাগুলো পূরণের জন্য নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠায় ওড়িশা ও গুজরাটের বেশ কয়েকটি গান্ধীবাদী সংগঠন। এমনকি রাজস্থানের উদয়পুরের মতো দূর এলাকা থেকেও ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক দল এসেছিল। শরণার্থীশিবিরগুলোকে চাঙা করে তুলেছিলেন এই স্বেচ্ছাসেবকেরা। শিবিরে বিদ্যালয় চালু, সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে গানের আসরের মতো বিভিন্ন আয়োজন করতেন তাঁরা। দক্ষতার সঙ্গে নিত্যকার খাদ্য পরিবেশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম তো চালিয়েছেনই।

এসব ভারতীয় তরুণ-তরুণী যেসব কাজ করতেন, তা ছিল খুবই কঠিন আর ক্লান্তিকর। আগাম মৌসুমি বন্যায় অনেকগুলো শিবির প্লাবিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। ওই সময় কলকাতাজুড়ে কলেরার প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নগরের কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক আমার কাছে জানতে চান, আমরা বিদেশ থেকে জরুরিভাবে বিমানে করে কলেরার টিকা আনার ব্যবস্থা করতে পারব কি না। অক্সফাম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ১০ লাখেরও বেশি ডোজ টিকা কিনে তা কলকাতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। ওই সময় আরও একটি সমস্যা দেখা দেয়। সেটা হলো, কলেরারোগীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্যালাইনের বোতল ছিল না। কলকাতায় নিরাপদে স্যালাইন তৈরি করা সম্ভব হলেও যথেষ্ট পরিমাণ খালি বোতল পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমরা যুক্তরাজ্য থেকে বিমান ভর্তি বোতল নিয়ে এলাম। খালি হওয়া বোতলে আবার স্যালাইন ভরে তা ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হলো। একেক সময় স্যালাইন না থাকলে ডাবের পানিকে স্যালাইন হিসেবে ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ওই সময় শরণার্থীশিবিরগুলোতে 'চোখ ওঠা' রোগ ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের থেকে এটা ছড়িয়েছিল বলে মজা করে একে ডাকা হতো 'জয় বাংলা রোগ'। এই চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিসের চিকিৎসায় যুক্তরাজ্য থেকে আনা হলো ১০ লাখ টিউব মলম। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ শরণার্থীকে ত্রাণসহায়তা দিয়েছিল অক্সফাম।

এই সময়ের কত স্মৃতিই যে মনে পড়ে। জলপাইগুড়িতে কলেরায় মৃতদের জন্য কবর খুঁড়েছি। একসঙ্গে এক লাখ শাড়ি, এক লাখ লুঙ্গি-গেঞ্জি আর বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন

সাইজের তিন লাখ পোশাক কেনার মতো দুরূহ কাজের কথাও ভুলব না। মনে আছে, আমার অফিসের ৩৬ জন কর্মীর বেশির ভাগই ছিল পালিয়ে আসা শরণার্থী।

কার্যক্রমের পুরো সময়জুড়েই ত্রাণসামগ্রী বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার পরিবর্তে ভারতের ভেতর থেকেই জোগাড়ের চেষ্টা করা হয়। বিদেশ থেকে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করা ছিল ব্যয়সাধ্য। আমরা টনকে টন ব্লিচিং পাউডার ও হাজার হাজার লিটার 'এসকাবিয়ল' (খোসপাঁচড়ার ওষুধ) কিনেছিলাম। শরণার্থীশিবিরগুলোর জন্য এ ধরনের পণ্যের চাহিদা ছিল সব সময়, যা কলকাতার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে খুবই ব্যস্ত রেখেছিল।

বায়াফ্রার পরে এবং কাম্পুচিয়ার আগে এটাই ছিল অক্সফামের সবচেয়ে বড় ত্রাণ কার্যক্রম। এ জন্য আমাদের তহবিল গঠন কার্যক্রমও হতে হয়েছিল জোরদার ও দক্ষ। তহবিল সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিল অক্সফাম। শীত ঘনিয়ে আসায় শরণার্থীদের জন্য কম্বল ও গরম কাপড়ের প্রয়োজন পড়ে। 'আপনার বিছানা থেকে একটি কম্বল তুলে নিন' ও 'বড়দিনের জন্য একটি নতুন সোয়েটার কিনে পুরোনোটি অক্সফামকে পাঠিয়ে দিন'– এই ভাষায় প্রচারণা চালায় অক্সফাম। অক্সফামের ঠিকানায় পাঠানো ত্রাণ সাহায্য পার্সেলের জন্য ব্রিটিশ ডাক বিভাগ তখনো কোনো ডাকমাশুল নেয়নি।

আমরা যারা ভুলে গেছি বা যারা বেশি নবীন, তাদের জন্য বলছি, ভারতের ৯০০ শরণার্থী শিবিরে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থী ছিল। এতো বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর জন্য খাবার ও অন্য জিনিসপত্রের জোগান দেওয়া কত দুরূহ ব্যাপার ছিল, এতো দিন পরও সেটা উপলব্ধি করা কঠিন মনে হয় আমার। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এই কর্মযজ্ঞ? অনেক মানুষের বীরত্বপূর্ণ অবদান এই অসাধ্য কাজকে সম্ভব করেছে। ওই সব মানুষ কখনই খ্যাতি কিংবা কৃতিত্ব দাবি করেননি। তাঁদের কথা হচ্ছে, যা করা উচিত ছিল তাঁরা শুধু সেটাই করেছেন।

বৈশ্বিক সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায় এই সংকটের স্থান করে নেওয়া ছিল কঠিন। ২৫ মার্চের গণহত্যার খবর সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায়ই ছিল। কলেরার প্রাদুর্ভাবের খবরটিও প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁই পায়। শরণার্থী শিবিরগুলো যখন বন্যায় প্লাবিত হয়, তখন আরেকবার তা পত্রিকার প্রথম পাতায় উঠে আসে। '৭১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ অক্সফাম সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্বনেতাদের ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো একটি উপায় বের করতে হবে। খুব কম সময়ের মধ্যেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হলো। 'দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি অন দ্য ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল' শিরোনামে প্রত্যক্ষদর্শীদের ওই 'সাক্ষ্য' প্রকাশ করা হয়। সারা বিশ্বের সব সরকারপ্রধানের হাতে ওই জবানবন্দি তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে জাতিসংঘের বার্ষিক অধিবেশন শুরুর সময়ের সঙ্গে ওই 'সাক্ষ্য' প্রকাশের সময়টা মিলে যায়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' এর একটি ইংরেজি প্রতিরূপ সংস্করণ প্রকাশ করে। কীভাবে এ দেশটি জন্ম নেয় এবং এর পেছনে কত ব্যাথা ও দুর্ভোগ ছিল, ওই প্রকাশনার মাধ্যমে মানুষ তা আরও ভালো জানতে পারবে।

১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে জোরালো সমর্থন দিলেও সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বিষয়টি সম্পর্কে মার্কিন সিনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি 'দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি' সিনেটের গোচরে আনেন এবং কংগ্রেসের রেকর্ডে এর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া মার্কিন সরকার তখন পাকিস্তানকে সমর্থন করলেও সে দেশের জনগণ অনেক মহ-ানুভবতা দেখিয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলোর জন্য ১০ লাখ ডলারেরও বেশি দামের ওষুধ পাঠানো হয়েছিল।

নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহ ও জরুরি পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমানে অক্সফামের খ্যাতি রয়েছে। ১৯৭১ সালে ওই শরণার্থী শিবিরগুলোতে আমরা এক ধরনের রাবারের সেপটিক ট্যাংক পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। ওই ট্যাংকের সঙ্গে ১০টি পায়খানার সংযোগের ব্যবস্থা থাকত। আমাদের বিশেষজ্ঞরা নিরন্তর এসব পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। স্বাধীনতার পর স্যানিটেশন ইউনিটগুলো বেশ কয়েক বছর ধরে ঢাকা ও সৈয়দপুরের বিহারি ক্যাম্পগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে।

বছরের শেষ দিকে যখন শীত ঘনিয়ে আসছে, তখন আমরা শরণার্থী শিবিরগুলোতে আরও ছয় মাস কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করছিলাম। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আমাদের ধারণার অনেক আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। আমার মনে আছে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শুনে বাংলাদেশি সহকর্মীদের সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। ওই কান্না ছিল মুক্তির আনন্দের, আবেগের। তবে আমরা শিগগিরই দেখতে পেলাম যে সামনে অনেক কঠিন কাজ পড়ে আছে।

স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশে অক্সফামের প্রথম মাঠ পরিচালক হলেন রেমন্ড। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে রেমন্ড দায়িত্ব নেওয়ার আগে আমি তাঁর ব্যবহারের জন্য একটা ল্যান্ডরোভার গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় যাই। ওই ভ্রমণ ছিল খুবই মনে রাখার মতো। হাজার হাজার মানুষকে স্বদেশে ফেরত যেতে দেখে আমার খুবই ভালো লাগছিল। কিন্তু পথে পথে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মন ভারাক্রান্ত হচ্ছিল। পুড়িয়ে দেওয়া অনেক গ্রাম দেখলাম। দেখলাম উড়িয়ে দেওয়া ব্রিজ-কালভার্ট। নদীতে ডুবে আছে অনেক বিধ্বস্ত নৌকা-ফেরি।

ঢাকায় যাওয়ার পথে যশোরের একটি ক্যাথলিক মিশনে রাত কাটালাম আমি। পাকিস্তানী সেনারা ওই মিশনের ইতালিয়ান যাজককে হত্যা করেছিল। রাত কাটিয়ে পরদিন ঢাকায় পৌঁছাতে আমাদের ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। মনে আছে, মাঝরাতের দিকে আমরা যখন পুরোনো বিমানবন্দরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একটিও গাড়ি কিংবা মানুষ চোখে পড়েনি। হঠাৎ করেই কোত্থেকে একদল সৈনিক এসে আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলে। আমার গাড়িচালক চট্টগ্রামের বাদল নন্দী কিংবা আমি কেউ-ই বুঝতে পারিনি যে নৈশ কারফিউ চলছে। পরিচয় জেনে ওই সেনারা আমাদের পাহারা দিয়ে পূর্বাণী হোটেলে পৌঁছে দিল।

এর এক বা দুই দিন পর আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলাম। দেখলাম, তিনি অক্সফামের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোই জানতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অক্সফামের মতো ছোট একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পুনর্গঠনে কী করতে পারে? তিনি তাঁর পাইপটি আমার দিকে তাক করে উঁচু জলদগম্ভীর গলায় বললেন, 'ইয়াং ম্যান, তুমি এখানে কীভাবে এসেছো?' আমি জানালাম, গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছি। তখন তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি তো আমার দেশকে আমার চেয়ে বেশি দেখেছো। কারণ আমি প্রায় নয় মাস জেলে ছিলাম।' এরপর শেখ মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি দেখেছো?' পথে যে ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছিলাম, তাঁকে সেগুলো জানালাম। আর বললাম, অক্সফাম ইতিমধ্যে একটা বড় গৃহ নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পে সহ-ায়তা দিচ্ছে। আমি বললাম, 'আমার মনে হয়, সেতু নির্মাণের মতো কাজগুলো দ্বিপক্ষীয়

ও বহুপক্ষীয় দাতাদের মাধ্যমেই করতে হবে। ফেরির বিষয়টিও হয়তো অক্সফামের জন্য সাধ্যের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল হবে।' তা-ও শেখ মুজিব কিন্তু আগ্রহ দেখালেন অক্সফাম যাতে নতুন ফেরি কেনা ও পুরোনোগুলো মেরামতের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখে।

দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত অক্সফাম তিনটি ফেরি কিনতে সক্ষম হয়েছিল। অনেকগুলো পুরোনো ফেরি মেরামতও করেছিল অক্সফাম। আমার মনে আছে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদদের নামে ফেরিগুলোর নাম রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু রেমন্ড বাংলাদেশের পল্লিপ্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি তাই ফেরিগুলোর নাম ফুলের নামে রাখার সুপারিশ করতে বললেন আমাকে। পরে ফেরিগুলোর নাম রাখা হয়– কামিনী, কস্তুরি ও করবী। প্রায় ৩৮ বছর পর এখনো ওই ফেরিগুলো গোয়ালন্দ ঘাটে নদী পারাপার করছে।

মার্চের ('৭২) আরও একটি স্মৃতি আমার মনে আছে। বাংলাদেশে 'কেয়ার'-এর বাড়ি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তখনকার প্রায় আড়াই লাখ পাউন্ড দামের সিআই শিট জাহাজে তোলার জন্য আমি কলকাতা জাহাজঘাটে গিয়েছিলাম।

রেমন্ড স্রেফ দুর্গত মানুষকে ত্রাণ বিতরণের বদলে নতুন দেশটির পুনর্গঠনে অবদান রাখতে অনুমতি চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কাছে। তাঁর সেই চাওয়া পূর্ণ হয়েছিল। ব্র্যাকের প্রথম দিকের দাতা সংস্থাগুলোর একটি ছিল অক্সফাম। কলকাতায় ফজলে হাসান আবেদের (সম্প্রতি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত) কাছে অক্সফামের পক্ষ থেকে তিন লাখ রুপি তুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্র্যাক এখন সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। বাংলাদেশের আরেকটি অসাধারণ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডেও সহায়তা দিয়েছে অক্সফাম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শরণার্থীরা দেশে ফিরতে শুরু করার পর আমরা ধীরে ধীরে ভারতে আমাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নিতে শুরু করি। ১৯৭২ সালের শুরুর দিকে একদিন একদল শরণার্থী দপ্তরে এসে আমাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি বাগানে শ-তিনেক লোক দাঁড়িয়ে। তারা কোনো অভাব-অভিযোগ জানাতে এসেছে মনে করে আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু একটু পরই জানা গেল যে ঘটনা অন্য। ওই শরণার্থীরা আসলে বিদায় নিতে এসেছে। অক্সফামের প্রতি ধন্যবাদের নিদর্শন হিসেবে তারা আমাকে হাতে তৈরি উলের ফুল উপহার দিল। আমার কাছে এটা ছিল খুবই আবেগময় একটি মুহূর্ত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করে আমার জীবনটাই বদলে গেছে। যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ না হতো, তাহলে আমি হয়তো ১৯৭১ সালেই যুক্তরাজ্যে ফিরে যেতাম এবং পরিকল্পনামতো পশু ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা করতাম। কিন্তু ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খুবই দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমি নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ করেছি।

লর্ড ব্রকওয়ের ছয় দফা

ব্রিটিশ লর্ডস সভার সদস্য, ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে ৪ এপ্রিল ১৯৭১ উন্মুক্ত জনসভায় বলেন, তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন বাংলায় এবং নিজেকে সব সময় বাংলার বন্ধু হিসেবে শনাক্ত করে থাকেন। ইতিহাস খতিয়ে

দেখলে অবশ্যই বলা যাবে, স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ব্রিটিশদের এমন কোনো ইচ্ছে ছিল না যে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে থাকবে। পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটানো হচ্ছে তিনি অবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবি জানান।

লর্ড ব্রকওয়ে ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

১। পূর্ব বাংলার দুর্গতদের জন্য এখনই কাযর্করী ত্রাণ পাঠাতে হবে।

২। সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গুলি বন্ধের আদেশ দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে স্বাধীনভাবে জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে হবে।

৫। পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি বিবেচনা করে অবিলম্বে জাতিসংঘের সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৬। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে কমনওয়েলথ সম্মেলনে সিঙ্গাপুর ঘোষণায় পাকিস্তানও সম্মতি দাতা দেশ। ব্রিটেন, কানাডা, ভারতের মতো জ্যেষ্ঠ কমনওয়েলথ সদস্য দেশ সক্রিয় থেকে কমনওয়েলথ সবিচালয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ঘটনা তুলে ধরার জন্য ঘটনা অনুসন্ধানী দল-ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পাঠাবে।

নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি উত্থাপনের ভারতীয় প্রস্তাবের প্রতি লর্ড ব্রকওয়ে জোর সমর্থন প্রদান করেন।

সিনেটর কেনেডির সাত দফা

ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো প্রতিবেদনটি নয়াদিল্লির টাইমস অব ইন্ডিয়ায় নভেম্বর ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। মূল প্রতিবেদনের শিরোনাম 'পূর্ব বাংলার জন্য মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির সাত দফা।'

সিনেটে শরণার্থীবিষয়ক জুডিশিয়ারি সাব কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর এডওয়ার্ড এফ কেনেডি নিক্সন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রেডক্রস আন্তর্জাতিক কমিটির প্রতিনিধিদের শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার জন্য, যেন পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

কেনেডি বলেন, ইসলামাবাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রতীকী নেতৃত্ব শেখ মুজিবের এই সংকটের যেকোনো রাজনৈতিক সমাধানে তার প্রতি ন্যায় বিচার ও তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্ব বাংলা ও ভারতের সংকট নিয়ে সিনেটর কংগ্রেসে যে সাতটি সুপারিশ করেন এটি তার একটি, যা গতকাল (১ নভেম্বর ১৯৭১) পেশ করা হয়।

অপর সুপারিশগুলো হচ্ছে–

১। দক্ষিণ এশিয়ার সংকটের মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রকে খতিয়ে দেখতে হবে।

২। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে।

৩। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সাহায্যের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আওতায় প্রেসিডেন্টকে একটি মানবিক ও সমাজসেবা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫। জাতিসংঘের জরুরি সেবা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ সমর্থন জোগাতে হবে।

৬। পূর্ব বাংলার ট্র্যাজেডি অবশ্যই জাতিসংঘের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে তা অন্তর্ভুক্তির বর্তমান প্রচেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহিত করতে হবে।

কেনেডি বলেন, ভারতে শরণার্থীর অব্যাহত বিশাল জোয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের হুমকি সহিংসতা ও দাবিয়ে রাখার নীতি পাকিস্তান অনুসরণ করছে পূর্ব বাংলার মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে তুচ্ছজ্ঞান করছে ইসলামাবাদ সেনা সরকারের সংবেদনশীলতার প্রতি আনুগত্যের কারণে।

এডমন্ড মাস্কির চার দফা

ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এখন বিচার করার সময় নয়। এখন সময় যুদ্ধ শেষ করার, পূর্ব বাংলার মানুষের ভোগান্তি শেষ করার। যুদ্ধমান এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপন করার। এই ভূমিকা দিয়ে সিনেটর মাস্কি (ডেমোক্র্যাট এই সিনেটর জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন) যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে নিম্নোক্ত চার দফা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানান :

১। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সেনা প্রত্যাহার।

২। পূর্ব বাংলা থেকে অবিলম্বে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানে সেনা প্রত্যাহার এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ শান্তিসেনা মোতায়েন, তারা একই সঙ্গে শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করবে।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও অন্যদের নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল লিডারশিপ গ্রুপ তৈরি করবে।

৪। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বাইরে সমান অবদান থেকে দুই সত্তা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।

এডমন্ড মাস্কির প্রস্তাব যখন আসে তত দিনে পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কথিত চরম নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন–

প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন বড় গলায় 'চরম নিরপেক্ষতা'র কথা বলছেন আর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় চালাচ্ছে অবিরাম হত্যাকাণ্ড তখন আমেরিকার বন্দরে পাকিস্তান সওদাগরি জাহাজে বোঝাই করা হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

তিনি প্রশ্ন রাখেন, পাকিস্তান যখন পূর্ব বাংলায় গণহত্যা অব্যাহত রাখল আর ভারতে পাঠাল প্রায় এক কোটি শরণার্থী আমরা তখনো পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করা বন্ধ করতে পারলাম না– এটা কি চরম নিরপেক্ষতা?

ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র যখন ভারতকে বললো 'আগ্রাসী' সেটা কি চরম নিরপেক্ষতা?

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের বেলায় বহাল রেখে ভারত থেকে প্রত্যাহার করা কি চরম নিরপেক্ষতা?

আমরা যখন কেবল যুদ্ধ বিরতির কথা বলব আর সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় কি করছে সেটা ভুলে যাব তা কি চরম নিরপেক্ষতা?

এডমন্ড মাস্কি বলেন, আসল সমস্যা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ। সেখানকার মানুষ যদি একটি নিশ্চিত ও ন্যায্য ভবিষ্যৎ দেখতে না পায় তাহলে এ যুদ্ধ শেষ হওয়ার নয়।

পিটার শো বললেন পাকিস্তানকে আর সাহায্য নয়

লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা স্টেপনি থেকে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় এমপি প্রথম থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে বলে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যের ওপর ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ লন্ডনের দ্য টাইমস এর প্রতিবেদন–

স্টেপনির শ্রমিক দলের এমপি পিটার শো মনে করেন ব্রিটিশ সরকার কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে পাকিস্তানকে যে সাহায্য দিয়ে থাকে কিংবা সরাসরি যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে থাকে তা পুনরায় চালু করা ঠিক হবে না। স্টেপনির বিশপ রেভারেন্ড ট্রেভর হাডল স্টোনকে নিয়ে এক সপ্তাহের দিল্লি ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে পররাষ্ট্র সচিব (মন্ত্রী) স্যার এলেক ডগলাস হিউমকে বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের স্বীকার করা প্রয়োজন যে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সব ক্ষমতা গুটিয়ে ফেলার সময় হয়ে গেছে– আর এই লক্ষ্যে আর্থিক অসহযোগিতার চাপ দিতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানান।

পিটার শোর গতকাল (২ সেপ্টেম্বর) বলেন, ব্রিটিশ সরকার এ পর্যন্ত সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু অক্টোবরে কনসোর্টিয়াম সাহায্য পুনরায় শুরু করবে কি না সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এই সাহায্য লাভের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে লোক দেখানো ঘষামাজা করছে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে আমরা যেন এতে বিভ্রান্ত না হই।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা দরকার। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের ওপর তাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যদিও কংগ্রেস চাপ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকান নীতির কোনো নিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে না।

সিনেটর কেনেডির ভারত সফরের পর কংগ্রেসের চাপ বেড়েছে, আমি আশা করি সেখানকার জনমতও ব্রিটেনের মতোই ঘুরে যাবে।

পিটার শোর বলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। শুরু থেকেই তাদের ব্যবধান হাজার মাইলের। এখন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও জনসাধারণের চাওয়া বিবেচনায় আনলে ব্যবধান বেড়েছে আরও হাজার মাইলের। মোট কথা, দুই অংশের বন্ধন ভেঙ্গে গেছে এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেভাবে শরণার্থী বের হয়ে যাচ্ছে– এখন মাসে ১০ লাখের কাছাকাছি, আমি মনে করি না কোনো ধরনের চাপ– এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাচারী বল প্রয়োগ পাকিস্তানের দুই বিচ্ছিন্ন অংশকে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারবে না।

সফরকালে পিটার শোর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি জানান, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যদি এখনই পূর্ব পাকিস্তান

থেকে ক্ষমতা গুটিয়ে না নেয় তাহলে আরেকটি তিক্ত ও নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত গণযুদ্ধের সূচনা হবে, যাতে অনেক জাতি জড়িয়ে পড়তে পারে।

ব্রিটিশদের থেকে শিক্ষা নিন : আর্থার বটমলে

ব্রিটিশ শ্রমিক দলের এমপি আর্থার বটমলের ২৮ আগস্ট ১৯৭১ তারিখের বক্তব্য : আমি চাই পাকিস্তান ও ভারত পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে আসুক। আমার আশা এ দুটি দেশ আবার এক হোক। আমি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছি আমাকে যেন এ ভুল বোঝা না হয়; আমি কেবল আমার আশার কথা বলেছি। ভারত উপমহাদেশের আর ভাগাভাগি আমি চাই না– কারণ এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশাল, পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে ভারত উপমহাদেশ অনেক উচ্চমানের– আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের জন্য এটাই তো চাই? আরও ভেঙ্গে গেলে সম্পদের সঠিক বিনিয়োগ হবে না।

সামরিক বাহিনীকে যদি সেখানে (পূর্ব পাকিস্তানে) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে দেওয়া হয়, তাহলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। আর এই ভাঙন এড়াতে চাইলে পূর্ব বাংলার প্রশাসন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

আমার পাকিস্তান সফরের সময় যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমি বিষয়টা তাঁকে বলি। কিন্তু আমার প্রস্তাবে জেনারেল অনুকূল কোনো সাড়া দেননি। আসলে আমি তাঁকে এটাও বলি যে তাঁকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে– আমরা যাঁদের জেলে ঢুকিয়েছি তাঁরাই জাতির কর্ণধার হয়েছেন।

রাসেল জনস্টোনের আবেদন

৩১ মার্চ ১৯৭১ রাসেল জনস্টোন ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্য যে বিবৃতি দিয়েছেন–

আমরা আতঙ্কের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকটের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে আসছি। যদিও স্পষ্ট প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে না, তবুও সংবাদগুলো অনেক সময় পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় কিন্তু অনস্বীকার্য–

প্রথমত, অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা।

দ্বিতীয়ত, এই স্বাধীনতা দাবির কারণে পাকিস্তান সরকার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সেনাবাহিনীকে অত্যাচার-নির্যাতনে নিয়োজিত করে– প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর নৃশংস ও নির্বিচার বর্বরতায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক ব্যক্তি খুন হয়।

এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যা (জলোচ্ছ্বাস) বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সহানুভূতি জাগিয়েছে; বর্তমান অবস্থায় ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে না পারলে দুর্গতদের যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠবে।

যা ঘটেছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার- এ যুক্তিতে ব্রিটেন অনড় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে; আমি বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ করছি মন্দের দিক থেকে অসহনীয় বর্বরতা কত মর্মান্তিক হতে পারে আর ভালোর দিক থেকে রাজনৈতিক হিসেবে বড় ভ্রান্তি কেমন করে সব নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। কমনওয়েলথের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে সমাধান খুঁজে পেতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্রিটেনের সামনে খোলা সব পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটেনের ওপরই বর্তায়।

তথ্য সূত্র

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৭, ১৩, ১৫ খণ্ড।
* পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ মার্চ ফর নিউ রিলেসনস, মোহাম্মদ আয়ুব, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫।
* বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওশান কান্ট্রিস ১৯৭১-১৯৭৫, ডেনিস রাইট।
* বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এন্ড দ্য নিক্সন হোয়াইট হাউস, ১৯৭১ এনায়েতুর রহিম ও জা সি এল রহিম, পুস্তকা : ২০০০।
* দি অ্যামেরিকান পেপার্স সিক্রেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল, ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ১৯৬৫-১৯৭৩, রোয়েদাদ খান সংকলিত ও নির্বাচিত, ইউপিএল।
* দ্যা হোয়াট হাউজ অ্যান্ড পাকিস্তান : সিক্রেট ডিক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টস ১৯৬৯, ১৯৭৫ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি।
* ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট টেলিগ্রাম (০৫৩৭১২), ৩১ মার্চ ১৯৭১ ওয়াশিংটন ডি. সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
* মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্রেকশানস, দি লন্ডন সেন্টার ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, সুলতান হোসেন খান (১৯৯৭)।
* উই হ্যাভ লার্নট নার্থিং ফ্রম হিস্ট্রি, পাকিস্তান পলিটিক্স অ্যান্ড মিলিটারি, এম আসগর খান, অক্সফোর্ড, করাচি।
* দ্য সেপারেশন অব ইস্ট পাকিস্তান, হাসান জহির, অক্সফোর্ড, করাচি।
* উইটনেস টু সারেন্ডার, সিদ্দিক সালিক।
* একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সিরাজ উদদীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০৪।
* দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা। মুহাম্মদ নুরুল কাদির, মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।
* দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, দ্য সানডে টাইমস, নিউজউইক, ফিলাডেলফিয়ার দ্যা ইভনিং বুলেটিন। দ্য স্টেটসম্যান, নিউইয়র্ক টাইমস, ডেইলি মিরর।